নির্বাচিত সংস্কৃত মহাপুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুসন্ধান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভ

গবেষক : শুভজ্যোতি দাস

নিবন্ধন ক্রম : **A00SA0100418**

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দেবদাস মণ্ডল

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

কলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

Nirvācita Saṃskṛta Mahāpurāṇe Upalabdha Tīrthasamūhera Ārtha-sāmājika evaṃ Sāṃskṛtika Upādānera Anusandhāna

Thesis submitted for the award of the degree of

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Arts

By

Shubhajyoti Das

Registration No.: A00SA0100418

Under the Supervision of

Dr. Debdas Mandal

Assistant Professor, Department of Sanskrit,

Jadavpur University, W.B.

Department of Sanskrit

Faculty of Arts, Jadavpur University

Kolkata

2024

CERTIFICATE

Certified that the Thesis entitled

নির্বাচিত সংস্কৃত মহাপুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুসন্ধান (Nirvācita Saṃskṛta Mahāpurāṇe Upalabdha Tīrthasamūhera Ārtha-sāmājika evaṃ Sāṃskṛtika Upādānera Anusandhāna), submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Debdas Mandal, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor: Candidate:

_____ _____

Dated: Dated:

প্রাক্‌কথন

“মন যদি এক স্থানে শান্তিতে থাকে তবে তীর্থ-ভ্রমণের কি দরকার? আসল তীর্থ হচ্ছে চিত্ত। চিত্তে যদি তীর্থ না থাকে, তবে কোথায় তোমার তৃপ্তি?”- শ্রী শ্রী সারদা মা।

ভারতীয় সভ্যতা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যে কোনো সভ্য জাতিই চায় তার অতীতের ইতিহাসকে জানতে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। মহাজনেরা বলেন ‘মন চঙ্গা তো কঠৌতি মে গঙ্গা’। কিন্তু সে হল পুণ্যাত্মা সুমন মানুষের কথা। তীর্থের সঙ্গে যাত্রা শব্দটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জুড়ে থাকে। সে যাত্রা হয়ে থাকে কখনও সমবেত, কখনও একাকী নির্জন। তবুও তার প্রচ্ছন্নে থাকে বহু মানুষের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। নিজেকে নিয়ে কোনও এক বিরাটের দিকে যাওয়া- সেখানেই তীর্থ।

‘তীর্থ’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ নদীর ঘাট। এছাড়া তীর্থ শব্দটির বিবিধ আকরে বিভিন্ন অর্থ মেলে। তীর্থের সঙ্গে যে অর্থই যুক্ত হোক না কেন, তার সঙ্গে পবিত্রতার একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। নদীর মতো আর কী পবিত্র হতে পারে, যেখান দিয়ে জলধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে- যে জল হল জীবন। ভারতবর্ষে প্রাচীন যে ধর্ম, তাতে জল সর্বার্থেই সবথেকে পুণ্যস্থান লাভ করেছে। নদীর উৎস, নদীসঙ্গম, নদীমোহনা- প্রতিটিই মানুষের কাছে পরম পুণ্যস্থল। শুধু নদী নয়, মানস সরোবর থেকে পুষ্কর হ্রদ পর্যন্ত অসংখ্য জলক্ষেত্র ছাড়াও ছোট, মাঝারি অজস্র প্রাকৃতিক জলাশয় তীর্থ নামের গৌরবের ভাগীদার।

তীর্থের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে নানা স্থানও। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, পুরী, মথুরা ইত্যাদি। এই সকলস্থান প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। শুধু ধর্ম নয়, তীর্থের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকও। যা আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের মুখ্য বিষয়। সাধারণভাবে তীর্থস্থানের কথা বললেই আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি মাথায় আসে। কিন্তু তীর্থস্থান কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জড়িত নয়, তার সঙ্গে জুড়ে থাকে তীর্থস্থানে বসবাসকারী বহু মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। তীর্থস্থানে ফলমূলাদি, দেবী-দেবতার মূর্তি ইত্যাদি নানা ধরণের জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়, সেই স্থানে বসবাসকারী মানুষের আর্থিক নির্ভরতার জায়গা। সেই সঙ্গে রয়েছে নানা ধর্ম, বর্ণ, জাতির মানুষের সমাগম। যা একদিকে সেই অঞ্চলের মানুষের রুজি-

রোজগারের প্রত্যক্ষ সহায়ক, তেমন বহু আচার ও সংস্কারের পীঠস্থানও। তীর্থস্থানে যে কেবল ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের সমাগম ঘটে তা নয়, বহু অসৎ মানুষ অসৎ উদ্দেশ্যে সেই স্থানকে কলুষিতও করে। ফলে তীর্থস্থানগুলি যেমন একাধারে পুণ্যার্জনের আধার, তেমনই বহু মানুষের বিশ্বাসের একমাত্র ঠিকানা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে পুরাণসাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। ভারতীয় উপমহাদেশে আঞ্চলিক পরম্পরার বিকাশ তথা লোকসংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখাও পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়। উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ দিকগুলির বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে পৌরাণিক সাহিত্যাবলি। পুরাণসাহিত্যে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা সেই ধরণের একটি বিষয়, যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ পরম্পরায় দৈনন্দিন জীবনচর্চার বিভিন্ন উপাদানগুলি উপমহাদেশীয় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে সেই সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করা হয়েছে।

এই গবেষণা কার্যের দিক নির্দেশ করার জন্যে যে মানুষটির কাছে আমি চিরঋণী, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. দেবদাস মণ্ডল। গবেষণা বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত এই গবেষণা কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তাঁকে ছাড়া এই কাজ সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে অধ্যাপিকা ড. দেবার্চনা সরকারকে আমার নমস্কার ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া (প্রয়াত) অধ্যাপিকা ড. অঞ্জলিকা মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ড. দীধিতি বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. সমীরণ চন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক ড. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, অধ্যাপিকা ড. রোহিনী ধর্মপালকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যে মানুষটির অধ্যাপনায় ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে আমার হাতেখড়ি অধ্যাপিকা ড. পিয়ালী প্রহরাজ, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। স্বনামধন্যা অধ্যাপিকা ড. রত্না বসুর রিসার্চ মেথডোলজির বিষয়ে পাঠদান ও গবেষণা কার্যে তাঁর মূল্যবান মতামত এই শোধকার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ফলে তাঁকেও জানাই আমার

সশ্রদ্ধ প্রণাম। বিভাগীয় অধ্যাপক- অধ্যাপিকাদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের দিকদর্শন এই গবেষণাকার্যে আমায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক ও গবেষক বন্ধুদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ, তাঁরা প্রয়োজনে নিজেদের সাহায্যের হাত নির্দ্বিধায় বাড়িয়ে দিয়েছে। পরিশেষে যাদের কথা না বললে কৃতজ্ঞতা স্বীকার অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাঁরা হল আমার পরিবারের মানুষেরা। যাঁদের আশীর্বাদ ও সাহস ছাড়া এই কার্য করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

যাদবপুর, কলকাতা, ২০২৪

বিনয়াবনত

শ্রী শুভজ্যোতি দাস

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১-২

সূচিপত্র ৩-৫

শব্দসংকেত ৬-৮

ভূমিকা ৯-২১

প্রথম অধ্যায় :

❖ **পুরাণের লক্ষণ, সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন** ২২-৩৩

১.১. পুরাণের স্বরূপ ২২

১.২. পুরাণের লক্ষণ ২৫

১.৩. পুরাণের সংখ্যা ও বিষয়বস্তু ২৭

১.৪. পুরাণের বিভাগ ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায় :

❖ **তীর্থ : বিবিধ আকরে তার অর্থবিচার** ৩৪-৫৪

তৃতীয় অধ্যায় :

❖ **নদীকেন্দ্রিক তীর্থসমূহের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসন্ধান** ৫৫-৮৩

৩.১. পুণ্যতোয়া সরস্বতী ৫৬

৩.২. পতিতপাবনী গঙ্গা ৬৪

৩.২.১. প্রাচীন সাহিত্যে গঙ্গা নদীর উৎপত্তির ইতিহাস ও মাহাত্ম্য বর্ণনা ৬৭

পৃষ্ঠা

৩.২.২. গঙ্গা নদীর প্রশস্তি বর্ণন ও মাহাত্ম্য বিচার ৭২

৩.২.৩. গঙ্গা নদীর বর্তমান পরিস্থিতি ৭৫

৩.৩. তপোভূমি নর্মদা ৭৬

৩.৩.১. নর্মদা নদীর উদ্ভব ও বিস্তার ৭৬

৩.৩.২. প্রাচীন সাহিত্যে নর্মদা নদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা ৭৮

৩.৩.৩. নর্মদা বাঁচাও প্রকল্প ৮২

চতুর্থ অধ্যায় :

❖ **নির্বাচিত তীর্থসমূহের বিকাশ : ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট** **৮৪-১৩৭**

৪.১. কাশী ৮৪

৪.১.১. কাশীর ভৌগোলিক অবস্থান ৮৪

৪.১.২. কাশী নামকরণ ৮৭

৪.১.৩. কাশী তীর্থের বিবরণ ৯২

৪.১.৪. নির্বাচিত সংস্কৃতপুরাণের আলোকে কাশীমাহাত্ম্য বর্ণন ৯৪

৪.১.৫. বিশ্বেশ্বর মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ১০৩

৪.১.৬. কাশী ও গঙ্গা নদী ১০৫

৪.২. গয়া ১১২

৪.২.১. গয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ১১২

৪.২.২. গয়া নামকরণ ১১৫

৪.২.৩. নির্বাচিত সংস্কৃত পুরাণের আলোকে গয়ামাহাত্ম্য বর্ণন ১১৯

পৃষ্ঠা

৪.২.৪. বিষ্ণুপদ মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ১৩৫

পঞ্চম অধ্যায় :

❖ **পুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের বহুমুখী গুরুত্ব** **১৩৮-১৪৯**

উপসংহার **১৫০-১৬৩**

গ্রন্থপঞ্জি **১৬৪-১৭৮**

শব্দসংকেত

অগ্নিপু. = *অগ্নিপুরাণ*

অথর্ব. = *অথর্ববেদ*

অমর. = *অমরকোষ*

অর্থ. = *অর্থশাস্ত্র*

অষ্টা. = *অষ্টাধ্যায়ী*

ঋ. = *ঋগ্বেদ*

ঋভাষ্য. = *ঋগ্বেদভাষ্য*

ঐ. ব্রা. = *ঐতরেয়ব্রাহ্মণ*

ঐ.ব্রা.উপ. = *ঐতরেয় ব্রাহ্মণোপক্রম*

কা.খ. = *কাশীখণ্ড*

কা.বৃ. = *কাশিকাবৃত্তি*

কাব্য.মী. = *কাব্যমীমাংসা*

কূর্মপু. = *কূর্মপুরাণ*

কৌষীতকীব্রা. = *কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদ্*

গরুড়পু. = *গরুড়পুরাণ*

গী. = *গীতা*

গৌ.ধ.সূ. = *গৌতম ধর্মসূত্র*

ছান্দোগ্যোপ. = *ছান্দোগ্যোপনিষদ্*

তিথি. = *তিথিতত্ত্ব*

দেবীপু. = *দেবীপুরাণ*

দেবীভা. = *দেবীভাগবত*

নিরু. = *নিরুক্ত*

নীতি. = *নীতিবাক্যামৃত*

পদ্মপু. = *পদ্মপুরাণ*

প্রা.ভা.ই. = *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*

বরাহপু. = *বরাহপুরাণ*

বসিষ্ঠ.ধ.সূ. = *বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র*

বামনপু. = *বামনপুরাণ*

বায়ুপু. = *বায়ুপুরাণ*

বিষ্ণুপু. = *বিষ্ণুপুরাণ*

বৃহ. = *বৃহদারণ্যকভাষ্য*

বৃহ. উ. = *বৃহদারণ্যক*

ব্রহ্ম.বৈ.পু. = *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*

ব্রহ্ম.সূ.ভা. = *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য*

ব্রহ্মপু. = *ব্রহ্মপুরাণ*

ব্রহ্মাণ্ডপু. = *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*

ভবিষ্যপু. = *ভবিষ্যপুরাণ*

ভা.ই.আ. = *ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব*

ভাগবতপু. = *শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ*

মৎস্য. = *মৎস্যপুরাণ*

মনু. = *মনুসংহিতা*

মহা. = *মহাভারত*

মার্কণ্ডেয়পু. = *মার্কণ্ডেয়পুরাণ*

যাজ্ঞ. = *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*

রঘু. = *রঘুবংশ*

রাম. = *রামায়ণ*

ললিত. = *ললিতবিস্তর*

লিঙ্গপু. = *লিঙ্গপুরাণ*

শতপথব্রা. = *শতপথব্রাহ্মণ*

শব্দ. = *শব্দ-সাগর*

শব্দকল্প. = *শব্দকল্পদ্রুম*

শিবপু. = *শিবপুরাণ*

শিবপু. = *শিবপুরাণ*

স্কন্দপু. = *স্কন্দপুরাণ*

হরি. = *হরিবংশ*

H.Dh. = *History of Dharmaśāstra*

ভূমিকা

পুরাণ ভারতীয় সংস্কৃতির এক অমূল্য উপাদান। পুরাণসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে নিখিল সংসারের উপসংহৃতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। পুরা+তন(ষ্টন), নিপাতনে ত-লোপ ণত্ব করে নপুংসক লিঙ্গে পুরাণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে।[১] পুরাণ শব্দটির অর্থ পূর্বতন। তদনুসারে পুরাণ বলতে প্রাচীন আখ্যায়িকাদি-সম্বলিত গ্রন্থ বিশেষকে বোঝায়। সংক্ষেপে পুরাণ বলতে প্রাচীন ইতিহাস, আখ্যায়িকা, উপকথা ও ধর্মমূলক এক শ্রেণীর বিশিষ্ট গ্রন্থরাজিকে বোঝায়। পুরাণ পঞ্চমবেদ বলেও অভিহিত।[২] তবে পুরাণকে স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয় হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।

পুরাণের লক্ষণ কী? সে বিষয়ে *বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ* প্রভৃতি মহাপুরাণে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ[৩] বিষয়ে বলা হয়েছে- সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ অর্থাৎ পুনর্সৃষ্টি ও লয়, বংশ অর্থাৎ দেব, বিভিন্ন রাজবংশ, বিভিন্ন ঋষিকুলের বংশাবলী, মন্বন্তর অর্থাৎ কোন কোন মনুর কতকাল অধিকার এবং বংশানুচরিত অর্থাৎ বিভিন্ন রাজবংশের রাজগণের সংক্ষিপ্ত বংশবর্ণনা পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ।[৪] *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* দশলক্ষণ বিষয়ে বলা হয়েছে- মূল সৃষ্টি, বিশেষ বিস্তৃত সৃষ্টি অর্থাৎ বিসৃষ্টি, জগতের স্থিতি ও পালন, কর্মবাসনার বিবরণ, মনুদিগের প্রকাশক্রম, প্রলয়বর্ণন, মোক্ষনিরূপণ, বিষ্ণু মাহাত্ম্য কীর্তন এবং দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ গুণবর্ণন। এই দশটি মহাপুরাণের লক্ষণ।[৫] প্রতিটি পুরাণেই তীর্থমাহাত্ম্যের কথা ও তীর্থের বিবরণ কম বেশি

---

[১] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৪৫

[২] *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs*, R.C. Hazra, page 1

[৩] সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।। বিষ্ণুপু., ৩.৬.২৫; বায়ুপু., ৪.১৩

[৪] *পুরাণপ্রবেশ*, গিরীন্দ্রশেখর বসু, পৃ. ১২

[৫] সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।

পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণলক্ষণ প্রসঙ্গে তীর্থ শব্দটির কোনো প্রকার উল্লেখ দেখা যায় না। পুরাণলক্ষণে তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য নামে কোনো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না থাকলেও, পরোক্ষ ভাবে *মৎস্যপুরাণে* যে একাদশলক্ষণের[৬] উল্লেখ রয়েছে সেই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে তীর্থস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়। মহাপুরাণে নানা বিষয়ের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে অন্যতম হল দানধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা। এই তিনটি বিষয় তীর্থের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেদিক থেকে বিচার করলে তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য বিষয়টি পুরাণলক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মহাপুরাণগুলিকে একাধিক উপায়ে ভাগ করা হয়েছে। *মৎস্যপুরাণ* মতে, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিনভাগে পুরাণগুলি বিভক্ত করে প্রতিটির অধিকারে ছয়টি করে পুরাণকে বিন্যস্ত করা

এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্বুধাঃ।

মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথযামি তে।।

সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনম্।

কর্ম্মণাং বাসনাবার্ত্তা মনূনান্তু ক্রমেণ চ।।

বর্ণনং প্রলযানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্।

উত্কীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।।

দশবিধং লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তিতম্।

সংখ্যানঞ্চ পুরাণানাং নিবোধ কথয়ামি তে।। ব্রহ্ম.বৈ.পু., শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়, ৬-১০

[৬] উত্পত্তিং প্রলযং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।

বংশ্যানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্।।

দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্।

বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্।।

দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যত্ বিদ্যতে ভুবি।

তত্ সর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি।। মৎস্য., ২.২২-২৪

হয়েছে। যথা- বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ছয়টি সাত্ত্বিক পুরাণ। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম এই ছয়টি হল রাজস পুরাণ। মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, বায়ু, স্কন্দ ও অগ্নি এই ছয়টি হল তামসপুরাণ।[৭] যে সকল পুরাণে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য অধিকরূপে বলা হয়েছে তা সাত্ত্বিক পুরাণ। রাজস পুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য কীর্তিত এবং তামস পুরাণগুলিতে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তিত। কিন্তু এই ভেদের তাৎপর্য এই নয় যে সাত্ত্বিক পুরাণগুলি শ্রেষ্ঠ, রাজসিক পুরাণগুলি মধ্যম ও তামস পুরাণগুলি নিকৃষ্ট। *গরুড়পুরাণ* মতে, এই ত্রিবিধবর্গীকরণ অতিরিক্ত সাত্ত্বিকপুরাণকে আরও তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- সাত্ত্বিকউত্তম, সাত্ত্বিকমধ্যম ও সত্ত্বাধম । প্রথম বর্গে *মৎস্য* ও *কূর্মপুরাণ* (অন্য তালিকায় এই দুইটিই তামস), দ্বিতীয় বর্গে *বায়ুপুরাণ* (অন্য তালিকা অনুসারে তামস), তৃতীয় বর্গে *বিষ্ণু, ভাগবত* ও *গরুড়পুরাণ* । কোনো কোনো পুরাণে তিন প্রকার বর্গীকরণ ছাড়া আরও দুই প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। একটিতে যেখানে সরস্বতীর মাহাত্ম্য অধিক কীর্তিত হয়েছে আর অন্যটিতে পিতৃগণের প্রশংসাই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন তামিল গ্রন্থানুসারে পুরাণগুলিকে দেবতাদের প্রাধান্য অনুযায়ী পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে।[৮] এছাড়া ঐতিহাসিক পুরাণ, সাম্প্রদায়িক পুরাণ, তীর্থ ও ব্রতাদি ভেদেও নানা অবান্তর ভেদের কথা নানা গবেষক উল্লেখ করেছেন।[৯] স্বামী দয়ানন্দের মতে, পুরাণসাহিত্য পাঁচ ধারায় বিভক্ত। যথা- মহাপুরাণ, উপপুরাণ, ঔপপুরাণ,

---

[৭] বৈষ্ণবং নারদীযং চ তথা ভাগবতং শুভম্।

গারুড়ং চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।।

সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেযানি শুভানি বৈ।

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবত্তং মার্কণ্ডেযং তথৈব চ।

ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত।।

মাত্স্যং কৌর্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং বাযুং তথৈব চ।

আগ্নেয়ং চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত।। মৎস্য., দ্র. অশোক চট্টোপাধ্যায়, *পুরাণ পরিচয়*, পৃ.৩৬

[৮] ব্রহ্মা, সূর্য, অগ্নি, শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য অনুযায়ী পুরাণগুলি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। *তদেব*, পৃ. ৩৮

[৯] তত্রৈব

ইতিহাস ও পুরাণসংহিতা।[১০] মহাপুরাণের সংখ্যা আঠেরটি। উল্লেখ্য বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে মহাপুরাণকে কেবল 'পুরাণ' নামেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সংস্কৃত পুরাণসাহিত্য ব্যতীত জৈনপুরাণ ও বৌদ্ধপুরাণও পাওয়া যায়। এই সকল পুরাণগুলি সংস্কৃতপুরাণের আদর্শেই রচিত। সংস্কৃতপুরাণে যেমন পৌরাণিক দেবদেবীর আখ্যায়িকা ও মাহাত্ম্য এবং পালনীয় ধর্ম ও অনুষ্ঠানাদি প্রসঙ্গ রয়েছে, জৈনপুরাণসমূহেও সেরকম তীর্থঙ্করাদি মহাপুরুষগণের আখ্যায়িকা, জৈনদিগের ধর্ম ও ব্যবস্থাদির উল্লেখ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ইত্যাদির লীলাখ্যানের বিষয়গুলি কিভাবে জৈনপুরাণসমূহে ছাপ ফেলেছে তা জৈনপুরাণসমূহ দেখলে বোঝা যায়। চব্বিশজন তীর্থঙ্করের আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে চব্বিশখানি মহাপুরাণ রচিত হয়েছে।[১১] মহাপুরাণগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংকলিত হয়েছে এবিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ফলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মহাপুরাণগুলি নির্বাচন না করে, কালগণনার দিকে লক্ষ রেখে মহাপুরাণগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। পুরাণের কালনির্ণয় নিয়েও বিস্তর মতভেদ রয়েছে। শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা মহাশয়ের *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs* গ্রন্থে আলোচিত মহাপুরাণের কালকে (খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) অবলম্বন করে শোধপত্রের বিষয়ের পরিধি নির্বাচন করা হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে সংস্কৃত মহাপুরাণগুলি (*বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, কূর্মপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ* ও *ভবিষ্যপুরাণ*) কালপর্বানুক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অগ্নি-স্কন্দাদি অন্যান্য মহাপুরাণগুলিও তুলনাত্মক আলোচনায় ব্যবহৃত হবে। ভারতীয় পরম্পরায় তীর্থ প্রতিটি ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। মানুষ পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে তীর্থ অর্থাৎ পবিত্র স্থান দর্শন করে থাকেন। কেবলমাত্র মুসলিমদের ক্ষেত্রে বিশ্বাস যে তীর্থযাত্রায় হজ না করলে তাদের তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু ভারতীয় তীর্থস্থানগুলি গড়ে ওঠবার পেছনে যে কারণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যে কোনো নবীন ও প্রবীণ মানুষকে কোনো পবিত্র নদী, কোনো বৈদিক দেবদেবী বা লৌকিক দেবদেবী, কোনো সাধুসন্তের বা শহীদের সমাধি দর্শনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে।

---

[১০] স্বামী দয়ানন্দ, *পুরাণতত্ত্ব,* পৃ. ৫

[১১] *বাংলা বিশ্বকোষ,,* ১১ খণ্ড, পৃ. ৬৯৫-৭১৮

ধর্মানুরাগী মানুষেরা পুণ্যার্জনের আশায় তীর্থযাত্রা করে থাকেন। কিন্তু তীর্থপর্যটনের একটা ব্যাবহারিক লাভ হল, নানা দেশের নানা প্রকার মানুষের সংস্পর্শে এসে তীর্থযাত্রীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন সমৃদ্ধ হয়। ফলে তীর্থভ্রমণ কূপমণ্ডুকতা দূর করবার অন্যতম প্রধান উপায়। তীর্থস্থানের সঙ্গে পীঠস্থানের নিবিড় যোগ। মধ্যযুগের তন্ত্রসমূহে কতগুলি শাক্ত ও শৈব তীর্থকে পীঠস্থান বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলির সংখ্যা ও নামের তালিকা সর্বত্র একরকম নয়।[১২] এমনকি তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্যে *তীর্থকল্পলতা, তীর্থকৌমুদী, তীর্থসার* প্রভৃতি বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছিল তৎকালীন সময়ে।[১৩]

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭.১৫) তীর্থযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও এই বক্তব্য নিয়ে গবেষক মহলে নানা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বর্তমান তীর্থযাত্রার ধারণার সঙ্গে বৈদিক সময়ে তীর্থযাত্রার আচারাদির নানা পার্থক্য থাকলেও পাপ মুক্তির মানসিক প্রক্রিয়া উভয় সময়েই ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনকি *ঋগ্বেদের* নদীসূক্তে (১০.৭৫.৫) নদীর যে স্তুতি লক্ষ করা যায়, তা থেকে এবিষয়টি পরিষ্কার যে নদীর থেকেই তীর্থের মাহাত্ম্য প্রকটিত হয়। পরবর্তীকালে *মনুসংহিতায়* [১৪](৮.৯২) তীর্থযাত্রার কথার উল্লেখ মেলে। সেখানে গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রকে পবিত্রস্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানেও গঙ্গা নদীকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মানা হয়ে থাকে। বৈয়াসিক *মহাভারতের* বনপর্বে ৬৭তম অধ্যায় থেকে ১২৯তম অধ্যায় পর্যন্ত তীর্থযাত্রা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এইসকল অধ্যায়ে তীর্থ বলতে গঙ্গাদি (আনুমানিক ২৯৬টি তীর্থ) তীর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫] পুরাণসাহিত্যে তীর্থ শব্দটি পবিত্রস্থান বা তীর্থস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরাণে তীর্থ সম্পর্কিত তথ্যদির কথা জানা যায় দেব-দেবী, কোনো সাধু, সূত শৌনক, কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস, রোমহর্ষণ ঋষি প্রভৃতির

---

[১২] *ভারতকোষ*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৯০

[১৩] *তদেব*, পৃ. ৭২৮

[১৪] যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।

তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ।। মনু. (৮.৯২)

[১৫] Pranati Ghosal, “Tīrtha”. In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p. 65

কথোপকথন থেকে। কোনও কোনও স্থানে তীর্থ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শুভক্ষণ হিসাবে[১৬], শ্রীকৃষ্ণের নাম হিসাবে।[১৭] এসকল দিক থেকে প্রাচীন সাহিত্যে তীর্থস্থানগুলি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

তীর্থযাত্রা, তীর্থক্ষেত্র, তীর্থস্থান এই শব্দগুলি যেমন বহুল ব্যবহৃত। ঠিক তেমনি পুরাণসহিত্যে তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য শব্দটি বহুল চর্চিত। মাহাত্ম্য শব্দটির তাৎপর্য দেশ, কাল, পাত্র বিশেষে গভীর। সাধারণভাবে পুরোহিতরা এই মাহাত্ম্যমূলক রচনাগুলিকে নিজেদের পুস্তিকা (handbook) হিসেবে ব্যবহার করতেন। Winternitz-এর মতে মাহাত্ম্যগুলি কোনও স্থানের বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহল করে থাকে। বস্তুত তীর্থ মাহাত্ম্যগুলি হল ধর্মীয় বিষয়বস্তুর অন্যতম আধার। *স্কন্দপুরাণে* তীর্থমাহাত্ম্যের বিস্তৃত বিবরণ মেলে, কিন্তু *স্কন্দপুরাণের* কলেবর সুবিশাল হওয়ায় তা স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। পুরাণে তীর্থ শব্দটি মূলত পবিত্রস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে নির্বাচিত পুরাণের আলোকে তীর্থগুলি কীভাবে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকে প্রভাব বিস্তার করেছে সেবিষয় পর্যালোচিত হবে।

পূর্বকৃত গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

পুরাণ বিষয়ে এতাবৎ বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অবিস্মরণীয় হলেন এফ্.ই. পার্জিটার, গিরীন্দ্রশেখর বসু, আর.সি. হাজরা, এম.আর. সিং, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সদাশিব অম্বদাস দাঙ্গে, ভেত্তম মনি প্রমুখ। অফ.ই. পার্জিটার মহাশয়ের *The Purāṇa Text of the Dynesties of the Kali Age* (১৯১৩ খ্রি.) গ্রন্থে রাজবংশের অনুযায়ী পুরাণগুলির আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন পুরাণে কী কী রাজবংশ আলোচিত হয়েছে, সেটি হল এই গ্রন্থের আলোচনার মুখ্য বিষয়। গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের *পুরাণপ্রবেশ* (১৯৩৫ খ্রি.) গ্রন্থটিতে পুরাণের স্বরূপ, পৌরাণিক প্রমাদ, যুগ নির্ণয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। আর.সি. হাজরা মহাশয়ের *Studies in the Purāṇic Records on Hindu*

[১৬] ভাগবতপু., ১।১২।১৪, দ্র. Pranati Ghosal, "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p.65

[১৭] 'তীর্থকোটি' ভাগবতপু., ৩।১।৪৫; 'তীর্থপাদ' ভাগবতপু., ১।৬।৩৪ দ্র. Pranati Ghosal, "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p.65

Rites and Customs (১৯৪০ খ্রি.) ও *Studies in the Upapurāṇas* (১৯৫৮ খ্রি.) এই দুটি গ্রন্থে মহাপুরাণ ও উপপুরাণ বিষয়ে পুরাণের কালনির্ণয়, প্রতিটি পুরাণের বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা রয়েছে। এম.আর. সিং মহাশয়ের *Geographical Date in the Early Puranas- A Critical Study* (১৯৭২ খ্রি.) গ্রন্থে পুরাণের কালপর্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের *পুরাণ পরিচয়* (১৯৭৭ খ্রি.) গ্রন্থে পুরাণের লক্ষণ, প্রতিটি পুরাণের বিষয়বস্তু, পুরাণের শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে জবাহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক কুণাল চক্রবর্তী মহাশয়ের পুরাণ বিষয়ে নানা গবেষণা রয়েছে। *Religious Process: The Puranas and the Making of a Regional Tradition* (২০০১ খ্রি.) তাঁর একটি অন্যতম কাজ।

পুরাণ বিষয়ক গবেষণায় কোষগ্রন্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরাণকে উপজীব্য করে যে সকল কোষগ্রন্থ এতাবৎ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের *পৌরাণিক অভিধান* (১৯৫৯ খ্রি.), এস.এম. আলি মহাশয়ের *The Geography of the Puranas* (১৯৬৬ খ্রি.), অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের *পৌরাণিকা* (১৯৭৮ খ্রি.), সদাশিব অম্বদাস দাঙ্গে মহাশয়ের *Encyclopedia of Puranic Beliefs and Practices* (১৯৮৬ খ্রি.), ভেত্তম মনি *Purāṇic Encyclopaedia* (১৯৮৯ খ্রি.), এ.বি.এল. অবস্থি *Purāṇa Index* (১৯৯২ খ্রি.), ভি.আর.রামচন্দ্র দীক্ষিত মহাশয়ের *The Purāṇa Index* (১৯৯৫ খ্রি.), পরমেশ্বরানন্দ স্বামী মহাশয়ের *Encyclopedic Dictionary of Purāṇas* (২০০১ খ্রি.), নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী *পুরাণকোষ* (২০১৬ খ্রি.) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসকল গ্রন্থে পুরাণে ব্যবহৃত নানা শব্দসমূহ, নানা পৌরাণিক চরিত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

উপরি উক্ত গ্রন্থগুলিতে পুরাণ সম্পর্কিত তথ্যের নির্দেশ থাকলেও, পৌরাণিক পরম্পরায় তীর্থ বিষয়ক তেমন কোনো বিস্তৃত আলোচনা নেই। ভারতীয় তীর্থস্থান নিয়ে এতাবৎ যেসব পণ্ডিতেরা গবেষণা করেছেন, তাদের মধ্যে Carl Gustav Diehl মহাশয় রচিত Instrument and Purpose Studies on Rites and Rituals in South India[১৮] (১৯৫৬ খ্রি.), Agehananda Bharati মহাশয় রচিত Pilgrimage

[১৮] Carl Gustav Diehl, "Instrument and Purpose Studies on Rites and Rituals in South India", Lund: CWK Gleerup, 1956.

in the Indian Tradition[১৯] (১৯৬৩ খ্রি.) গবেষণাধর্মী কাজগুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ব্রজকিশোর সাই মহাশয়ের 'তীর্থাটনম্'[২০] (২০০৫ খ্রি.), প্রণতি ঘোষাল মহাশয়ার 'Tīrtha'[২১] (২০১৫ খ্রি.) গবেষণা প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। উপরি উক্ত এসকল গবেষণা নিবন্ধে পুরাণে উল্লিখিত তীর্থস্থানগুলি কিছুটা আলোচিত হয়েছে। *কাশীখণ্ড* [২২](১৯০৮ খ্রি.) নামক গ্রন্থে কাশী বিষয়ক নানা কথা বলা হয়েছে। *তীর্থচিত্র* [২৩](১৯৩৯ খ্রি.) নামক গ্রন্থে বিভিন্ন তীর্থস্থানের বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। *তপোভূমি নর্মদা* [২৪](১৯৫৮ খ্রি.) নামক গ্রন্থে নর্মদা নদীর প্রদক্ষিণ বিষয়ক নানা অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। *নদ-নদী* [২৫](১৯৬৫ খ্রি.) নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদ-নদী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *প্রত্নতীর্থ পরিক্রমা* [২৬](১৯৮৪ খ্রি.) ও *ভারতীয় তীর্থ দর্শন* [২৭](১৯৮৪ খ্রি.) এই দু'টি গ্রন্থে ভারতবর্ষের কিছু বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থানকে নিয়ে আলোচনা করে হয়েছে। *পৌরাণিক তীর্থ পরিক্রমা* [২৮](১৯৯৫ খ্রি.) নামক গ্রন্থে পুরাণে বর্ণিত কিছু বিশেষ তীর্থকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *নর্মদার তীরে তীরে* [২৯](২০০২ খ্রি.) নামক গ্রন্থে নর্মদা নদীকে নিয়ে নানা ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনা করা

---

[১৯] Agehananda Bharati, "Pilgrimage in the Indian Tradition", *History of Religions*, Vol.3, no.1 (Summer 1963), pp. 135-167.

[২০] Brajakishore Swain, "Tīrthāṭanam", In: *Anvīkṣā*, Vol. XXVI, 2005.

[২১] Pranati Ghosal, "Tīrtha", In: *Kalātattvakośa*, Vol. VII, 2015.

[২২] রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল, *কাশীখণ্ড.*

[২৩] রাজলক্ষ্মী দেবী, *তীর্থচিত্র.*

[২৪] শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল, *তপোভূমি নর্মদা.*

[২৫] চিত্রা লোধ, *নদ নদী.*

[২৬] কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, *প্রত্নতীর্থ পরিক্রমা.*

[২৭] সুলোচন শাস্ত্রী, *ভারতীয় তীর্থ দর্শন.*

[২৮] বলরাম মণ্ডল, *পৌরাণিক তীর্থ পরিক্রমা.*

[২৯] বরুণ দত্ত, *নর্মদার তীরে তীরে.*

হয়েছে। *কাশীবৃত্তান্ত পুরাণকাল থেকে সমকাল* [৩০](২০২৩ খ্রি.) এই গ্রন্থে কাশী বিষয়ক নানা প্রবন্ধ রয়েছে। *রামায়ণ, মহাভারত,* পুরাণ, বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে কাশী সম্পর্কে যে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়, সেই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। উপরি উক্ত গ্রন্থসমূহের মূল প্রতিপাদিত বিষয় তীর্থস্থান হলেও, সাধারণভাবে তীর্থস্থানের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিকতার দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। ভ্রমণকাহিনিমূলক এই ধরণের গ্রন্থগুলি শুধুমাত্র গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। গবেষণাধর্মী কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হল সুরিন্দর মোহন ভারদ্বাজ মহাশয়ের *Hindu Places of Pilgrimage in India* (১৯৭৩ খ্রি.), পি.ভি.কানে মহাশয়ের ধর্মশাস্ত্রের উপর সুপ্রসিদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ *History of Dharmaśāstra*-এ[৩১] (১৯৭৫ খ্রি.) তীর্থ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। *Hindu Places of Pilgrimage in India* গ্রন্থে তীর্থ সম্পর্কিত তথ্যের আকর হিসেবে বেশকিছু স্থানের নির্দেশ করা হয়েছে।[৩২] তাদের মধ্যে অন্যতম হল, মহাকাব্য ও পুরাণ। এছাড়া চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে যেসকল তথ্য মেলে তা এই গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

পি.ভি.কানে মহাশয়ের *History of Dharmaśāstra* গ্রন্থে তীর্থ কী? তীর্থযাত্রা কী? বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই আলোচনায় পুরাণের উপলব্ধ তীর্থের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি সামগ্রিকভাবে অধরা। এছাড়া *আদি-মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিযোজনে পদ্ম পুরাণ* [৩৩](২০১৮ খ্রি.) এই গবেষণা সন্দর্ভে *পদ্মপুরাণে* বর্ণিত তীর্থ বিষয়টি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হলেও, তাদের আর্থ-সামাজিক দিকটি বিস্তারে আলোচনা করা হয় নি। এছাড়া ভারত সরকার কর্তৃক নির্মিত 'নমানি গঙ্গে' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বেশ অনেকগুলি তথ্যচিত্র youtube-এ পাওয়া যায়, যা ভারতীয় তীর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে কোনো স্থানেই সংস্কৃত পুরাণসাহিত্যে বর্ণিত তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুসন্ধান

---

[৩০] *কাশীবৃত্তান্ত পুরাণকাল থেকে সমকাল,* শ্যামলেন্দু চৌধুরি (সম্পা.).

[৩১] P.V. Kane, H. of Dh., Vol-IV, pp. 552-827.

[৩২] Surinder Mohan Bhardwaj, *ibid.*, pp. 14-28.

[৩৩] অদিতি রায়, *আদি-মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিযোজনে পদ্ম পুরাণ.*

করা হয় নি। সেদিক থেকে বর্তমান শোধপত্রের বিষয়টি অভিনব। যেখানে সংস্কৃত নির্বাচিত মহাপুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে এই গবেষণা। প্রশ্নগুলি হল-

ক. পুরাণ সাহিত্যে তীর্থসমূহকে কেন সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

খ. পুরাণে তীর্থমাহাত্ম্য আলোচনায় কেন বারংবার শ্মশান ও শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে?

গ. কী কী অনুকূল পরিবেশে তীর্থ গড়ে ওঠে?

ঘ. ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তীর্থ বিকাশের অন্তরালে কিভাবে সহায়তা করে?

ঙ. কোনো তীর্থস্থান গড়ে ওঠার পিছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটির শীর্ষক ‘সংস্কৃত মহাপুরাণে বর্ণিত তীর্থমাহাত্ম্যে আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুসন্ধান’। এই গবেষণার মুখ্য বিষয় হল তীর্থমাহাত্ম্য বিচার। আলোচনার সুবিধার্থে গবেষণা নিবন্ধটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে-

❖ প্রথম অধ্যায়:

পুরাণের লক্ষণ, সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন- এই অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় পুরাণ বলতে কী বোঝায় ও তার স্বরূপ কী? বিবিধ আকরে পুরাণ শব্দটির ব্যাখ্যা, পুরাণের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা, পুরাণের পঞ্চলক্ষণ, দশলক্ষণ ও একাদশলক্ষণ লক্ষণ বিচার, পুরাণের সংখ্যা ও বিষয়বস্তু বিষয়ক নানা তথ্যের আনুপূর্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

❖ দ্বিতীয় অধ্যায়:

তীর্থ : বিবিধ আকরে তার অর্থবিচার- এই অধ্যায়ে ‘তীর্থ’ শব্দটির বিবিধ আকরে, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে

তীর্থের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তীর্থ চতুর্বিধ।[৩৪] যথা- দৈব (দেবতা দ্বারা সৃষ্ট), আসুর (গয়াদি তীর্থ), আর্ষ (মুনি কর্তৃক সৃষ্ট, প্রভাসাদি) ও মানুষ (মনু, কুরু প্রভৃতি রাজা কর্তৃক সৃষ্ট) প্রভৃতি।[৩৫] এছাড়া তীর্থ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ হিসেবে পর্বত, নদী বা জলাশয় ও অরণ্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

❖ তৃতীয় অধ্যায়:

নদীকেন্দ্রিক তীর্থসমূহের অনুকূল পরিবেশ অনুসন্ধান- এই অধ্যায়ে নদীকেন্দ্রিক তীর্থসমূহের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সরস্বতী, গঙ্গা ও নর্মদা নদীকেন্দ্রিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। কেন এই তিনটি নদীকেই বেছে নেওয়া হয়েছে? তার কারণ নির্বাচিত পুরাণগুলিতে গঙ্গা নদী ও নর্মদা নদীর বর্ণনা বিস্তৃত ভাবে মেলে। তাছাড়া সরস্বতী নদীর উল্লেখ বিশেষ ভাবে করা হয়েছে, কারণ ভারতীয় সভ্যতার আদিতে বৈদিক যুগ থেকে সরস্বতী নদীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরস্বতী নদী ভিন্ন প্রাচীন নদীকেন্দ্রিক আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। এই অধ্যায়ে প্রতিটি নদীর নামকরণ, ভৌগোলিক অবস্থান, বিবিধ আকরে তাদের উৎসানুসন্ধান, তাদের গতিপথ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া নদীগুলির নাব্যতা, কৃষিকার্যে জলের উপযোগিতা, বনজ সম্পদের প্রাচুর্য বিভিন্ন রাজন্য শক্তিকে রাজ্য স্থাপনে প্রলুব্ধ করেছিল, সেবিষয়ক বহুতথ্য এই অধ্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে।

❖ চতুর্থ অধ্যায়:

নির্বাচিত তীর্থসমূহের বিকাশ : ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট- এই অধ্যায়ে বিশেষ করে কাশী ও গয়াকে তীর্থ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'কাশী' ও 'বারাণসী' শব্দ দুটির নামকরণের ইতিহাস, তাদের ভৌগোলিক সীমা ও পুরাণে উল্লেখিত কাশীমাহাত্ম্যের বিশদ

---

[৩৪] চতুর্বিধানি তীর্থানি স্বর্গ মর্ত্যে রসাতলে।

দৈবানি মুনিশার্দূল আসুরাণ্যারূষাণি চ।।

মানুষাণি ত্রিলোকেষু বিখ্যাতানি সুরাদিভিঃ।

... ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈর্দেবৈর্নির্মিতং দৈবমুচ্যতে।। ব্রহ্মপু., ৭০.১৬-১৯

[৩৫] P.V.Kane, *op.cit.*, vol.4, p. 567.

আলোচনা করা হয়েছে। *বায়ুপুরাণে* কাশীর অবস্থানকে দার্শনিক ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।[৩৬] এরপর 'গয়া' শব্দটির নামকরণের ইতিহাস, ভৌগোলিক সীমা ও নির্বাচিত পুরাণসাহিত্যে গয়ামাহাত্ম্য বিষয়ক তথ্যের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে *বায়ুপুরাণের* গয়ামাহাত্ম্যকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যে গয়াকে শ্রীহরির আননের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৩৭]

❖ পঞ্চম অধ্যায়:

পুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের বহুমুখী গুরুত্ব- এই অধ্যায়ে কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানের বহুমুখী গুরুত্ব বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে তীর্থের গুরুত্ব, উপবাসাদি নানা ধরণের ব্রত, পূজা উপকরণাদি নানা সামগ্রী, প্রচলিত নানা প্রথা প্রভৃতি নানা বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

পুরাণ ও ইতিহাস চর্চার গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের *Political History of Ancient India* (১৯২৩ খ্রি.), নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (১৯৫০ খ্রি.), রণবীর চক্রবর্তী মহাশয়ের *ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব* (২০০৭ খ্রি.)। এসকল গ্রন্থ থেকে ভারতীয় রাজবংশ, রাষ্ট্র বিন্যাস, সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম, ভাষা-সাহিত্য-জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা, এমনকি ষোড়শ মহাজনপদের বিষয় এবং তীর্থগুলির পটভূমি জানতে একান্ত সহায়ক রূপে কাজে লেগেছে। গবেষণার বিষয় যেহেতু পুরাণে তীর্থ। ফলে পুরাণসাহিত্য বিচারের দিকে লক্ষ করা প্রয়োজন। যে কোনো গ্রন্থকে বিচার করতে গেলে, সেই গ্রন্থের সামাজিক পটভূমি জানা অত্যন্ত জরুরী। উপরি উক্ত গ্রন্থগুলি সেই পটভূমি প্রস্তুতিতে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। গবেষণা কার্যটি প্রস্তুত করতে MLA 7th edition রীতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জিকে দুটি ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিকে ও ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিকে স্বতন্ত্র ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তীর্থ বিষয়ক গবেষণায় যদি তীর্থক্ষেত্রগুলিতে সজমিনে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে তার মূল্যায়ন আরো যথাযথভাবে করা সম্ভব হত। কিন্তু বর্তমান গবেষকের পক্ষে সমস্ত তীর্থক্ষেত্র যাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে তীর্থ বিষয়ক এই

[৩৬] কাশীমপশ্যদ্‌ভ্রমধ্যে মাযামাধারসংস্থিতাম্। বায়ুপু., ১০৪. ৭৫

[৩৭] মধ্যে সরস্বতী সাক্ষাদ্ গযাক্ষেত্রং তথাননে। বায়ুপু., ১০৪. ৭৭

আলোচনা পর্যালোচনা থেকে পরবর্তীকালে উক্ত তীর্থগুলি পরিভ্রমণের একান্ত কৌতুহল তৈরী হয়েছে। প্রসঙ্গত, ইন্টারনেটে নানা তথ্যচিত্র দেখে বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা গবেষণা নিবন্ধে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পুরাণের লক্ষণ, সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন

১.১ পুরাণের স্বরূপ :

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পুরাণ। প্রাচীন ভারতীয় আচার-বিচার, সংস্কার, ধর্মকর্ম, শিল্প-সংস্কৃতির নানাবিধ বিষয় পুরাণে বিধৃত। সেদিক থেকে পুরাণকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বকোষ বলা হয়। পুরাণ সাহিত্য দু'প্রকারে বিভক্ত- অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। বর্তমানে প্রাপ্ত উপপুরাণের সংখ্যা প্রায় আটচল্লিশটি।[১] যত দিন এগিয়েছে এই সংখ্যারও বিস্তার ঘটছে। খ্রিস্টিয় দশম শতকে রচিত রাজশেখরের *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে সমস্ত বাঙ্ময়কে অপৌরুষেয় ও পৌরুষেয় ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়েছে।[২] অপৌরুষেয় শাস্ত্র হল শ্রুতি। আর পৌরুষেয় হল পুরাণ, আন্বীক্ষিকী, মীমাংসা ও স্মৃতিশাস্ত্র।[৩]

কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে পুরাণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বেদে উল্লিখিত আখ্যানসমূহ হল পুরাণ এবং তার সংখ্যা আঠার।[৪] এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে গ্রন্থে জগতের সৃষ্টি, প্রলয়, কল্প, মন্বন্তর ও বংশচরিত বর্ণিত, তা পুরাণ পদবাচ্য।[৫] পুরাণের একটি প্রকার হল ইতিহাস, যা পরক্রিয়া ও পুরাকল্প ভেদে দ্বিবিধ। বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারত*ও পুরাণশাস্ত্রের অন্তর্গত।[৬] এছাড়া

---

[১] *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১১, পৃ.৫৫৫

[২] তচ্চ দ্বিধা অপৌরুষেযং পৌরুষেযং চ। *কাব্যমীমাংসা*, দ্বিতীয় অধ্যায়

[৩] পৌরুষেযং তু পুরাণম্ আণ্বীক্ষিকী মীমাংসা স্মৃতিতন্ত্রমিতি চত্বারি শাস্ত্রাণি। *কাব্যমীমাংসা*, দ্বিতীয় অধ্যায়

[৪] তত্র বেদাখ্যানোপনিবন্ধনপ্রাযং পুরাণমষ্টাদশধা। *কাব্যমীমাংসা*, দ্বিতীয় অধ্যায়

[৫] সর্গঃ প্রতিসংহারঃ কল্পো মন্বন্তরাণি বংশবিধিঃ।

জগতো যত্র নিবদ্ধং তদ্‌বিজ্ঞেযং পুরাণমিতি।। *কাব্যমীমাংসা*, দ্বিতীয় অধ্যায়

[৬] পরক্রিযা পুরাকল্প ইতিহাসগতির্দ্বিধা। স্যাদেকনাযকা পূর্বা দ্বিতীযা বহুনাযকা।। *কাব্যমীমাংসা*, দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুমানিক খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকের গ্রন্থ *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*তেও ধর্মের চতুর্দশ স্থানের মধ্যে সর্বপ্রথম পুরাণের অন্তর্ভুক্তি দৃষ্ট হয়।[৭]

পুরাণ কী? পুরাণ হল একটি পারিভাষিক শব্দ।[৮] যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পুরাতন।[৯] এই বিষয়ে যাস্কাচার্যের মত, যা প্রাচীন হয়েও নবীন তাই পুরাণ।[১০] পাণিনি তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থে প্রাচীন কালে যার অস্তিত্ব ছিল সে অর্থে 'পুরাণ' বা 'পুরাতন' শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন।[11] *বায়ুপুরাণের* তথ্যানুসারে, প্রাচীন সময়ে যা জীবিত ছিল তাই পুরাণ।[১২] *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের* সাক্ষ্য অনুযায়ী, প্রাচীনকালে এই প্রকার হয়েছিল- এটিই পুরাণ।[১৩] এসব ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করলে, পুরাণ হল প্রাচীনকাল সম্বন্ধী একটি বিষয়।

পুরাণ সাহিত্যের প্রাচীনতা, পরম্পরা ও সংস্কৃতির গভীরতা বোঝাবার জন্য বিবিধ পুরাণে বারংবার বলা হয়েছে- সকল শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণ সর্বপ্রথম ব্রহ্মার দ্বারা স্মৃত হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্রহ্মার মুখ থেকে বেদসমূহ নির্গত হয়। কল্পান্তরে ত্রিবর্গের সাধন, পাবন ও শতকোটি শ্লোকবিশিষ্ট একটিমাত্র পুরাণই ছিল।[১৪] তবে পুরাণ সাহিত্যের প্রাচীনত্ব উপলব্ধি হয়

---

[৭] পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ।। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা,* ১.৩

[৮] *পুরাণপ্রবেশ,* গিরীন্দ্রশেখর বসু, পৃ. ১

[৯] পুরা ভবম্ ইতি পুরা + তন (ষ্টন) , হরিচরণ বন্দ্যোপাধায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৪৫

[১০] পুরাণং কস্মাত্ পুরা নবং ভবতি। যাস্ক, *নিরুক্ত,* ৩.১৯.২৯

[১১] *পুরাণ পরিচয়,* অশোক চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১

[১২] তত্রৈব.

[১৩] তত্রৈব.

[১৪] পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রাহ্মণা স্মৃতম্।

অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।।

পুরাণমেকমেবাসীত্ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।

বৈদিক সাহিত্যে পুরাণের উল্লেখ থেকে। বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম *অথর্ববেদসংহিতা*,[১৫] *শতপথব্রাহ্মণ* [১৬] ও *বৃহদারণ্যক* [১৭] ইত্যাদি গ্রন্থে পুরাণের উৎপত্তি বিষয়ক নানা তথ্য উক্ত রয়েছে। *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* মতে, ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলে স্বীকৃত।[১৮] ফলে পুরাণ কথাটি শুনলে প্রাথমিক ভাবে বৈদিকোত্তর সাহিত্য বলে মনে হলেও, উপর্যুপরি বৈদিক প্রমাণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় বৈদিককালে পুরাণ কেবল প্রচলিতই ছিল না বরং বেদের মতো তৎকালীন সমাজে আদৃতও ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণে পুরাণকে পঞ্চমবেদ রূপে গণ্য হত। ফলে পুরাণের উৎপত্তির ইতিহাস সুপ্রাচীন। পুরাণবিদেদের অন্যতম রাজেন্দ্রে চন্দ্র হাজরা মহাশয়ের মতে, 'পুরাণ' নামক সুপরিচিত সাহিত্যের মূলের সন্ধান পাওয়া যায় 'পারিপ্লব আখ্যানে'।[১৯] এরূপ নানা মতের প্রচলিত রয়েছে।

সংস্কৃত পুরাণসাহিত্যের আদর্শে রচিত জৈনপুরাণ ও বৌদ্ধপুরাণ। চব্বিশজন তীর্থঙ্করের আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে চব্বিশখানি মহাপুরাণ রয়েছে। জিনসেনাচার্যকৃত *আদিপুরাণে* এই সকল পুরাণের নামোল্লেখ রয়েছে।[২০] জৈনপুরাণ রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হলেন আচার্য বিমলসূরি। তিনি আনুমানিক প্রথম খ্রিস্টাব্দে *পউমচরিয়* নামে এক গ্রন্থকে পুরাণ বলে আখ্যা

ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্।। মৎস্য., ৫৩.৩-৪; বায়ুপু., ১.৬০-৬১; ব্রহ্মাণ্ডপু., ১.১.৪০-৪১; পদ্মপু., ৫.১.৪৫-৪৭; শিবপু., ৫.১.২৭-২৮; মার্কণ্ডেয়পু., ৪৫.২০-২১

[১৫] ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ। অথর্ব., ১১.৭.২৪

[১৬] অধ্বর্য্যুস্তাক্ষ্যে বৈ পশ্যতো রাজেত্যাহ... পুরাণং বেদঃ সো'যমিতি কিঞ্চিত্ পুরাণমাচক্ষীত। শতপথব্রা., ১৩.৪.৩.১৩

[১৭] স যথা আর্দ্রেন্ধাগ্নেরভ্যাহিতাত্ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরতি এবং বা অরে'স্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদং সামবেদো'থর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈব এতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি। বৃহ. উ., ২.৪.১০; শতপথব্রা., ১৪.৬.১০.৬

[১৮] স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবো'ধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদং মাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্। ছান্দোগ্যোপ., ৭.১.১

[১৯] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *'ইতিহাস' একটি প্রাচীন ভারতীয় চেতনা.*

[২০] *বাংলা বিশ্বকোষ*,, ১১ খণ্ড, পৃ. ৬৯৫-৭১৮

দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে রবিষেণ, গুণভদ্র প্রমুখেরা নানা জৈনপুরাণ রচনায় প্রয়াসী হন।[২১] বর্তমান নেপালী বৌদ্ধসমাজেও স্বতন্ত্র বৌদ্ধপুরাণ প্রচলিত আছে। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে পুরাণের উল্লেখ নেই। নেপালী বৌদ্ধগণ নয়খানি পুরাণ স্বীকার করেন। এই নয়খানি পুরাণ নবধর্ম নামে খ্যাত।[২২] শুধু তাই নয়, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ *ললিতবিস্তর* নিজেকেই মহাপুরাণ আখ্যা দিয়েছে।[২৩] আখ্যান, ইতিহাস, বৌদ্ধানুষ্ঠান-ব্রতাদি ও প্রধান প্রধান তথাগতের জীবনী এই পুরাণগুলিতে বর্ণিত।

১.২ পুরাণের লক্ষণ :

পুরাণের লক্ষণ বিভিন্ন আকরে ভিন্ন ভাবে পাওয়া যায়। *ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে* মীমাংসকদের দৃষ্টিতে (পূর্বপক্ষে) শঙ্করাচার্য[২৪] ও সায়ণাচার্য বেদভাষ্যে জগতের প্রথম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণকে পুরাণ বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫] শঙ্করাচার্যও *বৃহদারণ্যকভাষ্যে* একথা সমর্থন করেছেন।[২৬] এর থেকে বোঝা যায়, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিবরণমূলক পুরাণ বৈদিকযুগেও প্রচলিত ছিল। *বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ* প্রভৃতি মহাপুরাণে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ[২৭]

---

[২১] অশোক চট্টোপাধ্যায়, *পুরাণ পরিচয়*, পৃ. ২৮

[২২] *প্রজ্ঞাপারমিতা, গণ্ডব্যূহ, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, তথাগতগুহ্যক, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, ললিতবিস্তর, সুবর্ণপ্রভা* ও *দশভূমীশ্বর*। *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১১, পৃ. ৭১৮

[২৩] অথ শ্রীললিতবিস্তরো নাম মহাপুরাণম্। অশোক চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

[২৪] ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেযত্বাত্ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতে। ব্রহ্ম.সূ.ভা., ১.৩.৩২

[২৫] দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রেণৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থানুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্। ঐ.ব্রা.উপ., দ্র. *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১১, পৃ.৫৫৬

[২৬] ইতিহাস ইত্যুর্ব্বশীপুরুরবযোঃ সংবাদাদিরুর্ব্বশীহান্সরা ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব পুরাণমসদ্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদি। বৃহ., ২.৪.১০

[২৭] সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।। বিষ্ণুপু., ৩.৬.২৫; বায়ুপু., ৪.১৩

বিষয়ে বলা হয়েছে- সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ অর্থাৎ পুনর্সৃষ্টি ও লয়, বংশ অর্থাৎ দেব, বিভিন্ন রাজবংশ, বিভিন্ন ঋষিকুলের বংশাবলী, মন্বন্তর অর্থাৎ কোন্ কোন্ মনুর কতকাল অধিকার এবং বংশানুচরিত অর্থাৎ বিভিন্ন রাজবংশের রাজগণের সংক্ষিপ্ত বংশবর্ণনা পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ।[২৮] Pargiter মহাশয়ের ধারণা, 'পঞ্চলক্ষণ' প্রাচীন পুরাণগুলির বৈশিষ্ট্য।[২৯] শঙ্করাচার্য প্রভৃতির মতে বৈদিকসাহিত্যে উল্লেখিত পুরাণে কেবল সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত। সর্গ ভিন্ন বাকি চারটি বিষয় পরবর্তীকালে পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দে পুরাণের দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যথা- সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয়।[৩০] সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি। বিসর্গ অর্থাৎ যেভাবে এক বীজ থেকে অন্য বীজ উৎপন্ন হয়ে থাকে সেরূপ এক জীব হতে জীবান্তরের সৃষ্টিই বিসর্গ। বৃত্তি অর্থাৎ প্রাণিজগতের জীবননির্বাহ সামগ্রী বৃত্তি। রক্ষা অর্থাৎ যুগে যুগে ভগবান বিভিন্নরূপে লীলা করেন। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য ও পশুপক্ষীর রূপও ধারণ করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন বেদবিরোধীর ধ্বংস ও বৈদিক ধর্মের রক্ষণ ইহাই বিভিন্ন অবতারের মূল কার্য, সৃষ্টি রক্ষাই মূল উদ্দেশ্য, তাই ইহাকে রক্ষা বলা হয়। অন্তর অর্থাৎ মন্বন্তর। বংশ অর্থাৎ দেব, বিভিন্ন রাজবংশ, বিভিন্ন ঋষিকুলের বংশাবলী। বংশানুচরিত অর্থাৎ বংশতে উৎপন্ন যেসকল বংশধর অথবা মূল রাজা তাদের বিস্তৃত বিবরণ যেখানে কীর্তিত হয় তাহাই বংশানুচরিত পদবাচ্য। সংস্থা অর্থাৎ প্রতিসর্গ। হেতু হল জীবমাত্রের বোধক। জীব

---

[২৮] *পুরাণপ্রবেশ,* গিরীন্দ্রশেখর বসু, পৃ. ১২

[২৯] 'This term could not have been coined after the Pranas substantially took their present composition, comprising great quantities of other matters, especially brahmanic doctrine and ritual, dharma of all kinds and the merits of tirthas, which are often explained with emphatic prominence. It belongs to a time before these matters were incorporated into the Puranas. It is therefore ancient characteristics of the earliest puranas, and shows what their contents were.' Pargiter, *Ancient Indian Historical Tradition,* chap.III, pg. 36.

[৩০] সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষান্তরাণি চ।

বংশো বংশ্যানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রযঃ।।

দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ। ভাগবতপু., ১২.৭.৮-২২

অবিদ্যা দ্বারাই কর্ম করে থাকে। আর জীব অদৃষ্টহেতু প্রযুক্ত হয় বলিয়াই সৃষ্টি প্রলয়াদি সম্ভব হয়। অপাশ্রয অর্থাৎ যে তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্টি ও প্রলয় প্রকাশিত হয় তাই আশ্রয়।[৩১]

পুরাণের পঞ্চলক্ষণ বা দশলক্ষণ শেষ কথা নয়। *মৎস্যপুরাণে* পঞ্চলক্ষণ ব্যতীত আরও ছয়টি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যথা- ভুবনবিস্তার, দানধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রমবিভাগ, ইষ্টপূর্ত, দেবতাপ্রতিষ্ঠা।[৩২] ফলে দশলক্ষণ বা পঞ্চলক্ষণ অতিরিক্ত বিষয়ও পুরাণসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্রে* জয়মঙ্গলার ব্যাখ্যায় অতিপ্রাচীন একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে সৃষ্টি, প্রবৃত্তি, সংহার, ধর্ম ও মোক্ষ প্রয়োজন এই পাঁচটিই পুরাণের লক্ষণ।[৩৩]

১.৩ পুরাণের সংখ্যা ও বিষয়বস্তু :

মৎস্যপুরাণ-এ স্পষ্ট নির্দেশ করা রয়েছে, সর্বপ্রথম একখানি পুরাণই ছিল। তা থেকে ক্রমে ১৮টি পুরাণ উৎপন্ন হয়েছে।[৩৪] *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে* উল্লেখ রয়েছে, সকল শাস্ত্রের প্রারম্ভে ব্রহ্মা কর্তৃক

---

[৩১] অশোক চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩-৯

[৩২] উত্পত্তিং প্রলয়ং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।

বংশ্যানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্।।

দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্।

বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্।।

দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যত্ বিদ্যতে ভুবি।

তত্ সর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি।। মৎস্য., ২.২২-২৪

[৩৩] সৃষ্টিপ্রবৃত্তিসংহারধর্মমোক্ষপ্রযোজনম্।

ব্রহ্মভির্বিবিধৈঃ প্রোক্তং পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।। (জয়মঙ্গলা টীকা)

[৩৪] পুরাণমেকমেবাসীত্ তদা কল্পান্তরে'নঘ।

ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্।। মৎস্য., ৫৩.৪-৭

পুরাণ উৎপন্ন হয়েছিল, পরে তাঁর মুখ থেকে বেদসমূহ বিনির্গত হয়েছিল।[৩৫] *বিষ্ণুপুরাণে* মতে, পুরাণার্থবিশারদ (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সাথে পুরাণসংহিতা রচনা করেছিলেন। বলা হয় ব্যাসের সূতজাতীয় লোমহর্ষণনামে এক শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি ব্যাস তাঁকে পুরাণসংহিতা অর্পণ করেছিলেন। রোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য ছিল। তাঁদের নাম- সুমতি, আগ্নিবর্চা, মিত্রযু, শাংশপাযন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। এদের মধ্যে কশ্যপবংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপাযন এই তিন শিষ্য রোমহর্ষণের থেকে অধীত মূলসংহিতা অবলম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেছিলেন। উক্ত চারসংহিতার সারসংগ্রহ করে এই পুরাণসংহিতা রচিত হয়েছিল। *ব্রাহ্মপুরাণই* সকল পুরাণের আদি বলে কীর্তিত। পুরাণবিদ্‌গণ পুরাণগুলির অষ্টাদশ সংখ্যা নির্দেশ করেছেন।[৩৬]

১.৪ পুরাণের বিভাগ :

পুরাণ বিভাগ প্রসঙ্গে *বিষ্ণুপুরাণে* [৩৭] বলা হয়েছে, ব্যাসদেব প্রথমে একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেছিলেন। তা থেকে লোমহর্ষণ শিষ্যত্রয় তিনখানি সংহিতা প্রকাশ করেন। এই চারখানি

---

[৩৫] প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।

অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।। ব্রহ্মাণ্ডপু., ১.৫৮

[৩৬] আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।

পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।।

আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।

অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।। বিষ্ণুপু., ৩.৬.১৬-২১

[৩৭] কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপাযানঃ।

রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা।।

চতুষ্টযেনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে।

আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।।

অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে। বিষ্ণুপু., ৩.৬.১৯-২১

পুরাণসংহিতা থেকে পরবর্তীতে ১৮ খানি মহাপুরাণ ও তারও বহু পরে উপপুরাণ, উপোপপুরাণ[৩৮], ঔপপুরাণ[৩৯] এবং অসংখ্য তথা কথিত মাহাত্ম্য বিষয়ক, শতনাম সহস্রনাম স্তোত্র গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছিল।[৪০] ভারতীয় সংস্কৃতির মূলাধার পুরাণ। আদি পুরাণসংহিতা থেকে যে সকল পুরাণ সংকলিত হয়েছে, প্রত্যেকটি পুরাণ গভীরভাবে পাঠ করলে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। *বিষ্ণু, মত্স্য, ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম* প্রভৃতি পুরাণের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অংশ পড়লে বোঝা যায়, এসকল পুরাণের বর্ণিত বিষয়, এমনকী শ্লোকের সাদৃশ্য রয়েছে। কোনো পুরাণে অল্প কিছু শ্লোকের আধিক্য, আবার কোনো পুরাণে শ্লোকের হ্রাস, এতটুকুই পার্থক্য। সকল পুরাণেরই আদর্শ এক হওয়ায় এদের মধ্যে শ্লোকসাদৃশ্য ও বর্ণনাসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।[৪১]

বিষ্ণুপুরাণে যথাক্রমে ১৮খানি পুরাণের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে- প্রথম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় পাদ্ম, তৃতীয় বৈষ্ণব (বা *বিষ্ণুপুরাণ*), চতুর্থ শৈব, পঞ্চম ভাগবত, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম মার্কণ্ডেয়, অষ্টম আগ্নেয়, নবম ভবিষ্য, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত, একাদশ লৈঙ্গ, দ্বাদশ বারাহ, ত্রয়োদশ স্কান্দ, চতুর্দশ বামন, পঞ্চদশ কৌর্ম, ষোড়শ মাৎস্য, সপ্তদশ গারুড়, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড।[৪২] এই প্রত্যেকটি পুরাণেই সর্গ,

---

[৩৮] অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ ব্যতীত সেসকল পুরাণ বা পুরাণাংশ প্রচলিত রয়েছে তাদের উপোপপুরাণ ও ঔপপুরাণ বলা হয়।

[৩৯] একই

[৪০] *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১১, পৃ.৫৫৯

[৪১] তত্রৈব

[৪২] ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।

অথান্যন্নারদীযঞ্চ মার্কণ্ডেযঞ্চ সপ্তমম্।

আগ্নেযমষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।।

দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।

বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রযোদশম্।।

চতুর্দ্দশং বামনং কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।

মাত্স্যঞ্চ গারুডঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্।। বিষ্ণুপু., ৩.৬.২২-২৪

প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত কথিত রয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণের* এই তালিকা দেখে বোঝা যায় যে, একই সময়ে এই ১৮টি পুরাণ সংকলিত হয় নি। কারণ প্রথমে *ব্রহ্মপুরাণ,* তৎপরে *পদ্মপুরাণ* এই ভাবে একের পর এক ১৮খানি পুরাণ সংকলিত ও প্রচারিত হয়েছিল। শৈব, ভাগবত, আগ্নেয, কূর্মাদি নানান পুরাণে এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল এই পুরাণগুলিতে উক্ত তালিকাসমূহে নামের পৌর্বাপর্যের তারতম্য। এমতাবস্থায় কোন্ পুরাণ আগে ও কোন্ পুরাণ পরে রচিত সে কথা বলতে পারা মুসকিল। কিন্তু *বিষ্ণুপুরাণে* যে নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে অধিকাংশ পুরাণের (*পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ* ইত্যাদি) নামের তালিকার পৌর্বাপর্যের মিল রয়েছে।

আরেকটি সমস্যার বিষয় হল পুরাণ প্রদত্ত নামের তালিকা। যেমন- *বিষ্ণুপুরাণে* উল্লেখ রয়েছে যে প্রথমে *ব্রহ্মপুরাণ* ও *পদ্মপুরাণ* সংকলিত হয়েছিল, তৎপরবর্তীতে *বিষ্ণুপুরাণ।* কিন্তু যেসকল পুরাণ *বিষ্ণুপুরাণের* পরে প্রচারিত হয়েছে, সে সকল পুরাণের নাম কীভাবে *বিষ্ণুপুরাণে* আসল? অপরাপর পুরাণগুলি সম্বন্ধেও এই একই প্রশ্নের অবকাশ থাকে যায়। কেবলমাত্র নামোল্লেখ নয়, এক পুরাণ থেকে পুরাণান্তরের বিবরণাদির উদ্ধৃতি দেখা যায়। পুরাণের এধরণের অবস্থা দেখে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও দেশীয় পুরাবিদ্গণ বর্তমান পুরাণসমুহের নিতান্ত অর্বাচীন বলে স্বীকার করেন।[৪৩]

অধ্যায়ের শুরুতে পুরাণের লক্ষণ বিচার প্রসঙ্গে পঞ্চলক্ষণ, দশলক্ষণ ও একাদশলক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি পুরাণেই তীর্থমাহাত্ম্যের কথা ও তীর্থের বিবরণ কম বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণলক্ষণ প্রসঙ্গে তীর্থ শব্দটির কোনো প্রকার উল্লেখ দেখা যায় না। পুরাণলক্ষণে তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য নামে কোনো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না থাকলেও, পরোক্ষ ভাবে *মৎস্যপুরাণে* যে একাদশলক্ষণের[৪৪] উল্লেখ রয়েছে সেই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে

---

[৪৩] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১১, পৃ.৫৬০-৫৬১

[৪৪] উত্পত্তিং প্রলযং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।

বংশ্যানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্।।

দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্।

বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্।।

তীর্থস্থানের ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। একাদশলক্ষণের অন্যতম হল দানধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা। এই তিনটি বিষয় তীর্থের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেদিক থেকে বিচার করলে তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য বিষয়টি পুরাণলক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। অন্যদিকে পুরাণ রচনার স্থান নির্ণয়ে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ কোন পুরাণ কোন স্থানে রচিত হয়েছিল, তীর্থমাহাত্ম্যের দিকে লক্ষ করলে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা মেলে। অধিকাংশ পুরাণে তীর্থমাহাত্ম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চর্চিত হয়েছে। তীর্থমাহাত্ম্য কেবলমাত্র দেবমহিমা প্রতিষ্ঠা করতে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে তা নয়। প্রাচীন ভৌগোলিক তত্ত্ববর্ণনে ও সমাজ-সংস্কৃতি অনুধাবনে তীর্থমাহাত্ম্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

সকল ধর্মেই তীর্থযাত্রার প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। মুসলমানরা মক্কায় হজ্জ করেন, ইহুদীরা জেরুসালেমে বাৎসরিক তীর্থদর্শন করেন। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পোপগণ রোমে খ্রিস্টানদের বিশেষ তীর্থযাত্রার জন্য 'হোলি ইয়ার' নির্দিষ্ট করেন। জেরুসালেমের তীর্থস্থান সংরক্ষণ নিয়ে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্রুসেড হয়। রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের আধুনিক পাশ্চাত্য তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে আছে লরোটা (ইতা. লোরেইতো), সানতিয়াগো দে কোমপোসাতেলা, লর্ড্ (লূর্দ্) ও ফাতীমা। মধ্যযুগে ক্যানটারবেরি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। আমেরিকায় সেন্ট অয়ান (ফস্যাঁতান) দ্য বোপ্‌রেই (কুইবেক) ও গোয়াদালুপে ঈদালগো (মেকসিকো) প্রধান খ্রিস্টান তীর্থস্থান। ভারতীয়রা গঙ্গাস্নানকে পুণ্যার্জন মাধ্যম বলে মনে করেন। ভারতবর্ষে বারাণসী, নবদ্বীপ, পুরী, কেদারনাথ, গয়া, প্রয়াগ, হিংলাজ, বদরীনাথ ও অন্যান্য বহুস্থান ব্রাহ্মণ্য ও শৈব তীর্থস্থান হিসেবে চিহ্নিত। পুরাণ অনুযায়ী ভারতীয়দের সপ্ততীর্থ- অযোধ্যা, মথুরা, মায়া(বতী), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকাপুরী (উজ্জয়িনী) ও দ্বারাবতী মোক্ষ লাভের স্থান হিসেবে বিবেচিত।[৪৫]

ধর্মানুরাগী মানুষেরা পুণ্যার্জনের আশায় তীর্থযাত্রা করে থাকেন। তীর্থস্থানের সঙ্গে পীঠস্থানের নিবিড় যোগ। 'পীঠ' বা 'পীঠিকা' শব্দের অর্থ 'আসন'। কোনও মহাপুরুষ যে আসনে বসে

দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যত্ বিদ্যতে ভুবি।

তত্ সর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি।। মৎস্য., ২.২২-২৪

[৪৫] *বাংলা বিশ্বকোষ*,, খণ্ড ২, পৃ. ৭২৬

তপস্যা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন, সেই আসন বা স্থানটি তদীয় অনুবর্তীদিগের কাছে পুণ্যক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।[৪৬] ভগবান বুদ্ধের বোধিলাভের শিলাসন এবং ক্ষেত্র বৌদ্ধগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয়। ক্রমে যে কোনও দেবতা বা সিদ্ধাচার্যের মন্দির বা আবাস বোঝাতেও পীঠ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মধ্যযুগের তন্ত্রসমূহে কতকগুলি শাক্ত ও শৈব তীর্থকে পীঠস্থান হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই তীর্থসমূহের সংখ্যা ও নামের তালিকার তারতম্য লক্ষ করা যায়।[৪৭] পরিশেষে পীঠস্থানের তালিকার সঙ্গে বিষ্ণুকর্তৃক শিবের স্কন্ধস্থিত সতীর শবদেহ ছিন্নের কাহিনি জড়িত রয়েছে। যে স্থানে সতীর অঙ্গবিশেষ পড়েছে, তা এক একটি পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। দেবীর অঙ্গবিশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত যোনিকুণ্ড ও স্তনকুণ্ড সংজ্ঞক তীর্থাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। *ভবিষ্যপুরাণে* দশ প্রকার কুণ্ডের কথা উল্লেখ রয়েছে।[৪৮]

আদিমধ্যযুগের পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে পীঠস্থানের নামোল্লেখ দেখা যায়। যথা- জালন্ধর, উড্ডিযান, পূর্ণগিরি, কামরূপ অথবা উড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি, কামরূপ, শ্রীহট্ট।[৪৯] কিন্তু *আইন-ই-আকবরীতে* চারজন পীঠদেবীর নাম দেওয়া হয়েছে যথা- কাশ্মীর দেশে শারদা, বিজাপুর রাজ্যে তুলজা ভবানী, কামরূপে কামাখ্যা এবং পাঞ্জাবে জলন্ধরী।[৫০] বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে এই পীঠস্থানের সংখ্যার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কোথাও পীঠস্থান অষ্টাদশ, কোথাও দশ, কোথাও পঞ্চাশ, আবার কোথাও একশত আটটি। তদ্‌সত্ত্বেও পীঠনির্ণয়ে ও মহাপীঠ নিরূপণে, অর্বাচীন গ্রন্থে ও বর্তমান সমাজে শাক্তপীঠের সংখ্যা একান্নটি। যে একান্নটি স্থান বর্তমানে দেবীপীঠ বলে স্বীকৃত।

---

[৪৬] *ভারতকোষ*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৯০

[৪৭] তত্রৈব

[৪৮] চতুরস্রং চ বৃত্তং চ পাদার্ধং চার্ধচন্দ্রকম্।

যোন্যাকারং চংদ্রকং চ অষ্টার্ধমথ পংচমম্।।

সপ্তার্ধং চ নবার্ধং চ কুংডং দশকমীরিতম্। ভবিষ্যপু., বিবিধবিধিকুণ্ডনির্ণয়, মধ্যমপর্ব, ৫ম অধ্যায়

[৪৯] *ভারতকোষ*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৯০

[৫০] তত্রৈব

অনেকগুলি পীঠস্থানই বাংলা ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় ছোট তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত। যেমন- চট্টল, ত্রিপুরা, কালীঘাট, যশোহর ইত্যাদি।[৫১]

ভারতবর্ষের তীর্থবিকাশের ক্ষেত্রে *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* অবদান তুলনাহীন, অধিকাংশ তীর্থের মূলে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনির বীজ নিহিত রয়েছে। যা সেই স্থানকে পবিত্রস্থান হিসেবে মান্যতা ও প্রতিষ্ঠা দান করেছে। ভারতীয় পবিত্রস্থান পরম্পরায় *রামায়ণ-মহাভারতের* অবদান অনস্বীকার্য। বহু পবিত্রস্থান বিকাশের ক্ষেত্রে *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* কাহিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো সাধারণ স্থান অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে কেবলমাত্র কাহিনির সাথে যুক্ত হয়ে। ফলে *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* বর্ণিত নানা স্থান তীর্থ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর অন্যতম উদাহরণ হল সম্প্রতি অযোধ্যার রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা। মহাকাব্য হিসেবে *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* প্রভাব ভারতীয় জীবনে ওতোপ্রত ভাবে জড়িয়ে, একথা অনস্বীকার্য। কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আসে অর্থনৈতিক দিকও। নিঃসন্দেহে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক উপাদান একে অন্যের পরিপূরক। কোনো স্থানের অর্থনৈতিক দিককে সল্পকালের মধ্যে সুদৃঢ় করতে গেলে ধর্মীয় উপাদান ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তা অতীত কাল থেকে অদ্যাবধি অপরিবর্তনীয়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা কোনো স্থানের ধর্মীয় দিককে বিকশিত করতে সরাসরি সাহায্য করে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা। এসমস্ত দিক বিবেচনা করলে, তীর্থের বহুমুখীগুরুত্ব অনস্বীকার্য। ফলে পুরাণসাহিত্যে আলোচিত তীর্থমাহাত্ম্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত সমাজ ও সংস্কৃতির কৃষ্টি বহন করে চলেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

[৫১] তত্রৈব

দ্বিতীয় অধ্যায়

তীর্থ : বিবিধ আকরে তার অর্থবিচার

তীর্থ শব্দটির ব্যুৎপত্তি √তৃ + থ (থক্)- ণ। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল "তরতি পাপাদিকং যস্মাত্"।[১] পাণিনীয় *ধাতুপাঠে* √তৃ-এর অর্থ তরণ ও প্লবন।[২] বিবিধ শাস্ত্রে এই *তীর্থ* শব্দকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিবিধ অর্থে। *নিরুক্তে* বলা হয়েছে তুগ্ব শব্দের অর্থ তীর্থ।[৩] অর্থাৎ লোকেরা জলপানার্থ বা অবগাহনের জন্যে তূর্ণ অর্থাৎ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নদীর তীর্থে (ঘাটে) গমন করে থাকে।[৪] *অমরকোষে* তীর্থ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে দুটি ভিন্ন কাণ্ডে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথমটি হল- আদিকারণ, শাস্ত্র, ঋষিসেবিত জল (প্রভাস-পুষ্করাদি), তীর্থাপ্তবিদ্য।[৫] তীর্থ শব্দের অন্য আরেকটি অর্থ হল করস্থান। যেখানে অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলকে কাব্যতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যকে পৈত্রতীর্থ এবং অঙ্গুষ্ঠের মূলকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে হয়েছে।[৬] ঠিক এই একই ধরনের তীর্থের কথা *মহাভারতে* উল্লেখ রয়েছে। সেখানে কিছুটা ভিন্ন ভাবে করস্থানের পাঁচটি তীর্থ বিভাজনের কথা বলা হয়েছে। যথা- অঙ্গুল্যগ্রে দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলির মূলে আর্ষতীর্থ (স্মৃত্যন্তরে প্রাজাপত্যতীর্থ বলা হয়েছে), অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর

---

[১] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৪৭

[২] তৃ প্লবনতরণযোঃ। *ধাতুপাঠ*, ৯৬৯

[৩] সুবাস্তুর্নদী, তুগ্ব তীর্থং ভবতি, তূর্ণমেতদাযন্তি। যাস্ক, নিরু., ৪.১৫.৮

[৪] তুগ্বন্ শব্দের অর্থ তীর্থ। তূর্ণ শব্দের সাথে গম্ ধাতুর উত্তর বনিপ্ প্রত্যয়ে তুগ্ব শব্দটি নিষ্পন্ন। যাস্ক, নিরু., ৪.১৫.৮

[৫] নিদা-[পা]- নাগমযোস্তীর্থমৃষিজুষ্টজলে গুরৌ। অমর., ৩য় কাণ্ড, থান্তবর্গ, ২৭১

[৬] অঙ্গুল্যগ্রে তীর্থং দৈবং স্বল্পাঙ্গুল্যোর্মূলে কাযম্।

মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোঃ পৈত্রং মূলে হ্যঙ্গুষ্ঠস্য ব্রাহ্মম্।। অমর., ২য় কাণ্ড, ব্রাহ্মবর্গ, ১৩২

মধ্যভাগে পিতৃতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্মতীর্থ এবং পাণিমধ্যে বৈষ্ণবতীর্থ। বৈষ্ণবতীর্থকে তীর্থ সকলের মধ্যে প্রধান তীর্থ বলা হয়েছে।[৭]

শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থে তীর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যেখানে পাপাদির থেকে মুক্তি ঘটে তাই হল তীর্থ এবং যুগভেদে তীর্থ ভেদের কথাও বলা হয়েছে।[৮] এছাড়া Monier Monier-Williams-এর *A Sanskrit English Dictionary*-তে তীর্থ প্রসঙ্গে বলা রয়েছে- 'a passage, way, road, ford, stairs for landing or for descent into a rivers, bathing –place, place of pilgrimage on the banks of sacred streams, piece of water.'[৯] ইংরেজীতে *তীর্থ*-র প্রতিশব্দ হল Pilgrimage. *Webster Comprehensive Dictionary* অনুযায়ী Pilgrimage-এর অর্থ- 1. A long journey, especially one made to a shrine or sacred place, 2. Man's life as a journey through the world.[১০] The Oxford English Dictionary মতে Pilgrimage-এর অর্থ A journey made by a pilgrim.[১১] Diana L. Eck-র মতে তীর্থ

---

[৭] দেবর্ষিপিতৃতীর্থানি ব্রাহ্মং মধ্যেঽথ বৈষ্ণবম্।

নৃণাং তীর্থানি পঞ্চাহুঃ পাণৌ সন্নিহিতানি বৈ।।

আদ্যতীর্থন্তু তীর্থানাং বৈষ্ণবো ভাগ উচ্যতে। মহা., অনুশাসনপর্ব খণ্ড ৩৮, ২২অধ্যায়, ৩৬-৩৭

[৮] তরতি পাপাদিকং যস্মাত্। তৃ + "পাতৃতুদিবচীনি"। উণাং.২.৭। ইতি থক্। পুণ্যস্থানাদি। যুগভেদে তীর্থবিশেষস্য শ্রেষ্ঠত্বং পাদ্মে। কৃতে তু পুষ্করং তীর্থং ত্রেতাযাং নৈমিষন্তথা। দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গাং সমাশ্রযেত্।। তীর্থসংখ্যা যথা- তিস্রঃ কোব্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বাযুরব্রবীত্। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি।। রাজা রাধাকান্ত দেব, শব্দকল্প., পৃ. ৬২৫-৬৩০

[৯] Monier Monier Williams, *A Sanskrit English Dictionary,* p. 449

[১০] *Webster Comprehensive Dictionary* , Vol II, p. 958

[১১] A journey made by a pilgrim; a journey (usually of considerable duration) made to some scred place, as an act of religious devotion; the action of taking such a journey *The Oxford English Dictionary*, Vol XI, p. 829

শব্দটির মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগত সাদৃশ্য রয়েছে। যার সাধারণ অর্থ মূলত পথ বা রাস্তা অতিক্রম করা।[১২] এরূপ বিভিন্ন কোষগ্রন্থে তীর্থ শব্দের নানাবিধ অর্থ করা হয়েছে।

ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ *অষ্টাধ্যায়ীতে* 'শুণ্ডিকাদিভ্যোঽণ্'(৪।৩।৭৬)-সূত্রের ব্যাখ্যায় কাশিকাকার *তীর্থ* শব্দের উদাহরণ দিয়েছেন, এখানে তীর্থের অর্থ পবিত্রস্থান।[১৩] 'সমানতীর্থে বাসী' (৪।৪।১০৭) সূত্রে তীর্থ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্ধিত যত্-প্রত্যয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে তীর্থ-শব্দটির উল্লেখ রয়েছে এবং কাশিকাকারের ব্যাখ্যায় তীর্থ শব্দটি এখানে 'গুরু'কে নির্দেশ করে।[১৪] পালি অভিধানে তীর্থ শব্দটি পাওয়া যায় তীর্থকর হিসাবে। যার অর্থ A sect-founder, religious teacher।[১৫] তাছাড়া তীর্থ বলতে আরও নানা অর্থের উল্লেখ রয়েছে।[১৬]

বেদে তীর্থস্থান সম্পর্কিত কোনও সুনির্দিষ্ট সূত্র পাওয়া না গেলেও বৈদিকসাহিত্যে তীর্থ শব্দটির উল্লেখ মেলে। *ঋগ্বেদে* তীর্থ বলতে মূলত রাস্তাঘাট ও নদীপথকে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৭] বৈদিকসাহিত্যে সরস্বতী, দৃষদ্বতী প্রভৃতি নদীকে দেবী তথা পবিত্রসত্তারূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নদীর তীরে যজ্ঞাদির উল্লেখও পাওয়া যায়। অর্থাৎ এসমস্ত তথ্যাদি থেকে আন্দাজ

---

[১২] 'The word tirtha is from Sanskrit verb tṛ/tarati, meaning "to cross over". The noun tirtha means a ford, as any watering or bathing place. It sometimes seans a path or passage more generally. The root verb tṛ includes subsidiary meaning- to master, to surmount, to fulfill, to be saved- as well as its primary meaning, to cross. The noun taraka, also dereived from tṛ, means a boat or ferry, as well as a pilot or savior.' Diana L. Eck

[১৩] বামন-জয়াদিত্য, *কাশিকাবৃত্তি*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬০

[১৪] তত্রৈব

[১৫] Robert Caesar Childres, *A Dictionary of Pali Language*, p. 509

[১৬] 'A landing-place or bathing-place in a river or tank, a Ghāt; a landing-place on the sea-coast, a harbor; a Guru or preceptor; the usual way, right way; a piece of water; religious belief.' Robert Caesar Childres, *A Dictionary of Pali Language*, p. 509

[১৭] ঋ., ১.৪৬.৮; ১.১৬৯.৬; ৪.২৯.৩

করা যায়, যে বৈদিক যুগে তখনও পর্যন্ত তীর্থক্ষেত্রের ধারণা গড়ে ওঠে নি। ব্রাহ্মণসাহিত্যে সাধারণভাবে যাত্রা বা ভ্রমণের কথা বলা হলেও, তীর্থযাত্রা বা ধর্মীয় যাত্রার কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।[১৮]

মহাজনেরা বলেন, 'মন চঙ্গা তো কঠৌতি মে গঙ্গা'। কিন্তু এতো গেল পুণ্যাত্মা মানুষের কথা। তীর্থ শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাত্রা শব্দটি। তীর্থ শব্দটির সঙ্গে পবিত্রতার একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক আছে। নদীর উৎস, নদীসঙ্গম ও নদীমোহনা প্রতিটি স্থানই মানুষের কাছে পরম পুণ্যস্থল। প্রতিদিনের দিনচর্যার বাইরে, অন্য কোথাও, অন্য কোনও বৃহত্তরের কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে চিরকাল আলোড়িত করেছে। এই বিশালতা হয়তো আকারেও নয়, প্রকারেও নয়। তীর্থস্থানের সাথে মিলে রয়েছে দূরত্বের ভাবনা, তা হতে পারে সুদূর হিমালয়, নয় সমতল প্রদেশ। ফলে যেখানে যাওয়া পুণ্যের তাই হল তীর্থ। সাধারণ মানুষ সেই সব জায়গায় পৌছবার জন্য দলে দলে যাত্রা করেন এবং এই প্রথা চলে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে।

পরবর্তী সময়ে ধর্মসূত্র ও প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে *তীর্থ* শব্দটি তীর্থযাত্রা বা ধর্মীয় যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়। *গৌতমধর্মসূত্রে* (১৯/১৪)[১৯] ও *বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রেও* (২২/১২)[২০] *প্রায়শ্চিত্ত* প্রসঙ্গে তীর্থের উল্লেখ রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্যগ্রন্থ *মনুসংহিতা* ও *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে* আচমনবিধি প্রসঙ্গে *তীর্থ* শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। যার অর্থ করতলের অংশবিশেষ, যা জল ধারণ করে।[২১] ব্রাহ্মতীর্থ,

---

[১৮] ঐ. ব্রা. ৭/১৫

[১৯] সর্বে শিলোচ্চযাঃ সর্বাঃ স্রবন্ত্যঃ পুণ্যা হ্রদাস্তীর্থানি ঋষিনিবাসগোষ্ঠপরিষ্কন্দা ইতি দেশাঃ। গৌ.ধ.সূ., ১৯/১৪

[২০] সর্বে শিলোচ্চযাঃ সর্বাঃ স্রবন্ত্যঃ পুণ্যা হ্রদাস্তীর্থান্যৃষিনিবাসগোষ্ঠপরিষ্কন্ধা ইতি দেশাঃ। বসিষ্ঠ.ধ.সূ., ২২/১২

[২১] অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে।

কাযমঙ্গুলিমূলেঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তযোরধঃ।। মনু., ২।৫৯ ; যাজ্ঞ. ১।২৯

কায়তীর্থ, দৈবতীর্থ ও পিতৃতীর্থ নামক চতুর্বিধ তীর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ *মনুসংহিতার* আরও দুটি শ্লোকে আচমনবিধি প্রসঙ্গে *তীর্থ* শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] অবশ্য এই স্থানে *তীর্থ* শব্দটির ব্যবহার স্তুতিমাত্র। *মনুসংহিতার* তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের কর্তব্যাকর্তব্য প্রসঙ্গে তীর্থ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[২৩] এখানে দৈব ও পিতৃকার্যে উপস্থিত ব্রাহ্মণের (কুলপরিচয়) অতিদূর থেকে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। কারণ, ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের হব্য ও কব্যের তীর্থস্বরূপ এবং পরীক্ষিত ব্রাহ্মণই অতিথিরূপে স্বীকৃত হন একথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকে তীর্থ-শব্দের অর্থ জল সংগ্রহের জন্যে যে পথ দিয়ে জলাশয়ে নামতে হয়, তা তীর্থ বা ঘাট এবং এই তীর্থের সাথে তুলনা করা হয়েছে ব্রাহ্মণের।

অর্থশাস্ত্রে যোগক্ষেম প্রসঙ্গে তীর্থ শব্দটি রাজপ্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা মহামাত্র (High Dignitaries) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৪] এছাড়া *অর্থশাস্ত্রে তীর্থ* শব্দটি মহামাত্র (High state dignitary) অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে।[২৫] নীতিশাস্ত্রের অন্যতম সোমদেবসূরিকৃত

---

[22] ব্রাহ্মণে বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেত্।

কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন পিত্র্যেণ কদাচন।। মনু., ২।৫৮

অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্মবিত্।

শৌচেপ্সুঃ সর্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ।। মনু., ২।৬১

[২৩] দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।

তীর্থে তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে সো'তিথিঃ স্মৃতঃ।। মনু., ৩.১৩০

[২৪] অলব্ধলাভার্থা লব্ধপরিরক্ষণী রক্ষিতবিবর্ধনী বৃদ্ধস্য তীর্থে প্রতিপাদনী চ। অর্থ., ১।৪।৬

[২৫] এবং শত্রৌ চ মিত্রে চ মধ্যমে চাবপেচ্চরান্।

উদাসীনে চ তেষাং চ তীর্থেষ্বষ্টাদশস্বাপি।। অর্থ., ১।১২।২০

নীতিবাক্যামৃত গ্রন্থে তীর্থ বলতে, তীর্থস্থানকেই বোঝানো হয়েছে।[২৬] কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল- যে স্থান এতটাই পবিত্র সেই স্থানের বসবাসকারী মানুষেরা প্রায়শই অধার্মিক, অতিনিষ্ঠুর, প্রবঞ্চক হয়ে থাকে।[২৭] প্রচলিত বাগ্‌ধারাতে তীর্থের কাক কথাটি লক্ষণীয়। যার অর্থ 'তীর্থে কাক ইব লোলুপত্বাত্' অর্থাৎ তীর্থস্থিত কাকের ন্যায় ব্যবহারী বা লোলুপ ব্যক্তি।[২৮] এই কারণেই হয়তো নীতিশাস্ত্রকার এরূপ বর্ণনা করেছেন।

বাল্মীকিকৃত *রামায়ণে* বহুস্থানে তীর্থের কথা উল্লেখ আছে। বালকাণ্ডে, অযোধ্যাকাণ্ডে, কিস্কিন্ধাকাণ্ডের বহুস্থানে *তীর্থ* শব্দটির পবিত্রস্থান (sacred sites) হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।[২৯] *মহাভারতের* বনপর্বে ৬৭তম অধ্যায় থেকে ১২৯তম অধ্যায় পর্যন্ত তীর্থযাত্রা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এইসকল অধ্যায়ে তীর্থ বলতে গঙ্গাদি তীর্থের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হিসেব করলে আনুমানিক ২৯৬টি তীর্থের নামও পাওয়া যায়।[৩০] এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তীর্থ তৎকালীন সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করেছে। উল্লেখ্য তীর্থের ফললাভের অধিকারী হিসেবে ক্রোধশূন্য, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, অহংকারশূন্য, কপটতাবর্জিত ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। যা গ্রন্থের পরবর্তী অনুশাসনপর্বে দানধর্মের প্রসঙ্গে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদে

---

[২৬] দানং তপঃ প্রাযোপবেশনং তীর্থোপাসনফলম্। তীর্থোপবাসিষু দেবস্বাপরিহরণং ক্রব্যাদেষু কারুণ্যমিব, স্বাচারচ্যুতেষু পাপভীরুত্বমিব প্রাহুঃ। নীতি., ২৭.৩-৪

সা তীর্থযাত্রা যস্যামকৃত্যনিবৃত্তিঃ। নীতি., ২৭.৫১

[২৭] অধার্মিকত্বম্ অতিনিষ্ঠুরত্বং বঞ্চকত্বং প্রাযেণ তীর্থবাসিনাং প্রকৃতিঃ। নীতি., ২৭.৫

[২৮] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৮, পৃ. ৫২

[২৯] যানি ত্বত্তীরবাসিনী দৈবতানি চ সন্তি হি।

তানি সর্বাণি যক্ষ্যামি তীর্থান্যাযতনানি চ।। বাল্মীকি, রাম., ২।৫২।৯০, উদ্ধৃত, Pranati Ghosal, "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p. 65

[৩০] Pranati Ghosal, "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p. 65

তীর্থের উৎকর্ষকথন বিষয়ে আলোচনায় বিস্তৃত ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে শ্রেষ্ঠ তীর্থ কী? সেবিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে গঙ্গাদি তীর্থকে উৎকৃষ্ট বলা মান্যতা দেওয়া হলেও,[৩১] সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম পবিত্র তীর্থ হিসেবে ধৈর্যশীল ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হয়েছে।[৩২] এ প্রসঙ্গে মানুষের কিছু গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল সরলতা, সত্য, কোমলতা, অহিংসা, দয়া, বহিরিন্দ্রিয় দমন ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, এসকল গুণাবলী তীর্থাবগাহন নিমিত্তস্বরূপ।[৩৩] যে ব্যক্তি মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বদুঃখসহিষ্ণু ও পরিগ্রহশূন্য হয়ে ভোজন করে থাকে, তাকেও পবিত্র তীর্থের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[৩৪] একই ভাবে তত্ত্বজ্ঞানী ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তিকে প্রধান তীর্থস্বরূপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৩৫] এই ভাবে নানাবিধ শরীরস্থ তীর্থের কথা বর্ণনার পরে পার্থিব তীর্থের কথা বলা হয়েছে। মানব শরীরের উদ্দেশা অর্থাৎ দক্ষিণকর্ণ যেমন পবিত্র অংশ বলে কথিত, সেরকম ভাগা অর্থাৎ গঙ্গাদির অংশবিশেষ ও তার জলও পবিত্র বলে কথিত।[৩৬] সিদ্ধিলাভের হেতু হিসাবে মানব হৃদয়ে দয়া প্রভৃতি বৃত্তি এবং পৃথিবীর গঙ্গা প্রভৃতি অংশবিশেষ পবিত্র তীর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত উভয়

---

[৩১] সর্ব্বাণি খলু তীর্থানি গুণবন্তি মনীষিণঃ। মহা., অনুশাসনপর্ব, ৯৫.২

[৩২] মহা., অনুশাসনপর্ব, ৯৫.৩

[৩৩] অহিংসা সর্বভূতানামানৃশংস্যং দমঃ শমঃ। মহা., অনুশাসনপর্ব, ৯৫.৪

[৩৪] নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।

শুচযস্তীর্থভূতাস্তে যে ভৈক্ষমুপভূঞ্জতে।। মহা., অনুশাসনপর্ব, ৯৫.৫

[৩৫] তত্ত্ববিত্ত্বনহংবুদ্ধিস্তীর্থপ্রবরমুচ্যতে। মহা., অনুশাসনপর্ব, ৯৫.৬

[৩৬] শরীরস্য যথোদ্দেশাঃ শুচিযঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

তথা পৃথিব্যা ভাগাঃ পুণ্যানি সলিলানি চ।। মহা., অনুশাসনপর্ব, ৯৫.১৬

তীর্থে স্নান করেন, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করে থাকেন।[৩৭] *মহাভারতের* এই অংশে গঙ্গাদি তীর্থের সঙ্গে মানব হৃদয়ের শুচিতাকে এক আসনে রাখা হয়েছে। এছাড়া বৈয়াসিক *মহাভারতে* গুরুকেও *তীর্থ* শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে।[৩৮] স্বল্প কথায় বলতে গেলে, *মহাভারতে* তীর্থ শব্দের দ্বারা গঙ্গাদি পার্থিবস্থান, বিশেষ গুণান্বিত মানুষ ও গুরুকে বোঝানো হয়েছে।

পুরাণসাহিত্যে তীর্থ শব্দটি পবিত্রস্থান বা তীর্থস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরাণে তীর্থ সম্পর্কিত তথ্যদির কথা জানা যায় দেব-দেবী, কোনো সাধু, সুত শৌনক, কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস, রোমহর্ষণ ঋষি প্রভৃতির কথোপকথন থেকে। কোনও কোনও স্থানে তীর্থ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শুভক্ষণ হিসাবে[৩৯], শ্রীকৃষ্ণের নাম হিসাবে।[৪০] এছাড়া তীর্থের প্রকারভেদ বিষয়ে নানা স্থানে নানা কথা বলা রয়েছে। কিন্তু *স্কন্দপুরাণের* কাশীখণ্ডে যে ত্রিবিধ তীর্থের কথা বলা হয়েছে, তা কোথাও যেন বৈয়াসিক *মহাভারতের* কথাকে মনে করিয়ে দেয়। যথা- *জঙ্গম, মানস* ও *স্থাবর* তীর্থ। ইহ জগতে ব্রাহ্মণগণের পবিত্র স্বভাদির জন্য তাকে *জঙ্গমতীর্থ* বলা হয়েছে।[৪১] সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ঋজুতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিযবাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য ও তপস্যাদি প্রতিটি গুণকে *মানসতীর্থ* বলা হয়েছে। এগুলির মধ্যে মনের যে বিশুদ্ধতাকে সকল তীর্থ

---

[৩৭] মনসশ্চ পৃথিব্যাশ্চ পুণ্যাস্তীর্থাস্তথাপরে।

উভযোরেব যঃ স্নাযাত্ স সিদ্ধিং শীঘ্রমাপ্নুযাত্।। মহা., অনুশাসনপর্ব, ৯৫.১৯

[৩৮] গুরুতীর্থং পরং জ্ঞানম্ অতস্তীর্থং ন বিদ্যতে। মহা. ১৩। ১৫। ১৭২৩-১৭২৫, উদ্ধৃত, Pranati Ghosal, "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p. 65

[৩৯] ভাগবতপু., ১।১২।১৪, দ্র. Pranati Ghosal, "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p.65

[৪০] 'তীর্থকোটি' ভাগবতপু., ৩।১।৪৫; 'তীর্থপাদ' ভাগবতপু., ১।৬।৩৪ দ্র. Pranati Ghosal, "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p.65

[৪১] ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সর্ব্বকামিকম্।

যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনাঃ জনাঃ।। *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৮, পৃ. ৪৫-৫২

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়। দেশভ্রমণ করলে আত্মার উন্নতি ও বহুদর্শিতা লাভ হয়ে থাকে। এজন্যেও ভারতীয়রা তীর্থযাত্রাকে পুণ্যদায়ক বলে মনে করেছেন। তীর্থ গমনে মন বিশুদ্ধ হবার সঙ্গে, সাধুদিগের দর্শনে আত্মাও পূত হয়ে থাকে। এই কারণে প্রতিটি মানুষের আত্মিক উন্নতির জন্য তীর্থযাত্রা আবশ্যক। সর্বাঙ্গ জলে ধৌত করলেই তীর্থস্নান হয় না। যেসকল মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করেছে, তারাই প্রকৃত তীর্থস্নায়ী। যে ব্যক্তি লোভী, ক্রুর, দাম্ভিক বা বিষয়াসক্ত, সে শত শত তীর্থে স্নান করলেও পাপ থেকে মুক্ত হয় না। কেবলমাত্র শরীরের পবিত্রতাই নয়, মানসিক পবিত্রতা প্রকৃত নির্মলতা প্রদান করে। তীর্থগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য চিত্তের শুদ্ধুলাভ। যদি অন্তঃকরণের ভাব পবিত্র না হয়, তাহলে দান, যজ্ঞ, শৌচ, তীর্থসেবা, সৎকথা শ্রবণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের আয়োজন করে কোনো ফললাভ হয় না। মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে যেখানেই অবস্থান করুক, সেই স্নানেই তার কাছে কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদয় তীর্থস্নান স্বরূপ। রাগদ্বেষ প্রভৃতি নেতিবাচক আবেগকে দূরে সরিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ জলে অবগাহন করা তীর্থস্নানের পর্যায়ভুক্ত। *স্থাবরতীর্থ* হল গঙ্গাদি পুণ্যপ্রদেশ। যেমন শরীরের অবযববিশেষ পবিত্র বলে গণ্য, সেরূপ পৃথিবীরও কতকগুলি প্রদেশ পুণ্যতম বলে বিখ্যাত। এরূপ তীর্থের প্রকারভেদও শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে।[৪২] সুতরাং পুরাণসাহিত্যেও তীর্থ শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

---

[৪২] শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানষে।

যেষু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রযাতি পরমাং গতিম্।।

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিযনিগ্রহঃ।

সর্ব্বভূতদযাতীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ।।

দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।

ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিযবাদিরা।।

জৈনসাহিত্যেও *তীর্থ* শব্দটি তীর্থকর হিসাবে প্রসিদ্ধ।[৪৩] তীর্থকর বা তীর্থঙ্কর শব্দের অর্থ হল 'জিন'। এখানে *তীর্থ* শব্দের অর্থ হল পবিত্র (pure) এবং 'কর' শব্দের অর্থ হল 'যে করে' (who does or acts)।[৪৪] হিন্দুদের মধ্যে যেমন দশাবতার, জৈনদের মধ্যেও সেরূপ ২৪টি অবতারের উল্লেখ রয়েছে। এই ২৪টি অবতারকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য হেমচন্দ্রতীর্থঙ্করের ২৫টি তীর্থঙ্করের নাম উল্লেখ করেছেন।[৪৫] খুব স্বাভাবিক ভাবেই জৈনদের

জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।

তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা।

এততে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণম্।। *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৮, পৃ. 45-52

[৪৩] তীর্থং সংসারসমুদ্রতরণং করোতি কৃ-খ-মুমচ। জিন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, *শব্দ-সাগর,* পৃ. ৩১৫

[৪৪] জৈন সাহিত্যে 'তীর্থ' শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। 'তীর্থং নাম প্রবচনং'- প্রবচন অর্থে উপদেশ। জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য মতে, যিনি সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সাধারণ লোককে সংসারয়ার্ণব হইতে তরণ করেন, তিনিই তীর্থঙ্কর। যেহেতু সাধু ও গৃহী শিষ্যবর্গ এই উপদেশের লক্ষ্য সেইজন্য সাধু সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকারূপ চতুর্বিধ সংঘও তীর্থ। এইজন্য আপ্তপুরুষ যখন কেবল-জ্ঞান লাভ করে সাধু,সাধ্বী, স্রাবক ও শ্রাবিকা-রূপ চতুর্বিধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন ও যখন তাঁর উপদেশ অবলম্বনে দ্বাদশাঙ্গ শ্রুত সাহিত্য নিরূপিত হয়, তখনই যথার্থতঃ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় বলা যায়। ইহা দ্বারা, ইহা হতে বা ইহাতে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় বলে এর নাম তীর্থ। বন্ধনমুক্ত কেবলীমাত্রই তাই তীর্থঙ্কর নন, তাঁরা সামান্য কেবলী। যাঁরা কেবল-জ্ঞান লাভ করবার পর তীর্থ প্রতীষ্ঠা করেন, শুধু তারাই তীর্থঙ্কর। যাঁরা জন্ম থেকে জ্ঞানবান ও লোকত্তরসৌভাগ্যসম্পন্ন তাঁরা তীর্থঙ্কর। শাস্ত্রে এদের বহুওবিধ বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। তবে এরা অবতার নন। কারণ এরা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আত্মা। আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা এরা তীর্থঙ্করত্ব অর্জন করেন ও মুক্ত হবার পর সংসারে আর প্রত্যাবর্তন করেন না। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন দশাবতার, জৈনগণের মধ্যেও সেরূপ ২৪টি অবতার আছেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, *শব্দ-সাগর,* পৃ. ৩১৫

[৪৫] অর্হন্ জিনঃ পারগতস্ত্রিকালবিত্ ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা পরমেষ্ঠ্যধীশ্বরঃ।

শম্ভুঃ স্বযম্ভূর্ভগবান্ জগত্প্রভুস্তীর্থঙ্করস্তীর্থকরো জিনেশ্বরঃ।।

স্যাদ্বাদ্যঽভযদসার্ব্বাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শিকেবলিনৌ।

দেবাধিদেববোধিদপুরুষোত্তমবীতরাগাপ্তাঃ।।

অর্থাৎ ১. অর্হন্, ২. জিন, ৩. পারগত, ৪. ত্রিকালবিৎ, ৫. ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা, ৬. পরমেষ্ঠী, ৭। অধীশ্বর, ৮. শম্ভু, ৯. স্বযম্ভূ, ১০. ভগবান্, ১১. জগৎপ্রভু, ১২. তীর্থঙ্কর, ১৩. তীর্থকর, ১৪. জিনেশ্বর, ১৫. স্যাদ্বাদ্য, ১৬, অভযদ, ১৭,

বিশ্বাস তীর্থঙ্কর দেবতা অপেক্ষা প্রধান। এছাড়া সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক (গৃহী উপাসক) ও শ্রাবিকা (গৃহী উপাসিকা) রূপ চতুর্বিধ সংঘকেও তীর্থ বলা হয়ে থাকে। জৈনাগমে উৎসর্পিণী ও অপসর্পিণী এই দ্বিবিধ কালের কথা বলা রয়েছে। জৈনদের মতে, বর্তমান কালের নাম অবসর্পিণী, তৎপূর্বে উৎসর্পিণী কাল ছিল। উৎসর্পিণীতে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন।[৪৬] বর্তমানে অপসর্পিণীতেও ২৪ জন তীর্থঙ্কর রয়েছেন।[৪৭] বর্তমানে অপসর্পিণীর তীর্থঙ্করগণই পূজিত হয়ে থাকেন। এক কথায় বলতে গেলে, যিনি এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করে মোক্ষ লাভের পথ নির্দেশ করেন তাঁকে তীর্থঙ্কর বলা হয়।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাকরণতীর্থ, ন্যাযতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, কাব্যতীর্থ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তীর্থ উপাধি ব্যবহার দেখা যায়। এই স্থানে তীর্থ শব্দটির অর্থ- স্নাত অর্থাৎ ব্যাকরণ, ন্যায, স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্রে যিনি নিষ্ণাত।

তীর্থ শব্দটির বিবিধ শাস্ত্রে বিচিত্র প্রয়োগ উপরি উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট। তীর্থ শব্দটি বৈদিকসাহিত্যে পথ ও নদীপথ হিসাবে চিহ্নিত হলেও পরবর্তী সাহিত্যে কালের গতিতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। লক্ষণীয় তীর্থ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই, তীর্থ শব্দের বিবিধ

সার্ব্ব, ১৮. সর্ব্বজ্ঞ, ১৯. সর্ব্বদর্শী, ২০. কেবলী, ২১. দেবাধিদেব, ২২. বোধিদ, ২৩. পুরুষোত্তম, ২৪. বীতরাগ, ২৫. আপ্ত। *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ৮, পৃ. ৫২-৫৩

[৪৬] ১. কেবলজ্ঞানী, ২. নির্ব্বাণী, ৩. সাগর, ৪. মহাযশ, ৫. বিমলনাথ, ৬. সর্ব্বানুভূতি, ৭. শ্রীধর, ৮. দত্ত, ৯. দামোদর, ১০. সুতেজ, ১১. স্বামী, ১২. মুনিসুব্রত, ১৩. সুমতি, ১৪. শিবগতি, ১৫. অস্তাগ, ১৬. নেমীশ্বর, ১৭. অনল, ১৮. যশোধর, ১৯. ক্রুরতার্থ, ২০. জিনেশ্বর, ২১. শুদ্ধমতি, ২২. শিবকর, ২৩. স্যন্দন, ২৪. সংপ্রতি। *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ৮, পৃ. ৫২-৫৩

[৪৭] ১. ঋষভদেব, ২. অজিতনাথ, ৩. সম্ভবনাথ, ৪. অভিনন্দন, ৫. সুমতি, ৬. পদ্মপ্রভ, ৭. সুপার্শ্ব, ৮. চন্দ্রপ্রভ, ৯। সুবিধি (অপর নাম পুষ্পদন্ত), ১০. শীতলনাথ, ১১. শ্রেযাংসনাথ, ১২. বাসুপূজ্য, ১৩. বিমলনাথ, ১৪. অনন্তনাথ, ১৫. ধর্ম্মনাথ, ১৬. শান্তিনাথ, ১৭. কুন্থূনাথ, ১৮. অরনাথ, ১৯. মল্লিনাথ, ২০. মুনিসুব্রত, ২১. নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি, ২৩. পার্শ্বনাথ, ২৪. মহাবীর বা বদ্ধমান। *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ৮, পৃ. ৫২-৫৩

অর্থের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, যেটি খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই অর্থই ধীরে ধীরে বস্তুগত থেকে আধ্যাত্মিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ কোনও সাধারণ স্থান ধীরে ধীরে মুক্তিক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। *তীর্থ* শব্দ দিয়ে যে বস্তুকেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তা তীর্থ শব্দটির অর্থবিস্তার ও লাক্ষণিক প্রয়োগের ফলে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা- গুরুকে তীর্থ হিসাবে বলা হয়েছে, কারণ তিনি জীবনের চরম বাস্তবতার সাথে পরিচয় করান। একইভাবে মহামাত্র তার প্রভুকে সঠিক পথের নির্দেশ দেন। পরিশেষে বলা যেতে পারে তীর্থ শব্দের অর্থগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যদিও কষ্টকর, তবুও সমস্ত অর্থের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তা হল- প্রতিটি অর্থই কিছু বস্তুর বা ব্যক্তির আরোহণ, উন্নতি ও পবিত্রতার কথা কীর্তন করে।

সংস্কৃত পুরাণসাহিত্যে তীর্থের বিবিধ শ্রেণী বিভাগ[৪৮] :

পুরাণসমূহে তীর্থসমূহের শ্রেণীবিভাগের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, বিভিন্ন পুরাণ পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নোল্লিখিত বিভিন্ন ধরণের তীর্থের ভেদ উপলব্ধ হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলির পাশাপাশি ভৌগোলিক তথা আঞ্চলিক উপাদানগুলিও তীর্থগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তীর্থের শ্রেণী বিভাগের নিম্নরূপ-

১. প্রকৃতির নানান উপাদানের নিরিখে : পর্বত, অরণ্য, সাগর, নদী, কুণ্ড, সরোবর, হ্রদ প্রভৃতি।

২. আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে : মণ্ডল, খণ্ড, ক্ষেত্র, উপ-তীর্থ।

৩. কার্যকারিতার নিরিখে : পিতৃক্ষেত্র, সিদ্ধক্ষেত্র, তন্ত্রক্ষেত্র, মুক্তিক্ষেত্র ও পশুক্ষেত্র (পশুদের মৃত্যু হলে সেখানে পশুদের মুক্তিলাভ ঘটে)।

৪. দেবদেবীর নিরিখে : ব্রহ্মক্ষেত্র, বিষ্ণুক্ষেত্র, শিবক্ষেত্র, সূর্যক্ষেত্র, পার্বতীক্ষেত্র, গাণপত্যক্ষেত্র প্রভৃতি।

---

[৪৮] অদিতি রায়, *সংস্কৃত অভিবাসনের প্রেক্ষিতে পদ্মপুরাণ*, পৃ. ৩৯৪

৫. চতুর্ধাম, সপ্তপুরী, পীঠস্থান, জ্যোতির্লিঙ্গ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তীর্থকে বিশেষ পর্যায়ে মান্যতা প্রদান করা হয়।

৬. তীর্থস্থানগুলিকে স্থাবর, জঙ্গম, মানসতীর্থের প্রেক্ষিতেও ভাগ করা যায়।

৭. সাম্প্রদায়িক ধর্মের নিরিখে : জৈনতীর্থ, বৌদ্ধতীর্থ, ব্রাহ্মণ্যতীর্থ, শৈবতীর্থ, শাক্ততীর্থ, বৈষ্ণবতীর্থ প্রভৃতি।

তীর্থযাত্রা ও তীর্থভাবনায় প্রাথমিকস্তরে রয়েছে দেশের জলসম্পদ। কেবল নদী নয়, মানসসরোবর থেকে পুষ্কর হ্রদ পর্যন্ত অসংখ্য জলক্ষেত্র, ছোট মাঝারি অজস্র প্রাকৃতিক জলাশয় তীর্থনামের গৌরবে অংশীদার। তীর্থকে বলা হয় তীর্থস্থান। কোনও নির্দিষ্ট দেবালয় বা গণ্ডিবদ্ধতায় তা নির্দিষ্ট নয়। তীর্থ বলতে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত স্থান, যেখানে সৌন্দর্য ও বিশালতার মেলবন্ধন ঘটে। তীর্থ মানুষের মনে এনে দেয় শান্তি লাভের বিশ্বাস ও মুক্তির বোধ। পুণ্যের বোধ সংস্কৃতিরই এক অংশ। ভারতবর্ষে তীর্থের এক একটি অংশ কোনও না কোনও ভাবে প্রাকৃতিক বিস্ময়। এই বিস্ময়ের এক দিক হল পঞ্চতীর্থ।

পঞ্চতীর্থ কী? পাঁচটি তীর্থের সমাহার হল পঞ্চতীর্থ। এই পঞ্চতীর্থ স্থান বিশেষে ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।[৪৯] যেমন *স্কন্দপুরাণের* কাশীখণ্ডে কাশীস্থিত পঞ্চতীর্থ বলতে বোঝায়, জ্ঞানবাপী, নন্দিকেশ, তারকেশ, মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি।[৫০] পুরুষোত্তম স্থানে মার্কণ্ডেয় বট, কৃষ্ণ, রৌহিণেয়, মহাসমুদ্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এই সকল নিয়ে হল পঞ্চতীর্থ। *তিথিতত্ত্বে* বলা

[৪৯] বিষুবদ্দিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থী বিধানতঃ। *তিথিতত্ত্ব,* উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১০, পৃ. ৫৯৩

[৫০] জ্ঞানবাপীমুপস্পৃশ্য নন্দিকেশং ততো'র্চ্চয়েত্।

তারকেশং ততো'ভ্যর্চ্চ্য মহাকালেশ্বরং ততঃ।

ততঃ পুনর্দ্দণ্ডপাণিমিত্যেষা পঞ্চগচতীর্থিকা।। *কাশীখণ্ড* ১০০.৩৯

হয়েছে, পুরুষোত্তমে পঞ্চতীর্থ করলে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে তার মুক্তি ঘটে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির মুক্তি লাভ হয়ে থাকে।[৫১] *বরাহপুরাণে* মতে, একাদশীতে বিশ্রান্তি, দ্বাদশীতে শৌকর, ত্রয়োদশীতে নৈমিষ, চতুর্দশীতে প্রযাগ এবং কার্তিকমাসে পুষ্কর এই পঞ্চতীর্থে স্নানাদি করলে অক্ষয় ফললাভ হয়ে থাকে।[৫২] *তিথিতত্ত্বে* বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, সেসকল তীর্থে স্নান করলে যে পুণ্যফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে, পঞ্চতীর্থের একটিতে স্নান করলেও সেরূপ পুণ্যফল প্রাপ্তি হয়।[৫৩] এভাবে স্থান ভেদে পঞ্চতীর্থের ভেদও লক্ষিত হয়। কিন্তু এত মাহাত্ম্য কীর্তনের মাঝেও এই কথাটি অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, নম্রতা হোক কী ভক্তিই হোক, মানুষের মধ্যে এই ভাবাবেগ তীর্থস্থানগুলিকে যে স্বাভাবিক সুরক্ষা দিয়েছে, তা অন্য কিছু দিতে পারে না।

প্রাচীন ভারতে পুরাণসাহিত্যে তীর্থের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেই তালিকা পরিশিষ্ট অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তীর্থের তালিকা নির্মাণের জন্য আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত পুরাণ গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে *কূর্মপুরাণের* পাঁচটি অধ্যায়ে, *মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ* ও *অগ্নিপুরাণের* একটি করে অধ্যায়ে কাশী বা বারাণসীমাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। *কূর্মপুরাণের* চারটি অধ্যায়ে, *মৎস্যপুরাণের* দশটি অধ্যায়ে ও *অগ্নিপুরাণের* একটি অধ্যায়ে প্রয়াগমাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। *কূর্মপুরাণের* একটি অধ্যায়ে

---

[৫১] মার্কণ্ডেযে বটে কৃষ্ণে রৌহিণেযে মহোদধৌ।

ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ স্নাতেয়া পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।। *তিথিতত্ত্ব,* উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ* খণ্ড ১০, পৃ. ৫৯৩

[৫২] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১০, পৃ. ৫৯৩

[৫৩] পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সর্ব্বণ্যেবাভিষেচনাত্।

তত্পঞ্চতীর্থস্নানেন সমং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। বরাহপু., উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১০, পৃ. ৫৯৩

কপালমোচনমাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। *কূর্মপুরাণের* তিনটি অধ্যায়ে, *মৎস্যপুরাণের* নয়টি অধ্যায়ে, *অগ্নিপুরাণের* একটি অধ্যায়ে নর্মদামাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। *বায়ুপুরাণের* আটটি অধ্যায়ে ও *অগ্নিপুরাণের* একটি অধ্যায়ে গয়ামাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। *অগ্নিপুরাণের* একটি মাত্র অধ্যায়ে গঙ্গামাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রায় প্রতিটি পুরাণেই কমবেশী নানা তীর্থে কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

তীর্থের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে নানা ভাবে তীর্থস্থানকে ভাগ করা হলেও, ভৌগোলিক দিক থেকে মূলতঃ পর্বত, নদী বা জলাশয় ও অরণ্য এই তিনটি শ্রেণীতে তীর্থস্থানকে পর্যালোচনা করা যায়।

১. তীর্থ হিসেবে পর্বতের মাহাত্ম্য বিচার :

বহুদূর বিস্তৃত প্রস্তরবহুল অত্যুচ্চ শিখরবিশিষ্ট ভূখণ্ডের নাম পর্বত। উচ্চতার উপর ভিত্তি করে পর্বত, গিরিমালা, ক্ষুদ্রপর্বত বা পাহাড়, উপলবহুল উচ্চভূমি ইত্যাদি নানা ভেদ দৃষ্ট হয়।[৫৪] বেদ ও পুরাণাদি গ্রন্থে হিমালয়াদি পর্বতকে জীবিত মানুষের মতো বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই পর্বতাদির সাথে বিভিন্ন দেবদেবীরও যোগ স্থাপন করা হয়েছে। কেবল ভারতীয় সভ্যতাতেই নয় গ্রীক, রোমান, আরবী প্রভৃতি সাহিত্যেও পর্বতের মাহাত্ম্যের কথার উল্লেখ রয়েছে। এই তালিকা থেকে বাদ যায় নি জৈনসাহিত্যও। জৈনসাহিত্যে গির্ণর ও পালিটানা, তুলজা, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি পর্বত দেবাধিষ্ঠিত।[৫৫] এছাড়া পর্বত শব্দটি শুনলেই যে বিষয়টি সর্বপ্রথম মনে আসে, তা

[৫৪] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১১, পৃ. ৫৭

[৫৫] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১১, পৃ. ৬১

হল সাতটি কুলপর্বত। *মার্কণ্ডেয়পুরাণ* [৫৬] মতে, মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, বিন্ধ্য, ঋক্ষ ও পারিপাত্র সপ্ত কুলপর্বত নামে প্রসিদ্ধ। তাছাড়া আটটি সাতটি বর্ষপর্বত,[৫৭] সীমাপর্বত,[৫৮] বিষ্কম্ভপর্বত[৫৯] প্রভৃতি নানা ধরণের পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া কোথাও কুড়িটি, কোথাও দশটি এরূপ নানা সংখ্যা পর্বতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।[৬০] কেবল প্রাকৃতিক পর্বত নয়, কৃত্রিম পর্বতের উল্লেখও পাওয়া যায়। যথা- ধান্যপর্বত, লবণ, গুড়াচল, হেমপর্বত, তিলাচল, কার্পাসপর্বত, ঘৃতপর্বত, রত্নশৈল, রাজতপর্বত ও শর্করাচল।[৬১] এই দশপ্রকার কৃত্রিম পর্বত প্রস্তুত করে দানের বিধি রয়েছে। দানের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে পুণ্যের প্রসঙ্গ। যে বিষয়টি

---

[৫৬] মহেন্দ্রো মলযঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।

বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈবাত্র কুলাচলাঃ।। মার্কণ্ডেয়পু., ৫৭.১০

[৫৭] হিমবান্ হেমকূটশ্চ ঋষভো মেরুরেব চ।

নীলঃ শ্বেতস্তথা শৃঙ্গী সপ্তাস্মিন্ বর্ষপর্ব্বতাঃ।। মার্কণ্ডেয়পু., ৫৪.৯

[৫৮] মার্কণ্ডেয়পু., ৫৪.১৯-২৭, পৃ. ২৪০

[৫৯] অযুতোচ্ছ্রায়স্তস্যাধস্তথা বিষ্কম্ভপর্ব্বতঃ।

প্রাচ্যাদিষু ক্রমেণৈব মন্দরো গন্ধমাদনঃ।। মার্কণ্ডেয়পু., ৫৪.২০

[৬০] *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১১, পৃ. ৫৬

[৬১] প্রথমো ধান্যশৈলঃ স্যাদ্দ্বিতীয়ো লবণাচলঃ।

গুড়াচলস্তৃতীযস্তু চতুর্থো হেমপর্ব্বতঃ।।

পঞ্চমস্তিলশৈলঃ স্যাত্ ষষ্ঠঃ কার্পাসপর্ব্বতঃ।

সপ্তমোঘৃতশৈলশ্চ রত্নশৈলস্তথাষ্টমঃ।।

রাজতো নবমস্তদ্বত্ দশমঃ শর্করাচলঃ।

বক্ষ্যে বিধানমেতেষাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।। মৎস্য., ৮৩.৪-৭

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। *কবিকল্পলতা* গ্রন্থে পর্বতের বর্ণনীয় বিষয় হল- মেঘ, ওষধি, ধাতু, বংশ, কিন্নর, নির্ঝর, গুহা, রত্ন, শৃঙ্গ, বন, জীবাদি ও উপত্যকা।[৬২]

বর্তমানেও দেখা যায় বহুতীর্থস্থান পর্বতে স্থিত এবং সেই স্থানগুলি অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে স্থিত। যথা- কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, অমরনাথ ইত্যাদি দুর্গম প্রদেশে নানা তীর্থস্থান রয়েছে। যেখানে মানুষ যায় কেবল পুণ্যার্জনে জন্য নয়, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অপরূপ। যাত্রাপথের নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ সেই সব দুর্গম প্রদেশে যায় পূণ্যার্জন তথা প্রকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের উদ্দেশ্যে।

কুএন্‌লুএন্ এবং হিমালয় পর্বত এশিয়া মহাদেশের দুইটি শ্রেষ্ঠ পর্বত। কুএন্‌লুএন্ এবং হিমালয় পর্বত একটি উত্তরে ও অপরটি দক্ষিণে তিব্বতের বিস্তৃত মালভূমিকে ঘিরে রয়েছে। এই দুই প্রাচীন পর্বতমালার মধ্যে পুরাণে বারংবার হিমালয় পর্বতের কথা বারংবার এসেছে। *ভাগবতপুরাণ* পঞ্চম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে, হিমালয়াদি পর্বতের দৈর্ঘ্যাদি বিষয়ে নানা কথা বলা হয়েছে। কেবল পর্বত হয়েই নয়, হিমালয় হয়ে উঠেছে এক পৌরাণিক চরিত্র। এই পর্বতের উপরেই শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের পুণ্যক্ষেত্র বা তীর্থগুলি অবস্থিত। যথা- কেদারনাথ, অমরনাথ, বদ্রীনাথ, বৈষ্ণো দেবী ইত্যাদি নানা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। *স্কন্দপুরাণের* হিমবৎখণ্ডে নানা তীর্থের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। বর্তনামে এই স্থানগুলি যেমন তীর্থস্থানও বটে আবার একই ভাবে প্রসিদ্ধ পর্যটন কেন্দ্রও বটে।

২. তীর্থ হিসেবে অরণ্যের গুরুত্ব বিচার :

অমরকোষ অনুযায়ী অরণ্যের পর্যায় হল অটবী, বিপিন, গহন ও কানন।[৬৩] ঋ গতৌ আধারে ইতি অন্য প্রত্যয় করে অরণ্য শব্দের নিষ্পত্তি। শাস্ত্রকারেদের মতে পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করে বনে যাবার যে ব্যবস্থা (বানপ্রস্থ আশ্রম) করা হয়েছিল সেই কারণে বনের অপর নাম

[৬২] শৈলে মেঘৌষধীধাতুবংশকিন্নরনির্ঝরাঃ।

শৃঙ্গপাদগুহারত্ন-বনজীবাদ্যুপত্যকাঃ।। *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১১, পৃ. ৫৭

[৬৩] অটব্যরণ্যং বিপিনং গহনং কাননং বনম্। অমর., ২য় কাণ্ড, বনৌষধিবর্গ

অরণ্য।[৬৪] অরণ্য হল অত্যন্ত পুণ্য ও পবিত্র স্থান। যে স্থানে বাস করলে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করা যায়, যা অন্য কোনো স্থানে বাস করলে হয় না। অরণ্য এই শব্দটির সাথে জুড়ে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ- আরণ্যক, বানপ্রস্থ, অভয়ারণ্য ইত্যাদি শব্দসমূহ। প্রতিটি শব্দই প্রাচীন ভারতে অত্যন্ত অর্থবহ শব্দ। প্রতিটি শব্দের সাথে জুড়ে রয়েছে অরণ্য বা বন শব্দটি। কোথাও অরণ্য হল জ্ঞানের আধার। যেখানে গুরু তার শিষ্যাদিকে গুহ্যবিদ্যা দান করেন। আবার কোথাও অরণ্য হল ত্যাগের বা বৈরাগ্যের দ্যোতক। সব মিলিয়ে অরণ্য সৃষ্টি করে এক রহস্যের বাতাবরণ। জনকোলাহল বর্জিত অরণ্য চলে ভিন্ন ছন্দে। *ঋগ্বেদের* অরণ্যানী সূক্তে[৬৫] ঋষি ঐরম্মদ দেবমুনিকে অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসেবে 'অরণ্যানী' নামক এক দেবতার স্তুতি করতে দেখা যায়। এই সূক্তে অরণ্যের বর্ণনার থেকে বেশী রয়েছে অরণ্যের রহস্য, রোমাঞ্চ ও প্রহেলিকার এক অনবদ্য অনুভূতি। অরণ্যের এই জগতে রয়েছে পশুর গর্জন, পাখীর কাকলি, পতঙ্গের অবিশ্রান্ত ডাক। সবকিছু মিলিয়ে অরণ্যে এক বিশেষ ধ্বনিলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অরণ্যানীকে মাতৃস্বরূপা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, ফলে মৃগমাতা অরণ্যানীকে প্রণতি জানিয়ে দেবমুনি স্তব শেষ করেছেন।[৬৬] প্রাকৃতিক নিয়ম অরণ্যকে দেয় এক অন্য মাত্রা, যা সূক্তের থেকে স্পষ্ট। এছাড়া অর্থনৈতিক দিক থেকে জলসম্পদের মত বনসম্পদও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

দেবীপুরাণে নয়টি প্রসিদ্ধ অরণ্যের নাম উল্লিখিত রয়েছে।[৬৭] যথা- সৈন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, কুরুজাঙ্গল, উপলাবৃত, আরণ্য, জম্বুমার্গ, পুষ্কর এবং হিমালয়। এই নয়টি অরণ্যকেই মহাপুণ্য ফলদায়ী তীর্থক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অরণ্যসমূহের অন্যতম নৈমিষারণ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। নৈমিষারণ্য বাল্মীকীয় *রামায়ণ,* বৈয়াসিক *মহাভারত* ও

---

[৬৪] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১, পৃ. ৫৩৩

[৬৫] ঋ., ১০.১৪৬

[৬৬] প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমসংশিষম্। ঋ., ১০.১৪৬.৬

[৬৭] সৈন্ধবং দণ্ডকারণ্যং নৈমিষং কুরুজাঙ্গলম্।।

উপলাবৃতমারণ্যং জম্বুমার্গো'থ পুষ্করম্।

হিমবাসস্ততো'রণ্য উত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। দেবীপু., ৭৮.২৯-৩০

পুরাণাদিতে পবিত্র অরণ্য হিসেবে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। পুরাণ মতে, সত্যযুগে নৈমিষারণ্যই তীর্থগণের মধ্যে প্রধান।[৬৮] বর্তমানে গোমতী নদীর পাশে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলায় নৈমিষারণ্য অবস্থিত। কেন এই স্থানের নাম নৈমিষ? এই প্রসঙ্গে *বরাহপুরাণে* বলা আছে, গৌরমুখ মুনি এখানে নিমিষকাল মধ্যে অসুরসৈন্য ও তাদের বল ভস্মীভূত করেছিলেন, এই কারণে এই স্থান নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত হয়েছে।[৬৯]

দেবীভাগবতে নৈমিষারণ্যের বিষয়ে বলা হয়েছে, একসময় ঋষিগণ কলিভয়ে ভীত হয়ে পিতামহ ব্রহ্মার স্মরণাপন্ন হলে, পিতামহের আদেশে ঋষিগণ এক অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই অরণ্যই নৈমিষক্ষেত্র বা নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত। এই স্থান অতি পবিত্র ও কলির এখানে প্রবেশাধিকার নিষেধ।[৭০] *কূর্মপুরাণের* উপরিভাগের ৪১তম অধ্যায়ে নৈমিষারণ্যের উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়।[৭১] যেখানে বলা হয় ভগবান ব্রহ্মা ঋষিগণের বসবাসের জন্যে নিজচক্র ক্ষেপন করেন। সেই চক্রের অগ্রভাগ অর্থাৎ নেমি যে স্থানে পতিত হবে সেই স্থান নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত হবে। এভাবে নৈমিষারণ্য নামটি হয়েছে। এই স্থানকে ত্রিশূলী মহাদেবের স্থান হিসেবে কল্পনা করা হয়।

---

[৬৮] কৃতে তু নৈমিষং তীর্থং ত্রেতাযাং পুষ্করং বরম্।

দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গা বিশিষ্যতে।। কূর্মপু., ১.৩৬.৩৫

[৬৯] এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।

উবাচ নিমিষেনেদ নিহতং দানবং বলম্।

অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্তেন নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্।

ভবিষ্যতি যথার্হং বৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।। বরাহপু., উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১০, পৃ. ৪৪৩

[৭০] দেবীভা., ১.২.২৮.৩২, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১০, পৃ. ৪৪৩

[৭১] ততো মুমোচ তচ্চক্রং তে চ তত্ সহনুব্রজন্।

তস্য বৈ ব্রজতঃ ক্ষিপ্রং যত্র নেমিরশীর্য্যত।।

নৈমিষং তত্ স্মৃতং নাম্না পুণ্যং সর্ব্বত্র পূজিতম্। কূর্মপু., উপরিভাগ, ৪১.৮-৯

বর্তমানে গোমতীতীরবর্তী এই নৈমিষার/ন্য এখন নিমখার বা নিমসর বা নৈমিষসর নামে খ্যাত। *আইন্-ই-অকবরী* থেকে জানা যায় এই স্থানে একটি বৃহৎ দুর্গ ছিল। এছাড়া হিন্দুদের অনেক দেবমন্দির ও একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই নামকরণ বিষয়ে একটি প্রবাদ আছে, দানবদের সাথে যুদ্ধকালে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র এইখানে এসে পড়ে। পুষ্করিণীর আকৃতি ষট্‌কোণী এবং ব্যাস প্রায় ৮০ হাত। এর মধ্যভাগ থেকে একটি জলস্রোত নির্ঝরাকারে উত্থিত হয়ে দক্ষিণাভিমুখে এক জলাভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই স্থানের নাম গোদাবরী-নালা। এই সরোবরকে ঘিরে বহু মন্দির ও ধর্মশালার সমাবেশ দেখা যায়। এই চক্রতীর্থের দক্ষিণ-পশ্চিমে উচ্চভূমির উপর ঐ দুর্গটি স্থাপিত। দুর্গটির পশ্চিমাংশে উচ্চ চূড়া শাহ-বুরুজ নামে খ্যাত। এই দুর্গটি ভাল মত লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, এর দ্বার ও শাহ-বরুজ এই দুটি স্থান অতি প্রাচীন ও হিন্দুদের রাজত্বের সময়ে নির্মিত। উক্ত দুটি স্থানেতেই তাদের গঠনাদি ও স্বস্তিকাদি চিহ্ন দেখলে তাদের প্রাচীনত্বের আর সন্দেহ থাকে না। স্থানীয় প্রবাদ হল, প্রাচীন দুর্গটি পাণ্ডবরাজগণের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই ধ্বংসাবশেষের উপর দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন খিলজীর উজীর হাহাজাল ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে ঐ দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করেন।[৭২] এরূপ বহুবিধ তথ্য ও কাহিনির সমাবেশ নানা আকরগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

৩. তীর্থ হিসেবে নদীর গুরুত্ব :

পর্বত থেকে নদীর উৎপত্তি, একথা সর্বজন বিদীত। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্মদা ইত্যাদি বহু নদী দেবীরূপা ও নদীরূপা হিসেবে বন্দিতা। নদীর বৈদিক পর্যায় হিসেবে ৩৭টি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় বেদ*নিঘণ্টুতে*।[৭৩] *ঋগ্বেদের* তৃতীয় মণ্ডল[৭৪] ও দশম মণ্ডলে[৭৫] নদীসূক্ত

---

[৭২] *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১০, পৃ. ৪৪৩

[৭৩] 'নদী' শব্দের বৈদিক পর্যায়- অবনি, যহব্য, খ, স্রোত, তরস্বতী, হরস্বতী, মাতৃ, রোধচক্র ইত্যাদি। *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ৯, পৃ. ৫১১

[৭৪] ঋ., ৩.৩৩

[৭৫] ঋ., ১০.৭৫

রয়েছে। যেখানে বিশিষ্ট নদীরূপে বিপাট্ ও শুতুদ্রি নদীর নাম রয়েছে। পৌরাণিক সাহিত্যে যা বিপাশা ও শতদ্রু নামে পরিচিত। ফলে বৈদিক যুগ থেকেই নদীর স্তুতির সূচনা, যা পৌরাণিক যুগে বিস্তার লাভ করেছে স্থানমাহাত্ম্য হিসেবে। পুরাণসাহিত্যে বর্ণিত নদীর সংখ্যা অসংখ্য। কুলপর্বত থেকে যে সব নদীর উৎপত্তি সেসকল নদীকে প্রধান নদীর তালিকা ভুক্ত করা হয়। এতদ্ভিন্ন নদীগুলিকে ক্ষুদ্র নদীর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নদী সাথে জড়িত নানা ছোট বড় জলাশয়, কুণ্ড ইত্যাদি। এই সকল জলাধারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তীর্থের সঙ্গে যে কোনো প্রকারের জলাশয়ের যোগ রয়েছে। এবিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

নদীকেন্দ্রিক তীর্থসমূহের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসন্ধান

ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তীর্থ। সদূর হিমালয় হতে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তীর্থস্থানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। পুরাণসাহিত্যের দিকে নজর দিলে বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল স্থানমাহাত্ম্য। স্থানমাহাত্ম্য কথাটি শুনলে স্বাভাবিক ভাবেই তীর্থ শব্দটির কথা মনে আসে। যার সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক উপাদানের অন্যতম হল নদী। পর্বতের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত নদ-নদী। যা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হল নদী। নদী শব্দটি পুংলিঙ্গে 'নদি' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'নদী' হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত। পুংলিঙ্গে নদি শব্দের অর্থ হল স্তুতি। স্ত্রীলিঙ্গে নদী শব্দের অর্থ জলপ্রবাহ। যে সকল জলপ্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্ত্রী তাকে নদী ও যে সকল জলপ্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুরুষ নাম নদ।[১] নদী ভারতীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক। নদীর গতি নিম্নগামী একথা সর্বজন বিদীত। নদী পর্বত প্রভৃতি উচ্চতর স্থান হয়ে নির্গত হওয়ায়, নদীর গতি প্রথম দিকে খানিকটা প্রখর হয়ে থাকে। পরে সমতলে এসে নদীর গতি কিছুটা মন্দীভূত হয়। দেশের মৃত্তিকার প্রকৃতির উপর নদীর গতি কিছুটা নির্ভর করে। কখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কখনো বা বালুকাদির দ্বারা নদীখাত ভরে গিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে থাকে। নদীর সাথে যে শব্দটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, তা হল নাব্যতা। নদীর নাব্যতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, প্রাচীন কালে রাজা, জমিদার ইত্যাদি ও বর্তমান কালে সরকারের সম্পদ। তাই হয়তো জলসম্পদ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ইত্যাদি নানা দেশে নানা নদীর অস্তিত্ব সর্বজন বিদিত। *বেদ,* পুরাণাদিতে অসংখ্য নদীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল নদীর অধিকাংশের আধুনিক নাম বা অবস্থান জানা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ কিছু নদীর নাম অপরিবর্তিত অবস্থাতেই রয়েছে, আবার কিছু নদীর নাম পরিবর্তিত হয়েছে। আবার কিছু নদীর গতি পরিবর্তিত হয়েছে, আর কিছু নদীর গর্ভ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত

[১] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৫১০

হয়েছে। পুরাণ ভিন্ন চকারাদি গ্রন্থেও বহু নদীর নাম দেখা যায়। পুরাণসাহিত্যে তথা বৈদিক সাহিত্যে নানা নদীর উল্লেখ থাকলেও যে নদীর নাম সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়ে থাকে তা হল সরস্বতী নদী।

ক. পুণ্যতোয়া সরস্বতী

ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে সপ্তপুণ্যতোয়া নদীর কথা সর্বদা স্মরণ করা হয়, সেই নদীগুলির অন্যতম হল সরস্বতী নদী। সরস্বতী নদী কতগুলি ভিন্ন প্রদেশের নদীর নাম হিসেবে চর্চিত। তার মধ্যে কুরুক্ষেত্রের সরস্বতী নদী প্রধান। *ঋগ্বেদে* সরস্বতী নদীকে শ্রেষ্ঠ ও অনেকাংশে তীর্থের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তীর্থের ধারণা প্রাগ্‌বৈদিক বলে অনুমান করা হয়।[২] বর্তমানেও বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের সময় জলশুদ্ধির মন্ত্র হিসেবে বলা হয়-

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলে'স্মিন্ সন্নিধিং কুরু।। (*পুরোহিতদর্পণ*)

অর্থাৎ পূজাকালে পূজার্থ জলে উক্ত পূতসলিলা সাতটি নদীর অবয়বের কথা কল্পনা চিন্তা করে, ঐ জল দ্বারা হিন্দুদের পূজা আরম্ভ করা হয়ে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য গবেষকেরা সরস্বতী নদীকে 'Fertile Crescent' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] অর্থাৎ সরস্বতী নদীর সংলগ্ন স্থানের উর্বরতা প্রাচীন ভারতে সরস্বতী নদীকে যে এক অনন্য মর্যাদায় উন্নীত করেছিল, সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

যাস্কের *নিরুক্তে* সরস্বতী শব্দের দুটি অর্থ বলা রয়েছে- নদীরূপা সরস্বতী ও দেবতারূপা সরস্বতী।[৪] *ঋগ্বেদভাষ্যে* সায়ণাচার্যও এই দ্বিবিধা সরস্বতীর কথা বলেছেন।[৫] এর থেকে বোঝা

---

[২] দীনেশচন্দ্র সরকার, *সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ*, খণ্ড ২, পৃ. ১২

[৩] "The phrase "fertile crescent" is the name given by some Western researchers to the crescent-moon-shaped area in the Middle East that incorporated ancient Mesopotamia (much in modern-day Iraq), the Levant, and, in some case, ancient Egypt." Charles J. Naegele, *Ancient History of India, Manusmṛti Revisited*, p. 16.

[৪] সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি। যাস্ক, নিরু. ২.২৩.৩

যায় প্রাচীনকাল থেকে সরস্বতীর দুটিরূপ সর্বজন বিদিত। নিরুক্তকার সরস্বতী শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন- সরস্বতী সর ইত্যুদকনাম সর্ত্তেস্তদ্বতী।[৬] সরস্ শব্দের আদিম অর্থ জল।[৭] কিন্তু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মতে, বর্তমানে যে বৈদিক শব্দগুলি অপ্রচলিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের মধ্যে সরস্ শব্দটি অন্যতম এবং সরস্ শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতি।[৮] সেই কারণেই সূর্যের অপর নাম বৈবস্বান্। বটব্যাল মহাশয়ের এই উক্তির সমর্থনে তেমন যুক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু *ঋগ্বেদে সরস্বৎ* শব্দটির তিন বার উল্লেখ রয়েছে। দশম মণ্ডলে (*ঋগ্বেদ* ১০.৬৬.৫) প্রথমান্ত 'সরস্বান্' হিসেবে, প্রথম (১.১৬৪.৫২) ও সপ্তম (৭.৯৬.৪) মণ্ডলে দ্বিতীয়ান্ত 'সরস্বন্তম্' হিসেবে। দশম ও সপ্তম মণ্ডলে 'সরস্বত্' শব্দের অর্থ জলাধিপতি ও প্রথমমণ্ডলে এর অর্থ সূর্য। সূর্য এখানে জলের গর্ভোৎপাদক, ফলে এর সাথে জলের সম্বন্ধ রয়েছে।[৯] সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে এরূপ কিছু কারণেই সরস্বতীর পর্যায় হিসেবে জ্যোতির্ময়ী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১০] স্বামী নির্মলানন্দ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ সরস্বতী শব্দের ব্যাখ্যায় নানা তথ্যের অবতারণা করেছেন।[১১]

সরস্বতী নদীর বহু পর্যায় নানা গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে। দেশ ভেদে সরস্বতী নদীর সাতটি নাম পাওয়া যায়- পুষ্করে সুপ্রভা, নৈমিষারণ্যে কাঞ্চনাক্ষী, গয়াদেশে বিশালা, উত্তর-কোশলে মনোরমা, কুরুক্ষেত্রে ওঘবতী, হরিদ্বারে সুরেণু ও হিমালয় পর্বতে বিমলোদা নামে প্রসিদ্ধ।[১২] *মৎস্যপুরাণে* শতরূপাকে সরস্বতী নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১৩] এছাড়া ভারতবর্ষে তিনটি নদী প্রধানতঃ

---

[৫] দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ। ঋভাষ্য. ১.৩.১২

[৬] যাস্ক, নিরু., ৯.২৬.৬

[৭] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *সরস্বতী*, পৃ. ৪১

[৮] তত্রৈব

[৯] তত্রৈব

[১০] তত্রৈব

[১১] স্বামী নির্মলানন্দ, *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন*, পৃ. ৪০

[১২] *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ২১, পৃ. ২৮৭

[১৩] শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে।

সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম, বেদোক্ত পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদী যা পাঞ্জাবের মধ্য হতে প্রবাহিত। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, প্রয়াগে এই নদী অন্তঃসলিলা হিসেবে বিরাজমান। দ্বিতীয়, রাজপুতানার আবু পাহাড় থেকে বেরিয়ে পালনপুর ও রাধনপুর রাজ্য দিয়ে সরস্বতী নদী প্রবাহিত। এই সরস্বতী নদীর উল্লেখ *স্কন্দপুরাণের* রেবাখণ্ডে রয়েছে। তৃতীয়, বাংলার হুগলী জেলায় একটি সরস্বতী নদী প্রবাহিত রয়েছে, যা পূর্বে গঙ্গার মূল স্রোত বলে পরিচিত ছিল।[১৪] এছাড়াও প্রয়াগতীর্থে ত্রিবেণীর পূর্বদিকে লুপ্ত সরস্বতীর কল্পনা করা হয়েছে। এমনকি হুগলীর কাছে ত্রিবেণীতে একটি নদীকে সরস্বতী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১৫] বৈয়াসিক *মহাভারতে* বলদেব তীর্থযাত্রায় সরস্বতী নদীর উল্লেখ রয়েছে।[১৬] এছাড়া পুষ্কর, উত্তরকোশল, ঋষভদ্বীপ, গয়া, গঙ্গাদ্বার, কুরুক্ষেত্র ও হিমালয় পর্বতের উপরে ভিন্ন ভিন্ন সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব দেখা যায়,[১৭] যা এই নদীর মাহাত্ম্যকে সমাজে নিরন্তর বহন করে চলেছে। অর্থাৎ সরস্বতী কোনো একটি পৃথক্ নদী নয়। বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক্ পৃথক্ সরস্বতীর অস্তিত্ব বর্তমান।

আর্যদের ভারত আগমন বিষয়ক তথ্যাদি সম্বন্ধে বৈদিক সূক্ত থেকে তেমন কিছু জানা যায় না। আর্যরা প্রথম কাবুল নদের উপত্যকা দখল করে বলে মনে করা হয়। শতদ্রু ও পাঞ্জাবের ঈশানকোণ পর্যন্ত তাদের অধিকার ছিল। সম্ভবতঃ তখনও তারা যমুনা ও গঙ্গা নদীর কথা জানতেন না। কিছু সময় পরে আর্যরা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে, ধীরে ধীরে সরস্বতী নদীর দু'দিকে বাসস্থান নির্মাণ করে এবং ক্রমে গাঙ্গেয় ভূমি পর্যন্ত অধিকার করে। ঋগ্বেদের সূক্ত থেকে এর থেকে বেশি কিছু জানা যায় না। অনুমান করা হয় আর্যরা যখন কুরু-পাঞ্চাল অধিকার করে, হয়তো ততদিনে ঋগ্বেদের সূক্ত রচনা শেষ হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে আর্যরা কোশল ও বিদেহ এই দু'টি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করে। আর্যগণ যখন সিন্ধুনদ পার করে গাঙ্গেয় ভূমিতে আসে, তখন থেকে আর্যদের ইতিহাসের প্রারম্ভ। প্রারম্ভিক পর্যায়ে সরস্বতী নদীর

সরস্বত্যথ গাযত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপঃ।। মৎস্য., ৩.৩১-৩২

[১৪] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ২১, পৃ. ২৮৯

[১৫] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৭

[১৬] তত্রৈব

[১৭] তত্রৈব

উভয়কূল আর্যরা আধিকার করেছিলেন। পাঞ্জাবের নদীগুলির মধ্যে সরস্বতী নদী পূর্ব দিকের প্রান্তভাগে প্রবাহিত ছিল এবং একসময় এই বিপুলা নদী সিন্ধুরই শাখা ছিল বলে মনে করা হয়। এই সরস্বতীনদীর তীরে ঋষিরা বাস করতেন।[১৮] আর্য ও সপ্তসিন্ধু বিষয়ক নানা তথ্য হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় *হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন।[১৯]

সিন্ধু এক সমুদ্রগামী নদী হওয়ায় সম্ভবতঃ *ঋগ্বেদে* তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সিন্ধুর পশ্চিম দিকে অবস্থিত উপনদীগুলি হল- সরযূ, সরস্বতী,[২০] রসা, কুভা, ক্রুমু, সুবাস্তু ও গোমতী। সিন্ধুর পূর্ব দিকের উপনদীগুলি হল- বিতস্তা, অসিক্নী, পরুষ্ণী, বিপাশ ও শুতুদ্রী।[২১]

এসকল নদীগুলির মধ্যে *ঋগ্বেদের* যে নদী নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, তার হল সরস্বতী নদী। এই সরস্বতী কিন্তু *অবেস্তার* হরখ্বৈতি নয়। এটি হল শুতুদ্রী বা সাতলেজেরও পূর্বে অবস্থিত সরস্বতী নদী। পূর্ব দিকের সরস্বতী ঋগ্বেদে একাধারে সিন্ধুর একটি উপনদী ও তা সরাসরি সমুদ্রগামী নদী, এই দু'ভাবেই বর্ণিত। সরস্বতী নদী শনাক্তকরণের প্রধান সমস্যা হল নদীটি শুষ্ক ও লুপ্ত। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী সহ বহু পণ্ডিতদের মতে, শুষ্ক হবার পূর্বে সরস্বতী নদী কচ্ছের রণ অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরবসাগরে মিশত। *ঋগ্বেদের* বর্ণনার অর্থ মেনে বহু বিশেষজ্ঞের ধারণা সরস্বতী নদীর উৎস হিমালয় পর্বতে থেকে।[২২] ইরফান হবিব এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সহমত নন। তাঁর মতে, যে সরস্বতী নদীকে সুপ্রাচীন সরস্বতীর সঙ্গে সচরাচর শনাক্ত করা হয়, সেই সরস্বতী নদী একটি ক্ষুদ্র ও গৌণ নদী। যার উৎস হিমালয় নয়, বরং শিবালিক পর্বতে। উদকবিদ্যা বিশারদদের (hydrographer) মত উদ্ধার করে ইরিফান হবিব গৌণ ও পার্বত্য এলাকার সরস্বতী নদীর হঠাৎ সমুদ্রগামীতা ও প্রবল পরাক্রান্ত সরস্বতী নদীতে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব বলে মনে করেন। তাঁর বিচারে *ঋগ্বেদের* সরস্বতী কবির কল্পনায় মূর্ত

---

[১৮] ঋ. ৮.২১.১৮ দ্র. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *তদেব*, পৃ. ৪১-৪২

[১৯] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, খণ্ড ৩, পৃ.১৩-১৮

[২০] *অবেস্তার* হরখ্বৈতি, বর্তমানে আফগানিস্তানের অর্ঘন্দব-হেলমন্দ নদীদ্বয়

[২১] রণবীর চক্রবর্তী, *ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব*, পৃ. ৯৫

[২২] *তদেব*, পৃ. ৯৬

হয়েছিল এবং এই নদীর পবিত্রতা ও মান্যতার সম্পর্ক রয়েছে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর অনুষঙ্গ।[২৩] গবেষক রাজেশ কোচের মতে, *ঋগ্বেদে* সমুদ্রগামী সরস্বতীর বর্ণনার মধ্যে আফগানিস্থানের হরখ্বৈতি-র স্মৃতিই সক্রিয় রয়েছে।[২৪] ফলে সরস্বতী নদীর সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান যে কী ছিল, তা পৃথক গবেষণার দাবি রাখে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সরস্বতী নদীর উৎস বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। ইতিহাস-পুরাণাদির বচন আলোচনা করে বলা যায় যে, হিমালয় পর্বতের প্লক্ষপ্রসবন থেকে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি। সরস্বতী নদী পুণ্যতীর্থ পৃথূদক অর্থাৎ পেহেবা কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মাবর্তপ্রদেশের মহিমা বাড়িয়ে ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে দ্বারকার কাছে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। যখন সরস্বতী নদী অন্তঃসলিলা হয় নি, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে সরস্বতী নদীর ন্যায় প্রকাণ্ড নদী আর ছিল না। এই সুপ্রসিদ্ধ পুরাতনী নদীর মহিমা বেদেও সুস্পষ্টভাবে কীর্তিত হয়েছে।[২৫]

প্রাচীনকালে সরস্বতী সর্বোত্তম তীর্থ হিসেবে পরিচিত ছিল। গন্ধর্বরাজ বিশ্ববসু সরস্বতী নদীর তীরে এক তীর্থ স্থাপন করেছিলেন।[২৬] সরস্বতী নদীর পবিত্রতার জন্য এই নদীর তীরে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবতাগণ পূর্বকল্পে যজ্ঞ করেছিলেন এবং ভারতভূমিকে কর্মভূমিরূপে গণ্য করে সরস্বতীর তীরবর্তী ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশকে তপস্যার উপযুক্ত পবিত্রতম ও সর্বোত্তম স্থানরূপ মনে করেছিলেন। তাই *মনুসংহিতাতে* উক্ত রয়েছে- সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর

---

[২৩] তত্রৈব

[২৪] তত্রৈব

[২৫] ঋ. ৭.৯৫.১-২, দ্র. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

[২৬] তত্রৈব

মধ্যস্থিত দেবনির্মিত দেশকে বুধজনেরা ব্রহ্মাবর্ত নামে অভিহিত করেছেন[২৭] এবং এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ব্রহ্মাবর্ত দেশের আচারকে সদাচার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮]

মহাভারতের শল্যপর্বে ৫৪তম অধ্যায়ে মহাপুণ্যতীর্থ রূপে সরস্বতীনদীর মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত রয়েছে।[২৯] *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* দেবী সরস্বতী কিভাবে নদীরূপে অবতীর্ণ হলেন সেই কথা বলা রয়েছে।[৩০] লক্ষণীয় বিষয় হল এই আখ্যানে গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিষ্ণুর তিন স্ত্রীরূপে বর্ণিত। স্ত্রীদের মধ্যে কলহ হওয়ায় তারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে একে অন্যকে অভিশাপ দেন। অভিশাপটিও বড়ই বিচিত্র, ধরায় যেখানে পাপীগণের বাস সেখানে গঙ্গা ও সরস্বতী নদীরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিরন্তর পাপীদের পাপাংশ লাভ করবে,[৩১] অর্থাৎ মানুষেরা এই দুই নদীতে অবগাহন করে নিজেদের পাপক্ষালন করবে, মানে পবিত্র হবে। গল্পটি খানিকটা অর্বাচীন হলেও, তীর্থের ভাবনা সেখানে সম্পৃক্ত।

প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে সরস্বতী নদীর ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে নানা স্থানে নানান কথা বলা হয়েছে, যা উপরি উক্ত আলোচনাতে স্পষ্ট। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থগুলির অন্যতম *ঋগ্বেদ* ও *মনুসংহিতাতে* সরস্বতী নদীর উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় দু'টি স্থানেই যেভাবে সরস্বতী নদীর কথা বলা হয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে, গ্রন্থ দু'টি রচনার সময় সরস্বতী নদী তখনও পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নি। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থলকেই বলা হয়- Land of the Vedas.[৩২] সমস্যা হল, সরস্বতী নদীর ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে। কিছু পণ্ডিতদের মতে, সরস্বতী নদী

---

[২৭] সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।

তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে।। মনু., ২.১৭

[২৮] তস্মিন্ দেশে য আচারং পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।

বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে।। মনু., ২.১৮

[২৯] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ২১, পৃ. ২৮৭

[৩০] *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* প্রকৃতিখণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়

[৩১] *তদেব*

[৩২] Charles J. Naegele, *ibid.*, p. 41.

প্রাচীনকালে আফগানিস্থান দিয়ে প্রবাহিত ছিল।[৩৩] এই যুক্তির পিছনে সমস্যা হল, আফগানিস্থান সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত অঞ্চল, ফলে সেখানে সমুদ্রের কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ *ঋগ্বেদে* বলা রয়েছে, সরস্বতী নদী পর্বত থেকে সমুদ্রে প্রবাহিত। বর্তমানে অধিকাংশ গবেষকেদের মতে, সরস্বতী নদী পূর্বের সিন্ধু নদীর দিকে প্রবাহিত, যা বর্তমানে অধিকাংশ ভাগই পাকিস্তানে।[৩৪] প্রায় একশো বছর আগে, ব্রিটিশ অফিসার Oldham গবেষণায় বলেন, ঘাগ্‌গর নামক একটি মরশুমি নদী ছিল। সেই নদীর খাত শুকিয়ে যায়। মরশুমি নদী বিস্তৃত খাত তৈরি করতে পারে না, ফলে কেবলমাত্র মরশুমেই সেই খাতে জল প্রবাহিত হত। এই নদীকেই পরবর্তীতে গবেষকেরা সরস্বতী নদী বলে মনে করেছেন।[৩৫] এরকম বিভিন্ন সময়ে নানা গবেষণা চলেছে। ১৯৭০-এর দশকে space satellite photographs থেকে বোঝা যায় সরস্বতী নদীর জল কিছু জায়গায় শুকিয়ে গিয়েছিল, আর কিছু জায়গায় ভূগর্ভস্থ হয়েছিল।[৩৬]

সরস্বতী প্রসঙ্গে এই বিস্তৃত আলোচনার শেষে গৌরী ধর্মপালের করা এই বক্তব্য সরস্বতীকে এক নতুন আঙ্গিকে চিনতে ও ভাবতে শেখায়- "যা সরে, চলে, স্পন্দিত হয় তাই সরস্। সরস্ মানে চঞ্চলতা- সৃষ্টির চঞ্চলতা, প্রাণের ঢেউ, আনন্দের জোয়ার, রসের পাথার। এক কথায় ব্রহ্মাণ্ড- জোড়া যত স্পন্দন, যত ঢেউ, সবই সরস্। আর এই ভুবন-ভরা চির-চঞ্চলতাকে যিনি ধারণ করে আছেন, কখনো চঞ্চলা কখনো অচঞ্চলা হয়ে, মা যেমন করে কোলে নিয়ে থাকেন দামাল ছেলে-মেয়েকে – তিনিই সরস্বতী। সরস্বতী এক বিপুল আলোর পারাবার। আলোর সমুদ্রে আলোর ঢেউ- আলো ভুবন-ভরা।"[৩৭]

পুরা কথা অনুসারে আজ থেকে বহু বৎসর পূর্বে গঙ্গা নদীর মত সরস্বতী নদীর তীরেও ছিল এক সভ্যতা। এই নদীর পর্যায় হিসেবে প্লক্ষসমুদ্ভবা, বাক্‌প্রদা, ব্রহ্মসুতা, ভারতী, বেদাগ্রণী,

---

[৩৩] "Some scholars have contended that river Sarasvatī is in Afghanistan." *ibid.,* p. 42.

[৩৪] "Mostly scholars today believe that river Sarasvatī ran east of the current Indus or Sindhu River that in large part is located in what is now Pakistan." Loc.cit.

[৩৫] Loc.cit.

[৩৬] Loc.cit.

[৩৭] গৌরী ধর্মপাল, *বেদ-আবহমান,* পৃ.১১

পয়োষ্ণীজাতা, বাণী, বিশালা, কুটিলা এই শব্দগুলি ব্যবহৃত। দেশ ভেদে এই নদী সাতটি নামে প্রসিদ্ধ- পুষ্করে সুপ্রভা, নৈমিষারিণ্যে কাঞ্চনাক্ষী, গয়াদেশে বিশালা, উত্তর কোশলাতে মনোরমা, কুরুক্ষেত্রে ওঘবতী, গঙ্গাদ্বারে সুরেণু ও হিমালয় পর্বতে বিমলোদা। এর থেকে বোঝা যায় যে সরস্বতী নদীর প্রসিদ্ধি প্রাচীনকালে গঙ্গার থেকে কোনও অংশে কম ছিল না। সরস্বতী নদীর প্রাচীনতা ও মাহাত্ম্যের কারণে এই নদীকেও অন্তঃসলিলা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এলাহাবাদের প্রয়াগ। বৈদিকযুগে আর্যগণ ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে আর্যাবর্ত এসে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেই সময় তারা এক একটি নির্মলসলিলা খরপ্রবাহা পুণ্যপ্রদা নদীতটে নিজেদের বাসভবন তৈরি করেন। সরস্বতী আর্যজাতির জীবনরক্ষার উপায়স্বরূপ হওয়ায় হয়তো আর্য ঋষিগণ নিয়তই এই নদীর স্তুতিগান করে গিয়েছেন। *ঋগ্বেদের* প্রথম মণ্ডল থেকে দশম মণ্ডলে বহু মন্ত্রে সরস্বতী নদীর উল্লেখ থাকায়, এরূপ ধারণা করা যায় যে আর্যসমাজ বহুদিন এই নদীতটে বাস করেছিল। ফলে আর্যদের উপনিবেশ যত উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে সরে আসতে লাগল ততই সরস্বতীর সীমা বর্দ্ধিত হয়েছিল। তাই হয়তো *মনুসংহিতায়* ব্রহ্মাবর্ত দেশের সীমানা হিসেবে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর কথা বলা হয়েছে।[৩৮] *ঋগ্বেদের* মন্ত্রের উক্তি হতে মনে হয় আর্য ঋষিগণ এই সকল স্থানকেই উপনিবেশের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেছিলেন।[৩৯] *অথর্ববেদের* মন্ত্র পাঠে বোঝা যায়, আর্যগণ সরস্বতী নদীর তীরে ভূমিকর্ষণ করে যব উৎপাদন করতেন।[৪০] সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে যখন আর্যগণ পূর্বাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তখন তারা ব্রহ্মাবর্তদেশ ত্যাগ করে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সুজলা সুফলা দোয়াব অঞ্চলে এসে উপনিবিষ্ট হন। হয়তো এই অঞ্চলের অনুকূল পরিমণ্ডলের কারণে সরস্বতী নদীর মাহাত্ম্য কিছুটা ম্লান হয়েছিল। কিন্তু পিতৃপুরুষের পূজনীয় পবিত্রতম সরস্বতীসলিলের মাহাত্ম্য তারা ভুলতে পারেন নি। তাই হয়তো *স্কন্দপুরাণের* রেবাখণ্ডে সরস্বতীমাহাত্ম্য বর্ণিত রয়েছে। যে সকল স্থান দিয়ে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হয়েছিল, সেই স্থানেই পাপনাশক বহুতীর্থের উৎপত্তি হয়েছে। যার স্পন্দন *মহাভারত*

---

[৩৮] সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।

তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে।। মনু. ২.১৭

[৩৯] দৃষদ্বত্যা মানুষ আপযাযাং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে। ঋ., ৩.২৩.৪

[৪০] যবং সরস্বত্যামধিমণাবচকৃর্ষুঃ। অথর্ব., ৬.৩০.১

ও পুরাণ বহন করে চলেছে। ফলে একটি সাধারণস্থানকে পূণ্যভূমির মর্যাদা প্রদান করবার ব্যাপারে ঔপনিবেশিক অনুকূল পরিবেশ একটি অন্যতম কারণ এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

খ. পতিতপাবনী গঙ্গা

দেবী সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্কর মৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।। (শঙ্করাচার্য, *গঙ্গাস্তোত্রম্*, ১)

বহু যুগ থেকে উত্তর-পশ্চিমে হরিদ্বার থেকে দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অগণিত মানুষ তাকে বন্দনা করেছে। ভারতবাসীর ভক্তিভরা কৃতজ্ঞ মনে গভীর দাগ কেটে বয়ে চলেছে গঙ্গা। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে উৎপত্তিস্থলের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে নদীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- হিমালয় থেকে সৃষ্ট নদী ও উপদ্বীপীয় নদী। হিমালয় থেকে সৃষ্ট নদীগুলির মধ্যে মুখ্য নদী হিসেবে ধারা হয়- গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু। উপদ্বীপীয় নদীগুলির মধ্যে মুখ্য নদী হিসেবে ধরা হয়- গোদাবরী, নর্মদা, মহানদী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রভৃতি। প্রাচীন ভারতবর্ষে সরস্বতী নদীর পরে যদি কোনও নদীকে পবিত্র ও জনপ্রিয় বলা যায়, নিঃসন্দেহে তা হল গঙ্গা নদী। সরস্বতীর দু'টি রূপের মত গঙ্গারও দু'টি রূপ। যথা- নদীরূপা ও দেবীরূপা। গবেষক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে গঙ্গা দুইটি- স্বর্গগঙ্গা ও ভাগীরথী। দিব্য সরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গা একই জিনিস। দিব্য সরস্বতী বা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী এবং স্বর্গগঙ্গা সূর্যাগ্নির কিরণধারা। ফলে আকাশগঙ্গা বিষ্ণুসূর্যের পা থেকেই নির্গত।[৪১] প্রাচীনকাল থেকে গঙ্গা পুণ্যসলিলা নদী নামে সুপরিচিত। হিন্দুদের দৃঢ় বিশ্বাস সকলতীর্থের মধ্যে গঙ্গা পবিত্রতম। গঙ্গায় মৃত্যু হলে নিকৃষ্টজাতি কীট থেকে মনুষ্য সকল প্রাণী মুক্তি লাভ করে। *ঋগ্বেদ* (১০.৭৫.৫) থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গা নামটি উল্লিখিত হয়েছে। পুরাণ, ইতিহাস, উপপুরাণ, মহাকাব্য সকল

[৪১] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *তদেব*, পৃ. ১১৫

প্রাচীন গ্রন্থেই গঙ্গার বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এই গঙ্গা কে? কোথা থেকে এর উৎপত্তি? এই বিষয় খতিয়ে দেখতে গেলে বহু প্রাচীন আখ্যান ও উপাখ্যানাদির দ্বারস্থ হতে হয়।

গঙ্গা শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়, গম্যতে ব্রহ্মপদমনযা গম্ গন্ (গম্যদ্যোঃ। উণ্ ১।১২২)। *নিঘণ্টু* মতে, গচ্ছতীতি গম্-গন্-টাপ্।[৪২] *নিরুক্তে* গঙ্গা শব্দের নির্বচনে বলা হয়েছে, গঙ্গা শব্দটি গম্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।[৪৩] *বরাহপুরাণে* গঙ্গার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে, 'গাং গতা' অর্থাৎ যে পৃথিবীর দিকে গিয়েছে।[৪৪] *পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে* (৬০.৬৪-৬৫) গঙ্গার মূলমন্ত্র উল্লেখ মেলে।[৪৫] *অমরকোষে* [৪৬] সহ নানা আভিধানে গঙ্গার পর্যায় শব্দগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে। যথা- বিষ্ণুপদী, জহ্নুতনয়া, ভাগীরথী, ত্রিস্রোতা, ত্রিপথগা, সুরনিম্নগা, ভীষ্মসূ, তীর্থরাজ, অর্ঘ্যতীর্থ, ঋষিকল্প, স্বাপগা, স্বরাপগা, সিদ্ধাপগা, স্বর্গাপগা, সরিদ্বরা, ত্রিদশদীর্ঘিকা, কুমারসু, হৈমবতী, সুরাপগা, স্ববাপী, হরশেখরা, ধর্মদ্রবী, সুধা, সিতসিন্ধু, অলকনন্দা, নন্দিনী, গান্দিনী, রুদ্রশেখরা, জহ্নুকন্যা, অধ্বগা, সিদ্ধসিন্ধু, উগ্রশেখরা, স্বর্গসরিদ্বরা, মন্দাকিনী, জাহ্নবী, স্বর্নদী, পুণ্যা, সমদ্রসুভগা, সুরদীর্ঘিকা, সুরনদী, জ্যেষ্ঠা, স্বরধুনী, জিহ্নুসুতা, ভীমজননী, শুভ্রা, ভবায়না, শৈলেন্দ্রজা এসবই গঙ্গার পর্যায়।[৪৭] প্রায় প্রতিটি নামের সঙ্গে রয়েছে পৌরাণিক নানা কাহিনি।

ভৌগোলিকদের মতে হিমালয় থেকেই গঙ্গা নদীর উৎপত্তি।[৪৮] হিমালয়ের যে স্থানে সাহেবদিগের শিমলা নগর আছে, তার দক্ষিণপূর্বে এই নদীর উৎপত্তিস্থান। বরফাবৃত এই স্থানকে গঙ্গোত্তরী

---

[৪২] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৪৬

[৪৩] গঙ্গা গমনাত্, যাস্ক, নিরু., ৯.২৬.৪

[৪৪] বরাহপু., ৮২তম অধ্যায়

[৪৫] ওং নমো গংগাযৈ বিশ্বরূপিণ্যৈ নারাযণ্যৈ নমো নমঃ। পদ্মপু., সৃষ্টিখণ্ডে, ৬০.৬৪-৬৫

[৪৬] গঙ্গা বিষ্ণুপদী জহ্নুতনযা সুরনিম্নগা।

ভাগীরথী ত্রিপথগা ত্রিস্রোতা ভীষ্মসূরপি।। অমর., প্রথমকাণ্ড, বারিবর্গ, ১২১

[৪৭] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৪৬

[৪৮] গঙ্গা নদীর ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ক নানা তথ্য বিস্তৃত ভাবে *বাংলা বিশ্বকোষ,* ৫ম খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৫০-১৫৪

বলা হয়। গঙ্গোত্তরী সমুদ্রতল থেকে ৯২০০ হাত উচ্চ বলে ধরা হয়। এই চিরতুষারমণ্ডিত বৃহৎ খাতের চারদিকে প্রস্তর খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো। এই খাত পর্বতের উপরিভাগ হতে ক্রমশঃ নীচে নেমে একটি গহ্বর প্রবেশ করেছে। সেই গহ্বর থেকেই গঙ্গা ভূমিতে অবতরণ করেছে। এই গহ্বরের নাম গোমুখী বা গঙ্গোত্তরী। এই স্থান থেকে ৭৭৮ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিলেছে। উত্তরাখণ্ড থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার দৈর্ঘ্য হল ২৫২৫ কি.মি.। ভারতে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ এই পাঁচ রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। যার মধ্যে ১০০০ কি.মি. অংশ উত্তরপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের দূরত্ব প্রায় ১৮ কি.মি.। গঙ্গোত্রী হিমবাহ (Gangotri Glacier) হিমালয়ের সুবৃহৎ হিমবাহগুলির অন্যতম। গোমুখের ১১ কি.মি. দক্ষিণে গঙ্গোত্রী।[৪৯] গঙ্গোত্তরীর কাছে গঙ্গার বিস্তার ১৮ হাতের বেশী নয়। সেখানে জল এক হাতেরও কম। ক্রমে নিম্নগামী হওয়ায় অন্যান্য নদীর সাথে মিলে গঙ্গা নদীর আয়তন ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গোমুখ থেকে ভাগীরথী নদীর উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। ভাগীরথীতে মিলিত হওয়া প্রথম শাখানদী হল কেদার গঙ্গা। পরবর্তী শাখানদী হল যথাক্রমে জাহ্নবী নদী, সিয়াগঙ্গা ও অসিগঙ্গা, যা ভাগীরথীতে বিলীন হয়েছে। অলকনন্দা গঙ্গানদীর গতি পথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী। ধৌলিগঙ্গা ও বিষ্ণুগঙ্গা নামক নদী দুটি অলকনন্দার সাথে মিলিত হয়ে তাকে বৃহৎ আকৃতি প্রদান করে। ধৌলিগঙ্গা ও বিষ্ণুগঙ্গা অলকনন্দার সাথে বিষ্ণুপ্রয়াগ নামক স্থানে প্রথম মিলিত হয়। এরপর যথাক্রমে নন্দাকিনী নদীর সাথে নন্দপ্রয়াগে, পিণ্ডারগঙ্গার সাথে কর্ণপ্রয়াগে, মন্দাকিনী নদীর সাথে রুদ্রপ্রয়াগে এসে অলকনন্দানদীর মিলন হয়। এরপরে দেবপ্রয়াগ[৫০] নামক স্থানে অলকনন্দা ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়ে, যে নদী ধারার সৃষ্টি করে তাকেই গঙ্গা বলা হয়।

প্রয়াগ শব্দের অর্থ হল- এমন স্থান যেখানে দুই বা ততোধিক নদীর মিলন হয়ে থাকে (Confluence place of rivers). সেখান থেকে দক্ষিণপশ্চিমে হরিদ্বার। হরিদ্বার থেকে দেরাদুন, শাহরামপুর, মজফরনগর ও বুলন্দশহর হয়ে ফরক্কাবাদে রামগঙ্গা নামক নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। গঙ্গার উৎপত্তিস্থল থেকে ৩৩৪ ক্রোশ দূরে এলাহাবাদে প্রয়াগতীর্থ। এইখানে যমুনা এসে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। প্রয়াগ থেকে বারাণসী হয়ে বেহারে এসে প্রথমে শোণ

[৪৯] web: gangotri Documentary DD National

[৫০] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৫০

নদী ও পরে কোশী ও গণ্ডকী নদী গঙ্গাতে মিলিত হয়েছে। এরপর রাজমহল হয়ে প্রাচীন গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ বিধৌত করে পূর্বমুখে গমন করেছে। রাজমহলের ১০ ক্রোশ পূর্বে একটি শাখা বার হয়ে মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, নদীয়া, কালনা, হুগলী, চন্দননগর, কলকাতা হয়ে পশ্চিমদক্ষিণমুখে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। মূল নদীটি ধূলিয়ান থেকে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি শাখা হুগলী নদী নামে পরিচিত, অপরটি বাংলাদেশে পদ্মা নাম ধারণ করে পাবনা ও গোয়ালন্দ হয়ে সামনে এগিয়েছে। ব্রিটিশরা মূলনদীকে Ganges ও কলকাতার কাছ দিয়ে যে শাখা গিয়েছে তাকে হুগলী নদী নাম দিয়েছে। ইংরেজদের আমলে গঙ্গা থেকে অনেকগুলি খাল (Ganges caual) বার করা হয়েছিল। গঙ্গার এই খালগুলি প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা- উত্তর (Upper) ও নিম্ন (Lower)।

৩.২.১ প্রাচীন সাহিত্যে গঙ্গা নদীর উৎপত্তির ইতিহাস ও মাহাত্ম্য বর্ণনা :

গঙ্গা নামটি *ঋগ্বেদের* দশমমণ্ডলের নদীসূক্তে প্রথম পাওয়া যায়।[৫১] বেদে সরস্বতী বা সিন্ধু নদীর মত গঙ্গা নদীর পৃথক স্তুতি না থাকায় সে যুগে গঙ্গা নদীর অপ্রাধান্য সূচিত হয়। এমনকি সপ্তসিন্ধুতে যে সাতটি নদীর নাম রয়েছে, তাতে গঙ্গা নদীর নাম নেই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, *ঋগ্বেদের* যুগে আর্যরা সরস্বতী নদীর পশ্চিমতীরে বাস করতেন। ফলে গঙ্গার সাথে তাদের তেমন পরিচয় তখনও পর্যন্ত ঘটে নি। সম্ভবতঃ *ঋগ্বেদের* যুগের শেষভাগে আর্যরা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, ফলে গঙ্গা নদীর উল্লেখ *ঋগ্বেদের* শেষপর্বে দশম মণ্ডলে কেবলমাত্র একবার করা হয়েছে। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে বৈদিকযুগে গঙ্গা ও যমুনার দৈর্ঘাল্পতা হেতু প্রাধান্য লাভ সম্ভব ছিল না। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় বহু বছর পূর্বে রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতমালার দক্ষিণপূর্বে হিমালয়াশ্রিত উত্তর ভারত এবং বিন্ধ্যাশ্রিত দক্ষিণ ভারতের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত সমুদ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই সমুদ্র রাজপুতনা সাগর নামে অভিহিত। রাজপুতনা সাগর দ্বারা সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ (পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে পাকিস্তান), ও বিন্ধ্যপর্বত) দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই সমুদ্র সপ্তসিন্ধুর পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্বভারত (অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশ ও আসাম) পর্যন্ত

[৫১] ঋ., ১০.৭৫.৫

বিস্তৃত ছিল। এই সমুদ্রের পূর্বাংশকে পূর্বসাগর নাম দেওয়া হয়েছে। এরকম সাগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত যদি যথার্থ হয়, তবে সেকালে সরস্বতীর স্রোতধারা এই সমুদ্রের পশ্চিমাংশে মিলিত হত। গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হত পূর্বসাগরে। সেই কারণেই হয়তো ঋগ্বৈদিকযুগের মানুষের কাছে গঙ্গা ও যমুনার প্রাধান্য ছিল না।[৫২] এভাবে পরবর্তীতে সরস্বতী নদী বিলোপের ফলে ভারতবর্ষে গঙ্গা নদীর মহিমা বর্ধিত হল। সরস্বতী থেকে গেলেন বিদ্যার দেবী হয়ে। আর গঙ্গা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কৃপাপুষ্ট হয়ে ভারতখণ্ডে প্রধান জলপ্রবাহ হিসেবে পুণ্যময়ী ও মুক্তিদাত্রী দেবতায় পরিণত হলেন।[৫৩] এমনকি *মনুসংহিতা*তে সাক্ষিনির্ণয় প্রসঙ্গে গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্র সর্বোচ্চ পুণ্য স্থান বলে বিবেচিত হয়েছে।[৫৪]

আদিকবি বাল্মীকিকৃত *রামায়ণে* উল্লেখ রয়েছে, গঙ্গা হল হিমালয় কন্যা ও সুমেরুতনয়া। মনোরমা বা মেনার গর্ভে এর উৎপত্তি। দেবগণ কোনো বিশেষ কার্যবশতঃ একসময় হিমালয়ের কাছ থেকে গঙ্গাকে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। বিভিন্ন ঘটনাক্রমে গঙ্গা জলময়ী হয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করতে শুরু করেন। অন্যদিকে দুর্বৃত্ত সগরতনয়গণ মহামুনি কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত হলে, সগরবংশীয় রাজারা দেবী গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নের চেষ্টা করেন। চেষ্টার বিফল হলে, সগরবংশীয় ভগীরথ মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে পিতামহ ব্রহ্মার তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হলে ভগীরথ পিতামহকে নিজ অভিপ্রায় জানান। পিতামহ ব্রহ্মা জানান, দেবী গঙ্গা ধরাতলে পতিত হলে, তাঁর বেগ পৃথিবী ধারণ করা অসম্ভব। ফলে পিতামহের আদেশানুসারে ভগীরথ গঙ্গাধারণ বাসনায় মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করলে, খুব অল্প দিনেই সন্তুষ্ট হয়ে ভগীরথকে দর্শন দিলেন ও গঙ্গাকে ধারণ করবার অঙ্গীকার করেন। মহাদেব অসাধারণ কৌশলে স্রোতস্বতীকে মস্তকজটামধ্যে আবদ্ধ করে, পরিত্যাগ করেন। এরপর গঙ্গা যথাক্রমে প্রথম বিন্দুসরোবরে পতিত হয়, তদনন্তর বিন্দুসর থেকে গঙ্গার সাতটি স্রোত নির্গত হয়। যথা- হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী এই তিনটি শাখা পূর্বদিকে, বক্ষু, সীতা, সিন্ধু এই তিনটি পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হলে জলস্রোতে সমস্ত কিছু ভেসে যায়। শেষ শাখাটি সগরবংশীয়দের মুক্তির উদ্দেশ্যে ভগীরথকে অনুসরণ করে, ভগীরথ প্রদর্শিত পথে গমন করায় তার নাম হয়

---

[৫২] *Rigvedic India*, Dr. A.C. Das, p.10, দ্র. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড- ৩, পৃ.১১৪

[৫৩] *তদেব*, পৃ.১১৫

[৫৪] তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গা মা কুরূন্ গমঃ।। মনু., ৮.৯২

ভাগীরথী।[৫৫] রামায়ণের এই আখ্যান থেকেই গঙ্গার পর্যায় হিসেবে ভাগীরথী শব্দটি বর্তমানে সুপ্রসিদ্ধ।

গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবী। বাল্মীকিকৃত *রামায়ণ* অনুযায়ী মহারাজ ভগীরথের রথের পেছন স্রোতস্বতী গঙ্গা গ্রাম, বন, উপবন প্রভৃতি প্লাবিত করে প্রবল বেগে রথকে অনুগমন আরম্ভ করলে, ঠিক সেই সময় মহামুনি জহ্নু নিজ আশ্রমে যজ্ঞের আয়োজন করছিলেন। হঠাৎ গঙ্গার জলের কারণে তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন উপস্থিত হলে, মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে নিজস্থানে অবিচল থেকে গঙ্গাকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে যোগবলে গঙ্গাকে পান করেন। গঙ্গার জলাভাবে চিন্তিত দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলের অনুনয়বিনয়ে মহামুনি জহ্নু নিজ কর্ণরন্ধ্র দিয়ে গঙ্গাকে পরিত্যাগ করেছিলেন বলে, গঙ্গার অরেক নাম জহ্নুসুতা বা জাহ্নবী।[৫৬] এছাড়া *ভগবদ্গীতা*তেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই জাহ্নবী বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৫৭]

গঙ্গার অপর নাম বিষ্ণুপদী। এই নাম থেকেই হোক্ বা অন্য কোনো কারণেই হোক্, বহু মানুষের বিশ্বাস দেবী গঙ্গার জন্ম বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুর পা থেকে। *বিষ্ণুপুরাণ* মতে, আকাশমণ্ডলে ধ্রুবকে অবলম্বন করে সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল অবস্থান করে।[৫৮] সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলে মেঘও অবস্থিত। পৌরাণিকগণ একে বিষ্ণুর তৃতীয়পদ বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।[৫৯] ফলে মেঘ থেকে বৃষ্টি ও তাতেই গঙ্গার উৎপত্তি।[৬০] গঙ্গা বিষ্ণুর বামপায়ের অঙ্গুলির নখ থেকে প্রবাহিত এরূপ

---

[৫৫] রাম., আদিকাণ্ড, ৪২, ৪৩, ৪৪ সর্গ

[৫৬] রাম., ১.৪৩, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৪৭

[৫৭] স্রোতসামস্মি জাহ্নবী। গী., ১০.৩১

[৫৮] ধ্রুবে চ সর্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃষ্বম্ভোমুচো দ্বিজ। বিষ্ণুপু., ২.৮.৯৯

[৫৯] এবমেতত্ পদং বিষ্ণোস্তৃতীযমমলাত্মকম্। বিষ্ণুপু., ২.৮.১০২

[৬০] মেঘেষু সন্ততা বৃষ্টির্বৃষ্টেশ্চপোঽথ পোষণম্। বিষ্ণুপু., ২.৮.১০০

ততঃ প্রবর্ত্ততে ব্রহ্মন্ সর্বপাপহরা সরিত্।

গঙ্গা দেবাঙ্গনাঙ্গানামনুলেপনপিঞ্জরা।। বিষ্ণুপু., ২.৮.১০৩

মনে করা হয়ে থাকে।[৬১] বিষ্ণুপদের উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিষ্ণুর বামনাবতার, গয়াসুরের উপাখ্যান ইত্যাদি নানা স্থানে বিষ্ণুপদের উল্লেখ রয়েছে। যা পরোক্ষ ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বার্তা বহন করে চলেছে। ভারতীয়ধর্মের পুণ্যতোয়া নদী গঙ্গাই বা তার থেকে বাদ যায় কেন। ফলে সরস্বতী ও গঙ্গা নদীর উপাখ্যানে বিষ্ণুর গুরুত্ব লক্ষণীয়। আখ্যানগুলির অন্তরালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবেশ লক্ষণীয়।

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে গঙ্গার সহস্র নামের উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে কিছুনাম উল্লেখযোগ্য। যথা- গৌরী, গায়ত্রী, দুর্গা, পার্বতী, বিদ্যা, বাণী, বেদবতী, মহালক্ষ্মী, লক্ষ্মী, শিবা, শক্তি, সরস্বতী, শ্রী, সীতা ইত্যাদি।[৬২] এই নামগুলি থেকে বোঝা যায়, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা প্রভৃতি অভিন্না। এক কথায় বলতে গেলে, গঙ্গা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শক্তিরূপা।[৬৩] এই ত্রয়ীদেবতার শক্তিরূপা বলেই গঙ্গা ত্রিপথগা। ত্রিপথগা গঙ্গা কিন্তু নদীগঙ্গা নয়। তা হল আকাশগঙ্গা। এই আকাশগঙ্গা বিষ্ণুর দ্রবীভূত কায়ারূপে রাতে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বদ্ধ থাকেন, উদয়রবি ব্রহ্মার কমণ্ডলুর উৎসমুখ থেকে সর্বব্যাপ্ত হন ও শিবশক্তি হিসাবে শিবের জটাজালে ভর করে কল্যাণের জন্য নেমে আসেন মর্তে। এই জন্যই গঙ্গার অপর নাম ত্রিপথগা।[৬৪]

মর্তগঙ্গার সঙ্গে স্বর্গগঙ্গার একাত্মীকরণের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল অভিশাপের, যা *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের* দৃষ্ট হয়।[৬৫] *দেবীভাগবতের* নবম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে একই ধরণের কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের* প্রকৃতিখণ্ড ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে গঙ্গার উপাখ্যান, জন্মবৃত্তান্ত, মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। এই পুরাণে গঙ্গাকে ভাগীরথী, জাহ্নবী, ভীষ্মজননী ও

---

[৬১] বামপাদাম্বুজাঙ্গুষ্ঠ-নখস্রোতোবিনির্গতা।

বিষ্ণোর্বিভর্ত্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ।। বিষ্ণুপু., ২.৮.১০৪

[৬২] স্কন্দপু., কাশীখণ্ড, ২৯তম অধ্যায়.

[৬৩] নমঃ শিবায গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ।

নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্যৈ নমো'স্তুতে।।

নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ শাঙ্করযৈ তে নমো নমঃ। স্কন্দপু., কাশীখণ্ড, পূর্বার্দ্ধ, ২৭.১৫৭-১৫৮

[৬৪] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড- ৩, পৃ.১১৬-১১৭

[৬৫] ব্রহ্ম.বৈ.পু., প্রকৃতিখণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপথগামিনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই নামগুলির উৎপত্তির ইতিহাসও বর্ণনা করা হয়েছে। গঙ্গা স্বর্গ, মর্ত ও পাতালে ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছে বলে তার নাম ত্রিপথগামিনী। প্রধান ধারাটি স্বর্গে মন্দাকিনী নামে, পৃথিবীতে অলকনন্দা নামে, পাতালে ভোগবতী নামে প্রবাহিত।[৬৬] এখানে গঙ্গাদেবীর বর্ণের প্রসঙ্গে বলা হয়, দেবী সত্যযুগে দেবী ক্ষীরবর্ণা, ত্রেতাতে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রা, দ্বাপরে চন্দনের ন্যায় আভাযুক্তা, কলিযুগে পৃথিবীতলে জলপ্রবাহময়ী, অন্যত্র অন্যরূপা, স্বর্গে ক্ষীরের ন্যায় আভাযুক্তা।[৬৭] এই বর্ণনায় লক্ষণীয় দিক হল দেবীর শুক্লত্ব। যা সম্ভবতঃ সর্বশুক্লা সরস্বতীর আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছে। পার্থক্য হল, সরস্বতী নদীরূপতা বর্জন করে হয়েছেন বিদ্যাদেবী কিন্তু গঙ্গা নদীরূপেই ভক্তের হৃদয়ে আসীন।[৬৮]

মৎস্যপুরাণ মতে, শিব নিজ জটা থেকে গঙ্গা সাতটি ধারাতে প্রবাহিত হয়েছিল,[৬৯] যার মধ্যে তিনটি পূর্বদিকে (নলিনী, হ্লাদিনী, পাবনী), তিনটি পশ্চিম দিকে (সীতা, চক্ষুস্, সিন্ধু) ও অন্তিম ধারাটি ভাগীরথী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। *মার্কণ্ডেয়পুরাণে* গঙ্গাবতার নামক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জগদ্‌যোনি নারায়ণের ধ্রুবাধার নামক পদ থেকে ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি। গঙ্গার যে জলধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত তার নাম শীতা।[৭০] দক্ষিণদিক থেকে গঙ্গার যে জলরাশি গন্ধমাদনপর্বতে পতিত, তার নাম অলকনন্দা।[৭১] বৃষধ্বজ শম্ভু গঙ্গাকে ধারণ করেন এবং

---

[৬৬] ব্রহ্ম.বৈ.পু., শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

[৬৭] ব্রহ্ম.বৈ.পু., প্রকৃতিখণ্ড, দশম অধ্যায়, ১৩১-১৪০

[৬৮] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড- ৩, পৃ.১২২

[৬৯] স্রোতাংসি ত্রিপথাযাস্তু প্রত্যপদ্যন্ত সপ্তধা।।

নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যগা।

সীতা চক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ তিস্রস্তা বৈ প্রতীচ্যগা।।

সপ্তমী ত্বনুগা তাসাং দক্ষিণেন ভাগীরথম্। মৎস্য.. ১২১.৩৮-৪১; ব্রহ্মাণ্ড. ২.১৮.৩৯-৪১; পদ্ম. ১.৩.৬৫-৬৬

[৭০] পূর্ব্বা শীতে'তিবিখ্যাতা যযৌ চৈত্ররথং বনম্। মার্কণ্ডেয়পু., ৫৬.৫

[৭১] তথৈবালকনন্দাখ্যং দক্ষিণে গন্ধমাদনে। মার্কণ্ডেয়পু., ৫৬.৭

সাতভাগে সেই গঙ্গাকে মুক্ত করায় তা দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে।[৭২] পরবর্তীতে স্বরক্ষু,[৭৩] সোমা[৭৪] এরূপ নানান নামে গঙ্গা অভিহিত হয়েছে। *মৎস্যপুরাণ* [৭৫] ও *লিঙ্গপুরাণে* [৭৬] গঙ্গামাহাত্ম্য বিষয়ক কোনও সরাসরি উল্লেখ নেই। কিন্তু প্রয়াগ ও বারাণসীমাহাত্ম্যের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে, যা পরবর্তী অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। *ব্রহ্মপুরাণ* মতে, গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে প্রবাহিত হয়ে শিবের জটায় স্থাপিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।[৭৭] *অগ্নিপুরাণে* গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ে কোনও বিশেষ কথা পাওয়া না গেলেও, একটি অধ্যায়ে গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ছয়টি শ্লোকে গঙ্গার দর্শন, স্পর্শন, কীর্তন ও স্মরণের কথা ও তার ফললাভের কথা বলা হয়েছে।[৭৮]

৩.২.২. গঙ্গা নদীর প্রশস্তি বর্ণন ও মাহাত্ম্য বিচার :

ভারতীয় জনজীবনে ও সংস্কৃতিতে গঙ্গার প্রভাব ক্রমবর্ধিত হওয়ায় গঙ্গা শুধুমাত্র প্রধান নদী নয়, শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে পরিগণিত হয়েছে।[৭৯] এই নদীর জল সর্বপাপহারীরূপে গণ্য হওয়ায় পুণ্য ও মুক্তির উপায়রূপে কল্পিত হয়েছে। ফলে গঙ্গার মহিমা আদিকবি বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য থেকে আরম্ভ করে নানান ভক্ত কবিরা কীর্তন করেছেন। *বিষ্ণুপুরাণে* গঙ্গা প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে, প্রত্যহ গঙ্গা নাম শ্রবণে, অভিলাষে, দর্শনে, স্পর্শনে, পানে, অবগাহনে বা কীর্তনে সকলে পবিত্র

---

[৭২] তত্র ভুক্তা চ শর্ব্বেণ সপ্তধা দক্ষিণোদধিম্। মার্কণ্ডেয়পু., ৫৬.১১

[৭৩] স্বরক্ষুরিতি বিখ্যাতা বৈভ্রাজং সাচলং যযৌ। মার্কণ্ডেয়পু., ৫৬.১৩

[৭৪] তত্র সোমেতি বিখ্যাতা সা যযৌ সবিতুর্বনম্। মার্কণ্ডেয়পু., ৫৬.১৬

[৭৫] মৎস্য., ১০৩-১১২তম অধ্যায়

[৭৬] লিঙ্গপু., ৯২তম অধ্যায়

[৭৭] ব্রহ্মপু., ৭৩.৬৮-৬৯

[৭৮] অগ্নিপু., ১১০.১-৬

[৭৯] কলৌ গঙ্গৈব কেবলম্। স্কন্দপু., কাশীখণ্ড, পূর্বার্ধ, ২৭.১৭ দ্র. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড- ৩, পৃ.১১৮

হয়ে থাকে এবং শতযোজন দূরে থেকে "গঙ্গা, গঙ্গা" নাম উচ্চারণে ত্রিজন্মার্জিত পাপ থেকে সকলে মুক্ত হয়ে থাকে।[৮০] *ভবিষ্যপুরাণেও* এধরণের উক্তি রয়েছে।[৮১] *মৎস্য, কূর্ম, গরুড়, পদ্মপুরাণ* মতে, গঙ্গানদী গমন সবথেকে সহজ, কেবলমাত্র গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), প্রয়াগ, সমুদ্রসঙ্গম স্থান এই তিনটি স্থানে যাওয়া কিছুটা কঠিন। এখানে স্নান করলে যেমন স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই এখানে মৃত্যু হলে যে কোনো ব্যক্তি জন্মান্তর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন।[৮২] যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা বা অনিচ্ছায় গঙ্গা প্রাপ্ত হয়ে দেহ ত্যাগ করেন, সে ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে থাকে, কখনও নরক প্রাপ্ত হন না।[৮৩] *মৎস্যপুরাণ* মতে, পাপী ব্যক্তি সহস্র যোজন দূরে থেকেও কেবল গঙ্গার স্মরণ করলেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। গঙ্গার নাম কীর্তনে পাপমোচন ও দর্শনে সর্বশুভ দর্শন হয়ে থাকে। আর সেই জলে স্নান ও জলপানে ব্যক্তি নিজের সাত প্রজন্মকে পবিত্র করে থাকে।[৮৪] *কূর্মপুরাণে বায়ুপুরাণের* কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, গঙ্গা

---

[৮০] শ্রুতাভিলাষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা।

যা পাবযতি ভূতানি কীর্তিতা চ দিনে দিনে।।

গঙ্গা গঙ্গেতি যৈর্নাম যোজনানাং শতেষ্বপি।

স্থিতৈরুচ্চরিতং হন্তি পাপং জন্মত্রযার্জ্জিতম্।। বিষ্ণুপু., ২.৮.১১৫-১১৬

[৮১] দর্শনাত্ স্পর্শনাত্ পানাত্ তথা গঙ্গেতি কীর্তনাত্।

স্মরণাদেব গঙ্গাযাঃ সদ্যঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ভবিষ্যপু.

[৮২] সর্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।

গঙ্গাদ্বারে প্রযাগে চ গঙ্গাসাগরসংগমে।।

তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ।। মৎস্য., ১০৬.৫৪, কূর্মপু., ১.৩৬.৩২, গরুড়পু., পূর্বার্ধ, ৮১.১-২, পদ্মপু., ৫.৬০.১২০

[৮৩] অকামো বা সকামো বা গঙ্গাযাং যো'ভিপদ্যতে।

মৃতস্তু লভতে স্বর্গং নরকঞ্চ ন পশ্যতি।। মৎস্য., ১০৭.৪

[৮৪] যোজনানাং সহস্রেষু গঙ্গাযাং স্মরণান্নরঃ।

অপি দুষ্কৃতকর্ম্মা তু লভতে পরমাং গতিম্।।

কীর্ত্তনান্মুচ্যতে পাপাদ্দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি।

স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে স্থিত ৩৫কোটি পবিত্র স্থানের মতই পবিত্রস্থান।[৮৫] ভারতীয় শাস্ত্রপরম্পরায় আত্মহত্যা মহাপাপ ও অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল পুরাণে (*মৎস্যপুরাণ,* ১০৭.৪) গঙ্গাজলে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগকেও স্বর্গগমনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় আঙ্গিকে সববিষয়ই কোনো না কোনো ভাবে বৈধতা লাভ করে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্য প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে, প্রত্যহ গঙ্গাদেবীর ভক্তিপূর্বক স্তবপাঠ করলে, নিত্য অশ্বমেধতুল্য ফল লাভ হয়ে থাকে, অপুত্র ব্যক্তির পুত্রলাভ করে, ভার্যাশূন্য ব্যক্তির মনোরম ভার্যা লাভ হয়, রোগী রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হতে মুক্ত হয়, কীর্তিশূন্য জনের কীর্তি-বিস্তার হয়, মূর্খ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য লাভ করে থাকে। গঙ্গাস্তব পাঠ করলে দুঃস্বপ্নও শুভফল প্রদান করে এবং গঙ্গাস্নানতুল্য ফললাভ হয়।[৮৬] লক্ষণীয় বিষয় হল, ফললাভ বিষয়ে যে সমস্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত বিষয়। এর বাইরে মানুষের তেমন কিছু চাওয়ার থাকে না। একজন আদর্শ সফল মানুষের যে যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, তা সবই এই ফললাভের অন্তর্গত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যশ, ধন, পরিবার এই সমস্ত কিছুর অন্তরালে রয়েছে ধর্মীয় আচরণবিধি, যা একটি মানুষকে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত করে। তীর্থস্থান মানেই অবগাহন। কিন্তু প্রতিটি মানুষের পক্ষে বিশেষ স্থানে পৌছনো অসম্ভব, ফলে স্তবকীর্তন ও তার ফললাভ ধর্মীয় ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কেবলমাত্র ধর্মীয়দিক নয়, এর সাথে মনস্তাত্ত্বিক দিকও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোনও ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের ভিত্তি হল সেই ব্যক্তির বিশ্বাস। বর্তমানে মনোবিদ্যার ভাষায় আত্মবিশ্বাস বা আত্মপ্রত্যয় সমস্ত ভালো থাকবার চাবিকাঠি। সেই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে পুরাণকারেরা মানুষের মধ্যে আশার আলো সঞ্চার করাবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। যার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অপুত্রক ব্যক্তির পুত্র ও ভার্যাশূন্য ব্যক্তির ভার্যার কথা। সন্তান অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা একটি মানুষকে কতখানি কষ্টে রাখতে পারে তা সাধারণভাবে সকলের কমবেশি জানা। একই ভাবে দাম্পত্য যাপন করতে গেলে উপযুক্ত জীবন সঙ্গীর বাসনাও মানুষের চিরন্তন। এইসব

অবগাহ্য চ পীত্বা তু পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।। মৎস্য., ১০৪.১৪-১৫

[৮৫] তিস্রঃ কোট্যোর্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীত্।

দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তত্সর্বং জাহ্নবী স্মৃতা।। কূর্মপু., ১.৩৮.৮

[৮৬] ব্রহ্ম.বৈ.পু., প্রকৃতিখণ্ড, দশম অধ্যায়, ১৩১-১৪০

ইচ্ছেপূরণের সহজ উপায় হিসেবে পুরাণকারগণ যে পন্থার কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন, তা কতখানি যথাযথ সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে মানসিক কষ্ট লাঘবের উপায় হিসেবে এই পথ কিছুটা হলেও মানুষকে স্বস্তির পরিসর প্রদান করে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মানুষের ভালো থাকা, তাদের বিভিন্ন চাওয়া পাওয়ার খেয়াল রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ধর্ম-অর্থ-নীতি শাস্ত্রে এই কথা বাবংবার উল্লেখ করা হয়েছে। 'প্রজার সুখেই রাজার সুখ'- কিন্তু সত্যি কী তাই? সত্যি কী এটা সম্ভব? বাস্তব হল, প্রতিটি মানুষের সুখের যোগান দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব। তাই কিছু চাওয়া পাওয়ার হদিশ যদি রাষ্ট্রব্যতীত অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে মানুষ বুঝে নিতে পারে, তবে রাষ্ট্রের দায়িত্বের খানিকটা লাঘব হয়। ফলে বারংবার পুরাণকারদের বলতে হচ্ছে তীর্থের ফললাভ বিষয়ে। যে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ প্রকার আচরণবিধি পালন করলে, বিশেষ ফললাভ হবে।

৩.২.৩. গঙ্গা নদীর বর্তমান পরিস্থিতি :

বর্তমানে জলদূষণের কারণে গঙ্গা নদীর অবস্থা প্রতিনিয়ত অবনতির পথে। এইবিষয়ে আগে গঙ্গা নদীর গতি প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। সমস্যার গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে, বিগত কিছু বছর হল ভারত সরকার নমামি গঙ্গে (Namami Gange)[৮৭] নামে একটি পরিকল্পনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য হল গঙ্গার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষকে নদীর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা। এই কর্মকাণ্ডের জন্যে গঙ্গা নদীর বিভিন্ন স্থানে STP (Sewage treatment plant) তৈরি করা হয়েছে। এর দ্বারা কোনও স্থানে 1MLD থেকে 24MLD (Million liters per day) পর্যন্ত জল পরিশুদ্ধ করে আবার গঙ্গায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ভারত সরকারের এই উদ্যোগ সাধুবাদের যোগ্য। কিন্তু জনসচেতনতা ভিন্ন কোনও উদ্যোগই সম্পূর্ণরূপে সফল হতে পারে না। ফলে সচেতনতা গড়বার লক্ষ্যে প্রয়াসী হয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলের পুরোহিত সমাজও। বর্তমানে হরিদ্বারে প্রতিদিন

[৮৭] Namami Ganga Programme is an Integrated Conservation Mission, approved as a Flagship Programme by the Union Government of India in June 2014 with a budget outlay of Rs. 22,500 crore from 2023-26 to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of National River Ganga. (Wikipedia, Date: 24.04.23)

গঙ্গা আরতির সময় দর্শনার্থীদের গঙ্গা নদীকে পবিত্র রাখবার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। বিভিন্ন NGO ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। "পাপ শরীর করে না, বিচার করে। আর গঙ্গা বিচার নয়, শরীর ধোয়" এই ধরনের কথা দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কেবল শপথবাক্য ও দেওয়াললিখন নয়, মানুষের বিশ্বাসকেও এখানে কাজে লাগনো হয়েছে। এমনকী গঙ্গাঘাটে পরে থাকা ফুল, বস্ত্রাদি দিয়ে সেখানকার মানুষ দড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছেন, এই উদ্যোগ সাধুবাদের যোগ্য। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস গঙ্গা জল কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে গৃহে রাখলে সেই উদ্দেশ্যও সফল হয়। এই ধরণের বিশ্বাসে বহু মানুষ গঙ্গাজলকে বাড়িতে সংরক্ষণ করেন।[৮৮] ফলে গঙ্গা কেবল নিছক নদী নয় তা হল মানুষের বিশ্বাস ও ভাবনার প্রতীক।

গ. তপোভূমি নর্মদা

৩.৩.১. নর্মদা নদীর উদ্ভব ও বিস্তার :

ভারতবর্ষে উপদ্বীপীয় নদীগুলির অন্যতম নদী হল নর্মদা। বিন্ধ্যপর্বত উত্তরভারত ও দক্ষিণাপথের সীমানা চিহ্নিত করে। কিন্তু পুরাণ সাহিত্যে এই সীমারেখা হিসেবে নর্মদা নদীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ নর্মদা নদী বিন্ধ্যের প্রায় সমান্তরাল ভাবে পূর্বদিক্ থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়েছে। *পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী-* র অজ্ঞাতনামা গ্রিক লেখকও তাঁর গ্রন্থে এই বিভাজন রেখার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৮৯] প্রাচীন কাল থেকে নদীগুলির জীবনদায়িনী ভূমিকার কথা সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। যার সূচনা *ঋগ্বেদের* নদীস্তুতিতে দেখা যায়।[৯০] সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা প্রভৃতি নদীগুলিকে পুণ্যতোয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে নদীগুলি দেবত্বেও উন্নীত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল পুরাণে প্রধান প্রধান

---

[৮৮] *Rag Rag Mein Ganga* | EP #06 Haridwar

[৮৯] রণবীর চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. xix

[৯০] ঋ., ৩.৩৩; ১০.৭৫

নদীগুলিকে পার্বত্য উৎসের সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন- গঙ্গা নদী হিমালয় থেকে উদ্গত, নর্মদা নদী মেকল পর্বততনয়া রূপে চিহ্নিত। অর্থাৎ নদী ও পর্বতের ওতপ্রোত সম্পর্ক চিহ্নিত করেছেন পুরাণকারেরা। আশ্চর্য বিষয় হল খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে টলেমির ভূগোলেও অধিকাংশ ভারতীয় নদী তাদের পার্বত্য উৎস সহ উল্লিখিত। এই দুই ভিন্নপ্রকার রচনার মধ্যে কেবলমাত্র বিবরণের সদৃশ্যই নয়, পদ্ধতিগত সাদৃশ্যও চমকপ্রদ। নদীগুলিতে জলজ প্রাণীর কারণে যেমন সুদূর অতীত থেকে শিকারী, পশুপালক গোষ্ঠীর জীবনধারণের অমূল্য ভূমিকা নিয়েছে, তেমন কৃষিজীবী সমাজের জন্যে নদীগুলির তাৎপর্য অসীম। ফলে নদীর তীরে গড়ে উঠেছে নানা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও তীর্থ, যা ছিল নানা মানুষের মিলনস্থল।[৯১]

রেবা, মেখলকন্যা, সোমসুতা, সোমোদ্ভবা এগুলি হল নর্মদার পর্যায়। অমরসিংহও তাঁর গ্রন্থে চারটি নামের উল্লেখ করেছে।[৯২] তার মধ্যে মেখলকন্যা নামটি নর্মদা নদীর উদ্ভবের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। রেবা নামটি মধ্যে রয়েছে রেব্ ধাতু। যার অর্থ হল প্লুতগতি। যেহেতু নর্মদা নদীর উৎসস্থলে জলপ্রবাহের তীব্রতা অধিক, হয়তো সেই কারণেই নর্মদা নদীর অপর নাম রেবা।

টলেমির ভূগোলে নর্মদা নদী *নর্মদস্* (Narmados) নামে পরিচিত।[৯৩] প্রাচীনকালে নর্মদা নদী আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের সীমানিদর্শক ছিল বলে জানা যায়। রেবা রাজ্যের অন্তর্গত অমরকণ্টক নামক একটি পর্বত থেকে এই নদীর উৎপত্তি। নর্মদা পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে ভারুচের কাছে আরবসাগরে মিলিত হয়েছে। নর্মদা নদী মধ্যপ্রদেশ (১০৭৭ কি.মি.), মহারাষ্ট্র (৭৪ কি.মি.) ও গুজরাটের (১৬১ কি.মি.) মধ্যে দিয়ে মোট ১৩১২ কি.মি. দৈর্ঘ্যে প্রবাহিত।[৯৪] পর্বতের শিখরদেশের একটি ক্ষুদ্র জলাশয় থেকে নর্মদা উত্থিত হয়ে প্রায় তিন মাইল তৃণপূর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অমরকণ্টক মালভূমির প্রান্তদেশে প্রবাহিত হয়েছে। এই তিন মাইল পথের মধ্যে বহু প্রস্রবণ এসে নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। কোথাও খরবেগ, কোথাও জলপ্রপাতাকারে নেমে এসে নর্মদা মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করেছে। খরস্রোত জলধারা কিছু শাখায়

---

[৯১] রণবীর চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত,* পৃ. xix

[৯২] রেবা তু নর্ম্মদা সোমোদ্ভবা মেখ-[ক]লকন্যকা। অমরসিংহ, অমর., পৃ. ৯৭

[৯৩] রণবীর চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত,* পৃ. xix

[৯৪] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৯ পৃ. ৫৯৯

বিভক্ত হয়ে মধ্যস্থলে অরণ্যময় দ্বীপ উৎপন্ন করেছে। রামনগর থেকে মণ্ডলা পর্যন্ত অংশে নদীর খরবেগ বা কোনো জলপ্রপাত কিছুই নেই। এই অংশে জলের রং নীল ও উপকূলভাগ উচ্চ তরুরাজিতে শোভিত। এরপর থেকে নদী প্রায় দুই মাইল পথ পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণ পথে প্রবাহিত হবার পর, পরবর্তী ২০০ মাইল নদী উর্বরা সমতল উপত্যকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই উপত্যকার একদিকে বিন্ধ্য ও অপর দিকে সাতপুরা পাহাড়। বর্ষাতে এই স্থানে কিছু বাণিজ্য চলে। মোহপাণির কয়লার খনি ও তেন্দুখেরার লৌহখনির কাছ দিয়ে হোসঙ্গাবাদ, হন্দিয়া, নিমাবার ও যোগীগড় অতিক্রম করে নর্মদা নিমার জেলায় এসে আবার জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। জঙ্গল অতিক্রম করে নর্মদা একটি গভীর ও বেগবতী জলধারারূপে মান্ধাতা দ্বীপ অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ দিয়ে আসবার পথে নর্মদার অনেকগুলি জলপ্রপাত দেখা যায়। নরসিংহপুর জেলার উমরিয়া নামক স্থানে একটি জলপ্রপাত এবং মন্দার ও দাদরিতে গভীর দুটি জলপ্রপাত রয়েছে। মক্রার, খমার, কুড়নোর, চক্রার, বঞ্জর, তিমার, সের, সকার, সোনার, দূধি, সচ্না কোরামি, তবা, অজ্নাল ও গঞ্জাল এগুলি হল নর্মদার শাখানদী।

মক্রাই-এর কাছে মলবের মালভূমি পরিত্যাগ করে নর্মদা নদী গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তরে প্রবেশ করেছে। অবশেষে ভারুচ জেলার উপর দিয়ে বক্রগতিতে প্রবাহিত হয়ে কাম্বে উপসাগরে পতিত হয়েছে। ভারুচ জেলায় প্রবাহকালে নর্মদার খাত সুগভীর এবং এই অংশে তিনটি উপনদী মিলিত হয়েছে। ডানদিকে বুখি এবং বামদিকে কাবেরী ও অমরাবতী। এই ভাবে নর্মদা নদীর বৈচিত্রময় গতিপথ দেখা যায়।[৯৫]

৩.৩.২. প্রাচীন সাহিত্যে নর্মদা নদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা :

পুরাণের বর্ণনানুসারে নর্মদা বিন্ধ্যপর্বত থেকে নিঃসৃত হয়ে পশ্চিমে তমসা নদীতে মিলিত হয়েছে। *স্কন্দপুরাণের* রেবাখণ্ডে নর্মদার উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে, নর্মদা তিনবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। প্রথম বার রাজা পুরূরবা চেষ্টায়, দ্বিতীয় বার সোমবংশীয় হিরণ্যতেজা নামক এক রাজার চেষ্টায়, তৃতীয় বার ইক্ষাকুবংশীয় রাজা পুরুকুৎস-র চেষ্টায় মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট

[৯৫] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৫৯৯-৬০১

করে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আনয়ন করেছিলেন।[৯৬] মহাদেবের অনুরোধে দেবী নর্মদা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেবীর অসহ্য বেগ বিন্ধ্যগিরি ধারণ করেছিল এবং এই রেবাখণ্ডেই দেবী নর্মদা শিবসীমন্তিনীরূপে বর্ণিত হয়েছেন।[৯৭]

নর্মদা মাহাত্ম্যের কথা *মৎস্যপুরাণে* নয়টি অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত হয়েছে।[৯৮] প্রথমেই নর্মদা নদীতে স্নানাদির ফল বর্ণিত হয়েছে। নর্মদা সকল নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সকল পাপবিনাশিনী বলে তার প্রশস্তি শুরু হয়েছে।[৯৯] কনখলে গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পুণ্যা বলে কথিত, এতদ্‌সত্ত্বেও গ্রাম ও অরণ্য সকল স্থলেই নর্মদা অতিশয় পুণ্যপ্রদা।[১০০] নর্মদা নদীর পবিত্রতা বিষয়ে বলা হয়েছে, সরস্বতীনদীর জল তিন দিন ব্যবহার করলে, যমুনানদীর জল সাত দিন ব্যবহার করলে, গঙ্গার জল স্পর্শমাত্র এবং নর্মদার জল দর্শন করলেই পবিত্র হয়।[১০১] নর্মদাতীরে দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, ঋষি প্রভৃতি সকল তপস্যা করলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করে। এমনকি বলা হয়, যে ব্যক্তি নর্মদানদীতে স্নান করে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক উপবাস করে, সে ব্যক্তির শতকুল উদ্ধার হয়ে থাকে। নদীতে যথাবিধি পিণ্ডদান ও তর্পণ করলে কল্পান্ত পর্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে। এই নদী ভগবান শঙ্করের দেহে উৎপন্ন হওয়ায়, অতিশয় পুণ্যদা। ফলে স্নানদানাদি কোনও কাজ করলে

---

[৯৬] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৬০০

[৯৭] তত্রৈব

[৯৮] মৎস্য., ১৮৬-১৯৪তম অধ্যায়

[৯৯] নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।

তারযেত্ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।। মৎস্য., ১৮৬.৮

[১০০] পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।

গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্বত্র নর্মদা।। মৎস্য., ১৮৬.১০

[১০১] ত্রিভিঃ সারস্বতং তোযং সপ্তাহেন তু যামুনম্।

সদ্যঃ পুণাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্ম্মদম্।। মৎস্য., ১৮৬.১১

তা অক্ষয় হয়ে থাকে। এমনকী এই নদী এতখানি পবিত্র যে, নর্মদাতে স্নান করলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়ে থাকে।[১০২]

মৎস্যপুরাণের নর্মদামাহাত্ম্যের পরবর্তী অধ্যায়ে বাণাসুরের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। যেখানে দেখা যায়, বাণাসুর নামক এক দানব ত্রিপুরপুরে বাস করত। সে তার স্বীয়তেজে যখন তখন গগনে বিচরণ করতে পারত। সেই দেখে দেবতারা ভীত হন এবং মহাদেবের কাছে উপস্থিত হয়ে এই সমস্যার প্রতিকার চান। মহাদেব নারদকে বাণাসুরের কাছে পাঠান এবং সমস্যার সমাধানও হয়। অনন্তর বাণাসুর তোটকচ্ছন্দবদ্ধ দিব্য তোটক নামক শিবস্তব পাঠে মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁর কৃপা লাভ করেন।[১০৩] এরপর কাবেরী সঙ্গমমাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অসংখ্য তীর্থের নাম ও তার ফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই তীর্থের নামের তালিকা পরিশিষ্টাংশে দেওয়া হয়েছে।

এমনকী নর্মদা স্তবের[১০৪] কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নর্মদা স্তব প্রতিদিন পাঠ করেন তার মন বিশুদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণ বেদ লাভ করে, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হয়, বৈশ্য অর্থলাভ করে থাকে ও

---

[১০২] যত্র যত্র নরঃ স্নাত্বা চাশ্বমেধফলং লভেত্। মৎস্য., ১৮৬.৫১

[১০৩] শিবশঙ্করশর্ব্বহরায নমো ভব ভীম মহেশ্বর সর্ব্ব নমঃ।

কুসুমাযুধদেহবিনাশকর ত্রিপারান্তক অন্ধকশূলধর।।

প্রমদাপ্রিয কান্ত বিভক্ত নমঃ সসুরাসুরসিদ্ধগণৈর্নমিত।

হয-বানর সিদ্ধ-গজেন্দ্রমুখা-দতিভাস্বদদীর্ঘবিশালমুখ।। মৎস্য., ১৮৮.৬৩-৬৭

[১০৪] নমঃ পুণ্যজলে হ্যাদ্যে নমঃ সাগরগামিণি।

নমস্তে পাপশমনি নমো দেবি বরাননে।।

নমোঽস্তু তে ঋষিগণ-সিদ্ধসেবিতে

নমোঽস্তু তে শঙ্করদেহনিঃসৃতে।

নমোঽস্তু তে ধর্ম্মভৃতাং বরপ্রদে

নমোঽস্তু তে সর্ব্বপবিত্রপাবনে।। মৎস্য., ১৯০তম অধ্যায়, ২১-২২

শূদ্র শুভগতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অন্নপ্রার্থীরা অন্নলাভ করে থাকে। স্বয়ং মহাদেব দেবী নর্মদাকে প্রতিদিন সেবা করে থাকেন তাই নর্মদা অতি পবিত্রা। নর্মদার জলপান ও নর্মদার জলে মহাদেবের আরাধনা করলে সকল দুর্গতি নাশ হয়ে থাকে। এই তীর্থে প্রাণত্যাগ করলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়।[১০৫] এধরণের নানা প্রশস্তিমূলক কথার সমাবেশ লক্ষ করা যায়।

কূর্মপুরাণেও তিনটি অধ্যায়ে নর্মদামাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১০৬] প্রথমে মার্কণ্ডেয়-যুধিষ্ঠিরসংবাদ দিয়ে নর্মদা মাহাত্ম্য বর্ণনার শুরু। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে নানা তীর্থের কথা ও সেই স্থানে স্নান ও দর্শন ফলের কথা বলা রয়েছে। *মৎস্যপুরাণের* নর্মদামাহাত্ম্যের সঙ্গে *কূর্মপুরাণের* নর্মদামাহাত্ম্যের বহু শ্লোকগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, যা লক্ষণীয় বিষয়।

ভাগবতপুরাণে নর্মদা বিষয়ে একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে।[১০৭] কাহিনীটি এরূপ- একদা কার্তবীর্যার্জুন বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে বহুতর রমণী রত্নের সাথে নর্মদা জলে সঙ্গে খেলা করতে করতে বাহু দ্বারা নর্মদার স্রোত রোধ করেছিলেন। সেই সময় রাক্ষসপতি রাবণ দিগ্বিজয়ার্থে বের হয়ে নর্মদা নদীতীরে শিবির স্থাপন করেন। নর্মদার স্রোত রুদ্ধ করায়, নদীর স্রোত প্রতিকূল হয়ে তটভূমিস্থিত রাবণের শিবির প্লাবিত করে। দশানন অর্জুনকে আক্রমণ করেন ও তাঁর হাতে পরাজিত হন। এই ধরণের নানা বিচিত্রময় কাহিনী পাঠকের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। নর্মদা নদী অন্যসকল নদী অপেক্ষায় পবিত্র কারণ তা ভগবান শঙ্করের দেহ থেকে উৎপন্ন।

ভারতবর্ষে বহু পুণ্যতোয়া নদীর সমাবেশ থাকলেও, একমাত্র নর্মদা নদী পরিক্রমা হয়ে থাকে। অন্য কোনও নদীর পরিক্রমা হয় না। মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শৈবতীর্থ ওঁকারেশ্বর নর্মদা নদীর মাঝে দুই কিলোমিটার দীর্ঘ মান্ধাতা দ্বীপে অবস্থিত।[১০৮]

---

[১০৫] মৎস্য., ১৮৬-১৯৪তম অধ্যায়

[১০৬] কূর্মপু., উপরিভাগ, ৩৮-৪০তম অধ্যায়

[১০৭] ভাগবতপু., ৯.২০-২২

[১০৮] বলরাম মণ্ডল, *পৌরাণিক তীর্থ পরিক্রমা*, পৃ. ৬২

সরস্বতী ও গঙ্গার মতো নর্মদাকে দেবী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। নর্মদা দেবীর রূপ বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে, দেবী কৃষ্ণবর্ণা, সর্বাভরণভূষিতা ও মকরাসনা।[১০৯]

৩.৩.৩. নর্মদা বাঁচাও প্রকল্প :

গঙ্গা নদীর মত নর্মদা নদীও বর্তমানে দূষিত। দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদীগুলির মধ্যে অন্যতম নদী হওয়ায় ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের জীবন-জীবিকার প্রাণ কেন্দ্র হওয়ায় মধ্যপ্রদেশ সরকার বিগত কিছু বছর হল 'নর্মদা সেবা যাত্রা' নামে এক জনসচেতনতামূলক প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে, যা সাধুবাদের যোগ্য। এছাড়া নর্মদা নদীস্থিত বাণলিঙ্গ শৈব উপাসকদিগের কাছে অতিশয় প্রশস্ত। বাণলিঙ্গের আকৃতি পক্ক জম্বূফলের মত, বর্ণ বিবিধ হয়ে থাকে যথা- মধুবৎ, শুক্ল, নীল সদৃশ এরূপ ধরা হয়। বাণাসুরের তপস্যায় মহাদেব তুষ্ট হওয়ায় এই লিঙ্গের নাম বাণলিঙ্গ হয়েছে। মৎস্যপুরাণে বাণাসুরের উপাখ্যান বর্ণিত রয়েছে।[১১০] নর্মদা নদী থেকে প্রাপ্ত এই শিলাখণ্ড অত্যন্ত পবিত্র বলে ধরা হয় এবং বহু মানুষের জীবিকার উপাদান হিসেবে বাণলিঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বর্তনামে হয়ে চলেছে। নর্মদা নদীকে ঘিরে নর্মদা জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। নভেম্বরের পনেরো তারিখ থেকে ডিসেম্বরের পনেরো তারিখের মধ্যে এই নর্মদা জয়ন্তী পালিত হয়ে থাকে। সুরাটে তৈরী হয় এক হাজার এক হাতের শাড়ি। বিছিয়ে দেওয়া হয় নদীর ওপর।[১১১] ভক্তেরা পূজা সেরে এই শাড়ির টুকরো নিয়ে ঘরে ফেরেন। মানুষের বিশ্বাস দেবী নর্মদার কাছে সারাবছর তারা আসতে পারেন না, ফলে এই শাড়ির টুকরো তাদের স্মৃতিতে দেবী নর্মদার আশীষ বর্ষণ করবে। তাই হয়তো বলা হয়, গঙ্গা স্নানে, যমুনা পানে, নর্মদা ধ্যানে।[১১২]

---

[১০৯] শ্যামবর্ণা মহাদেবী সর্ব্বাভরণভূষিতা।

মকরাসনমারূঢা শিবস্যাগ্রে ব্যবস্থিতা।। স্কন্দপু., রেবাখণ্ড, ৩য় অধ্যায়, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৯ পৃ. ৫৯৯

[১১০] মৎস্য., ১৮৭-১৮৮

[১১১] ধর্মীয় ক্যাসিনো, মান্ধাতা ও বহমান এক আঁচল, *দেশ,* ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৭৩

[১১২] তত্রৈব

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে নদ-নদীর অস্তিত্ব অতপ্রোত ভাবে জড়িত। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে যেমন সিন্ধুনদ, বেবিলনের সভ্যতার সঙ্গে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে নীলনদ। নদী যেখানে, জমির উর্বরতাও সেখানে। নদীর সর্বাত্মক উপকারিতাই মানুষকে ভালোবাসতে ও পুণ্য-পবিত্র বলে পূজা করতে শিখিয়েছে। এমনকী আদিম জলযানের সৃষ্টির মূলেও নদী। নদী মানুষকে দূরকে কাছের ও পরকে আপন করতে শিখিয়েছে। ফলে নদী ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে সভ্যতার মিলনতীর্থ। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত উৎসব যথা- কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি যেমন বহুমানুষের মিলনক্ষেত্র, ঠিক তেমনি তা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রও বটে। ফলে নদী ধর্মীয় মিলনের সুতো হবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের আয়ের উৎসও বটে। সেই আয় আরো বেশী প্রকটরূপে দেখা দেয়, যখন নদীর গতিপথে মিলন ঘটে জনপদের সঙ্গে। ফলে নদী তীর্থসমূহের বিকাশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচিত তীর্থসমূহের বিকাশ : ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

তীর্থ বিকাশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোচনা করবার আগে যে বিষয়টিতে নজর দেওয়া উচিত, তা হল তীর্থের ভৌগোলিক অবস্থান। কারণ ভৌগোলিক অবস্থান তীর্থ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে তীর্থকে বিচার করতে হলে ভৌগোলিক অবস্থানকে অস্বীকার করা মুসকিল। নদী, পর্বত ও অরণ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক ভাবে তীর্থস্থানকে ভাগ করা হলেও, জনপদ ভিন্ন তীর্থের কথা ভাবা অসম্ভব।

৪.১ কাশী

৪.১.১. কাশীর ভৌগোলিক অবস্থান :

বর্তমানে কাশী ও বারাণসী নামটি যুগপৎ আলোচিত হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতে কাশী মহাজনপদ হবার কারণে এর বৃহদায়তন সর্বজনবিদিত। চীনা পরিব্রাজক ফা-জিয়েনের '*Fo-kwo-ki*' নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত কাশী একটি বিস্তৃর্ণ জনপদ ও এই জনপদের প্রধান নগরী ছিল বারাণসী।[১] *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে জানা যায় একসময় কাশী 'কাশিপুরী' ও 'বারাণসী' নামে আভিহিত ছিল।[২] *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে, কাশী হল পূর্ব-পশ্চিমে দু'যোজন[৩] আয়ত এবং উত্তরদক্ষিণে অর্ধযোজন বিস্তৃত। এটি বরণা নদী থেকে শুষ্ক নদী

[১] *Fo-kwo-ki*. CL.XXXIV, translated by Laidley, p.310

[২] ...কাশিপুর্য্যাঞ্চ চিক্ষেপ কুর্ব্বন্ লোকস্য বিস্ময়ম্।। বিষ্ণুপু., ৫.৩৪.২৬

...কৃত্যাগর্ভামশেষাং তাং দগ্ধ্বা বারাণসীং পুরীম্।। বিষ্ণুপু., ৫.৩৪.৪১

[৩] এক যোজন = চার ক্রোশ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*,খণ্ড-২, পৃ. ১৮৭৪

পর্যন্ত এবং ভীষ্মচণ্ডিক থেকে পর্বতেশ্বরের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত।[৪] *বামনপুরাণ* মতে, এই পবিত্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রয়াগে বিষ্ণুর অংশজাত যোগশায়ী নামে বিখ্যাত যে অব্যয় পুরুষ নিরন্তর বাস করেন, তার দক্ষিণ চরণ থেকে সর্বপাপপ্রণাশিণী শুভঙ্করী বরণা এবং বাম চরণ থেকে অসি নামে বিখ্যাত দ্বিতীয় নদী নিঃসৃত হয়েছে। বরণা ও অসি এই উভয় নদী লোকমধ্যে পূজনীয়। এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে যোগশায়ী মহাদেবের প্রিয় সর্বপাপনাশন পুণ্যময়ী বারাণসী নগরী অবস্থিত। এটি সুবিখ্যাত মোক্ষদায়িনী, ত্রিলোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে পরিগণিত ক্ষেত্র । আকাশ, পাতাল বা ভূমণ্ডল মধ্যে এরূপ স্থান আর নেই।[৫] *কাশীখণ্ডে* বলা রয়েছে, সত্যযুগে যখন কাশীক্ষেত্র রক্ষা করবার জন্য অসি ও বরণা নদী উৎপন্ন হয়েছিল, সেই দিন থেকে এই কাশিকা বরণা ও অসি নদীর সঙ্গম লাভ করে, বারাণসী নামে খ্যাত হয়।[৬]

পাশ্চাত্য পুরাবিদের মতে, বরণা ও অসির মধ্যভাগে অবস্থানের কারণেই কাশীপুরী বারাণসী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৭] *জাবালোপনিষদে* বলা হয়েছে, এই স্থানে জন্তুগণের মরণকালে

---

[৪] দ্বিযোজনন্তু তত্ক্ষেত্রং পূর্বপশ্চিমতঃ স্মৃতম্।

অর্ধযোজনবিস্তৃর্ণং তত্ক্ষেত্রং দক্ষিণোত্তরম্।।

বরণা হি নদী যাবত্ যাবচ্ছুষ্কনদী তু বৈ।

ভীষ্মচণ্ডিকমারভ্য পর্বতেশ্বরমন্তিকে।। মৎস্য., ১৮৩.৬১-৬৮

[৫] তয়োর্মধ্যে তু যো দেশস্তত্ক্ষেত্রং যোগশাযিনঃ।

ত্রৈলোক্যপ্রবরং তীর্থং সর্বপাপপ্রমোচনম্।।

ন তাদৃশং হি গগনে নপ ভূম্যাং ন রসাতলে।

তত্রাস্তি নগরী পুণ্যা খ্যাতা বারাণসী শুভা।। বামনপু., ৩.২৪-২৮, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৫

[৬] অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে।

বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।

অসেশ্চ বরাণাযাশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা।। *কাশীখণ্ড*, ৩০. ৬৯-৭০, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৬

রুদ্র 'তারকব্রহ্ম' নাম কীর্তন করে থাকেন, যেহেতু নামকীর্তনের দ্বারা জীবগণ অমৃতত্ব লাভ করে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তাই এই অবিমুক্তক ক্ষেত্রে বাস করা একান্তই শ্রেয়। উক্ত উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যকে অবিমুক্তক পরিত্যাগ না করবার কথা উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই অবিমুক্তক ক্ষেত্র বরণা ও নাশী এই নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। বরণা ও নাশী নামকরণ প্রসঙ্গে জানা যায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষরাশি নিবারণ করে বলে নাম হয়েছে বরণা আর সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নাশ করে বলে তার নাম নাশী।[৮]

ললিতবিস্তরের ২৫তম অধ্যায়ে বলা আছে, বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে শাক্যসঙ্ঘ এই বারাণসীপ্রদেশের অন্তর্গত ঋষিপত্তনে মৃগদাব নামক স্থানে এসে ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন।[৯] *জাতকে* বলা হয়েছে কাশী বারোযোজন বিস্তৃত।[১০] *মহাবস্তুতে* বলা হয়েছে কাশী বরণ নদীর তীরে অবস্থিত।[১১] *দিব্যাবদানে* এই অঞ্চলটিকে সমৃদ্ধশালী, সুবিস্তৃত ও জনাকীর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১২] আরও বলা হয়েছে, কাশীতে শঠ ও দ্বন্দ্বপ্রিয় লোকজনিত কোনও কষ্ট নেই।[১৩] ফলে এই স্থান বাস করবার উপযুক্ত। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনাপরিব্রাজক জুয়াং-সান যখন বারাণসীস্থ বৌদ্ধতীর্থদর্শনে এসেছিলেন, তখন বারাণসী রাজ্য প্রায় ৩৩৩ ক্রোশ[১৪] (৪০০০লি) এবং বারাণসীনগরী দেড় ক্রোশ (১৮।১৯ লি) দীর্ঘ ও প্রায়

---

[৭] Rev Sherring's Sacret City of the Hindus, intro. by F.Hall, p.XVIII; Fuhrer's Archaeological Survey Lists, N.W.P. vol.II, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৬

[৮] সর্বানিন্দ্রিযকৃতান্ দোষান্ বারযতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্বানিন্দ্রিযকৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি। *জাবালোপনিষদ্* ১-২, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৬

[৯] *ললিত.,* ২৫তম অধ্যায়ে, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৬

[১০] *জাতক,* ৬, ১৬০, উদ্ধৃত, B.C.Law, p.51

[১১] *মহাবস্তু,* ৩,৪০২, উদ্ধৃত, তত্রৈব

[১২] *দিব্যাবদান,* উদ্ধৃত, তত্রৈব

[১৩] *দিব্যাবদান,* উদ্ধৃত, তত্রৈব

[১৪] এক ক্রোশ = চার সহস্র হস্ত-পরিমাণ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,*খণ্ড-১, পৃ. ৬৯৯

অর্ধক্রোশ (৫.৬ লি) বিস্তৃত ছিল।[১৫] মুঘল সম্রাট অক্বর-এর সময়ে বনারস ছিল একটি স্বতন্ত্র সরকার। *আইন্-ই-অক্বরীতে* উল্লেখ রয়েছে- বনারস সরকারের পরিমাণ ৩৬৮৬৯ বিঘা, ৮টি মহল এই সরকারের অধীন। প্রধান স্থান- অফ্রাদ, বনারস নগর ও তার সন্নিহিত স্থান- বিয়ালিসি, পন্দ্রহা, কস্বার, কতেহর, হরহূয়া।[১৬]

বর্তমানে বেনারস উত্তরপ্রদেশে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলের ভূমির পরিমাণ ১৮৩৩৭ বর্গমাইল। আজমগড়, মির্জাপুর, বনারস, গাজিপুর, গোরক্ষপুর, বস্তি ও বলিয়া জেলা এই বিভাগের অন্তর্গত। তন্মধ্যে বনারসজেলা ৯৯৮ বর্গমাইল বিস্তৃত, এই জেলার উত্তরসীমায় গাজিপুর ও জৌনপুর, পূর্বে শাহাবাদ এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে মির্জাপুর জেলা। এই জেলার প্রধান নগর বনারস (কাশীপুরী)। এই নগরী হিন্দুজাতির কাছে সুপবিত্র মহাপুণ্যপ্রদ কাশীতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।[১৭]

৪.১.২. কাশী নামকরণ :

কাশী ও বারাণসী নামদুটির ঐতিহ্য অনুসন্ধানে নানা গ্রন্থে নানান মতের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। *শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে* এবং *কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে* 'কাশী' শব্দটির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[১৮] *কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে* কাশী একটি বিস্তৃত জনপদ ও পবিত্র যজ্ঞভূমি বলে উল্লেখ রয়েছে।[১৯] ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বারাণসী শব্দটিকে Varāṇasī বা Bārāṇasī বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২০]

---

[১৫] See Beal's Records of the Western Countries, vol.II, *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৪, পৃ.৬৬

[১৬] তত্রৈব

[১৭] তত্রৈব

[১৮] অতঃ কাশযোঽগ্নীনা দত্তং। শতপথব্রা., ১৩.৫.৪০৯

যঞ্জং কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব। শতপথব্রা., ১৩.৫.৪২১

[১৯] কৌষীতকীব্রা., ৩.১ ; ৫.১

[২০] S.N. Majumdar, *Ancient Geography of India*, Cunningham, p. 500

অন্যদিকে Barāṇ বা Varaṇā নামক ছোটো নদী এবং অসি হল আরেকটি নদী। এদের নাম মিলে হয়তো বারাণসী শব্দটি নিষ্পন্ন। *অথর্ববেদে* (৪.৭.১) বরণাবতী (Varaṇāvatī) নদীর নাম পাওয়া যায় এবং যাকে বিষনাশের সম্পদ বলে উল্লিখিত করা হয়েছে। উল্লিখিত বরণাবতী নদীর সঙ্গে বরণা নামক ক্ষুদ্র নদীর সাদৃশ্য রয়েছে মনে করা হয়ে থাকে। ম্যাকডোনেল ও কীথের মতে, কাশী শব্দটি পরবর্তী কালের। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে নগরটি প্রাচীন, কিন্তু তাঁরা মনে করেন বরণাবতী ও পরবর্তীকালে বারাণসীর মধ্যে একটি যোগ রয়েছে।[২১] *জাতকে* (৫.৫৪ ; ৬.১১৫) বারাণসীকে কাশীনগর ও কাশীপুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *বিষ্ণুস্মৃতিতেও* (৮৫,২৮) উক্ত মতের সমর্থন মেলে। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* [২২]-তে (৪.২.১১৬) কাশীর নামোল্লেখ রয়েছে। বাল্মীকিকৃত *রামায়ণে* কাশী ছিল একটি বিস্তৃত জনপদ[২৩]। সেই সময় রমণীয় তোরণ ও প্রাকারপরিশোভিত প্রধাননগরী বারাণসী ছিল কাশীরাজ্যের রাজধানী[২৪] এবং প্রতিষ্ঠান (প্রয়াগ) পর্যন্ত কাশীজনপদের অন্তর্ভুক্তি ছিল, তার উল্লেখ রয়েছে[২৫]।

---

[২১] *Vedic Index*, vol-3, p. 154

[২২] কাশ্যাদিভ্যষ্ঠঞ্ঞিঠৌ, অষ্টা., ৪.২.১১৬

[২৩] রাম., কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০.২২, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৫

[২৪] তাং বিসৃজ্য ততো রামো বযস্যমকুতোভযম্।

প্রতর্দ্দনং কাশিপতিং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীত্।।

উদ্যোগশ্চ ত্বযা রাজন্ ভরাতেন কুতঃ সহ।

তদ্ভবানদ্য কাশেযপুরীং বারাণসীং ব্রজ।

রমণীযাং ত্বযা গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্।। রাম., উত্তরকাণ্ড, ৪.১৫-১৭, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৫

[২৫] ততঃ কালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্।

ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ।।

পুরুশ্চকার তদ্রাজাং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।

প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজ্যে মহাযশাঃ।। রাম., উত্তরকাণ্ড, ৬৯.১৮-১৯, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৫

কাশীর নাম কাশী কেন? এই প্রসঙ্গে নানা পুরাণে নানা জনশ্রুতি পাওয়া যায়। *শিবপুরাণ* মতে, এখানে জীবগণ শুভাশুভ কর্ম সমুদায় ক্ষয় করে মুক্তি লাভে সমর্থ হওয়ায় এই স্থানের নাম কাশী।[২৬] *স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডের* মতে, বাক্যের অগোচর পরম জ্যোতি এই ক্ষেত্রে প্রকাশমান হয় বলে, এই স্থান কাশী নামে প্রসিদ্ধ।[২৭] *লিঙ্গপুরাণ* মতে, ভগবান্ শিব এই ক্ষেত্র কখনই পরিত্যাগ করেন না, এই কারণে এই স্থানের নাম হয়েছে অবিমুক্ত।[২৮] *মৎস্যপুরাণে* স্বয়ং মহাদেবের মুখে শোনা যায়, অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তার নিরন্তর সান্নিধ্য থাকায় তিনি কখনই এস্থান পরিত্যাগ করেন না, এই জন্য এই ক্ষেত্রটি অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত।[২৯] *কূর্মপুরাণ* মতে, অন্তরীক্ষে অবস্থিত শিবের আলয়স্বরূপ এই ক্ষেত্র ভূলোকের সঙ্গে সংলগ্ন নয়, এই কারণে ক্ষেত্রটির নাম অবিমুক্ত। অর্থাৎ সংসার মায়াবদ্ধ জীবগণ এই ক্ষেত্রটিকে দেখতে পান না কিন্তু সংসারবন্ধন থেকে বিমুক্ত মহাত্মারা কেবল মানসচক্ষে এই শ্রীক্ষেত্রটিকে দেখতে পান বলেই এটি অবিমুক্ত নামে প্রসিদ্ধ।[৩০] কাশীতে একটি প্রবাদ আছে, বরণার নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি কাশীতে রাজত্ব করতেন (*ভবিষ্যপুরাণের* ব্রহ্মখণ্ড ৫৩.১০৬-১২৬)। তাঁরই নামানুসারে এই নগরীর নাম বারাণসী হয়েছে। এই রাজা কাশীপুরীতে বারাণসী নামে এক দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা

---

[২৬] কর্ম্মাণাং কর্ষণাত্ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে। রাম., *শিবপুরাণ*, জ্ঞানসংহিতা, ৪৯.৪৬, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৪

[২৭] কাশতেঽত্র যতো জ্যোতিস্তদনাখ্যেযমীশ্বর।

অতো নামাপরং চাস্তু কাশীতি প্রথিতং বিভো।। স্কন্দপু., ২৬.৬৭

[২৮] বিমুক্তং ন ময়া যস্মান্ মোক্ষতে বা কদাচন।

মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।। লিঙ্গপু., ৯২.৪৫

[২৯] যত্র সন্নিহিতো নিত্যমবিমুক্তে নিরন্তরম্।

তত্ক্ষেত্রং ন ময়া মুক্তমবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্।। মৎস্য., ১৮১.১৫

[৩০] ভূর্লোকে নৈব সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালযম্।

অবিমুক্তা ন পশ্যন্তি মুক্তা পশ্যন্তি চেতসা।

শ্মশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।। কূর্মপু., ৩০.২৬-২৭

করেন এবং বর্তমানেও নাকি সেই মূর্তি কাশীতে প্রতিষ্ঠিত, এরকম বলা হয়ে থাকে।[৩১] *বিষ্ণুপুরাণ* [৩২](৪.৮.২) ও *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ* [৩৩] মতে আয়ুবংশীয় সুহোত্রপুত্র কাশ প্রথম রাজা হয়েছিলেন। তার পুত্র কাশিরাজ বা কাশ্য। সম্ভবতঃ এই কাশীরাজের নামানুসারে তাঁর রাজ্য কাশি বা কাশী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পুনরায় কাশবংশীয় চব্বিশজন রাজা এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন।[৩৪] বুদ্ধদেবের সময় বারাণসীতে দেবদত্ত নামে একজন রাজার কথা জানা যায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে উঠলে কাশী রাজ্য মগধরাজের অধীন হয়েছিল। *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে* বলা রয়েছে, প্রদ্যোতবংশীয় পঞ্চপুত্র একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করবেন। তারপর শিশুনাগ তাদের যশ হরণ করে রাজত্ব করবেন এবং তিনি বারাণসী রাজ্যে নিজপুত্রকে সংস্থাপিত করে (মগধরাজ্যস্থিত) গিরিব্রজে গমন করবেন।[৩৫]

মহাভারতের [৩৬] অনুশাসনপর্বের ৩০তম অধ্যায়ে হর্য্যশ্বের কথা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বারাণসী নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ হর্য্যাশ্বের রাজত্বকালে বারাণসী নগরী স্থাপিত হয়েছিল। ঠিক সেই সময় যদুবংশীয় হৈহয় পুত্রগণের সঙ্গে কাশিরাজের বিবাদের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধে হৈহয়পুত্রেরা হর্য্যাশ্বের প্রাণসংহার করেন। হর্য্যাশ্ব নিহত হলে সুদেব কাশীর সিংহাসনে বসেন। পরবর্তীতে হৈহয়গণ সুদেবকে সংহার করেন। এরপর সুদেবপুত্র দিবোদাস পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। এই সময় কাশীর রাজধানী বারাণসী গোমতীর দক্ষিণকূলে ও গঙ্গার উত্তরে স্থাপিত ছিল। দিবোদাস শত্রুর ভয়ে রাজধানী সুদৃঢ় করেছিলেন। *বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত* ও *গরুড়পুরাণের*

---

[৩১] *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ৪, পৃ.৬৫

[৩২] ক্ষত্রবৃদ্ধাত্ সুহোত্রঃ পুত্রো'ভূত্। কাশ-লেশ-গ্ররত্সমদাস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়ো'ভবন্... কাশস্য কাশিরাজঃ, ততো দীর্ঘতমাঃ পুত্রো'ভবত্। বিষ্ণুপু., ৪.৮.২

[৩৩] সুনহোত্রের পুত্র কাশ, তৎপুত্র কাশ্য। *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ৪, পৃ.৬৭

[৩৪] কাশেযাস্তু চতুর্বিংশদষ্টাবিংশত্ তু হৈহযাঃ। মৎস্য., ২৭২.১৪

[৩৫] অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাং প্রাদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ।

হত্বা তেষাং যশঃ কৃত্স্নং শিশুনাগো ভবিষ্যতি।

বারাণস্যাং সুতং স্থাপ্য সংপ্রাপ্স্যতি গিরিব্রজম্।। ব্রহ্মাণ্ডপু., উপোদ্ঘাতপাদ ৩৪ অধ্যায়

[৩৬] এই সংক্রান্ত তথ্যের জন্য *বাংলা বিশ্বকোষ* চতুর্থ খণ্ডের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। পৃ. ৬৭-৬৮

মতে, দিবোদাস ভীমরথের পুত্র ছিলেন। কাশিরাজ দিবোদাসের নাম *ঋগ্বেদানুক্রমণিকায়* পাওয়া যায়।[৩৭] কিন্তু উভয়ে একই ব্যক্তি কিনা সেবিষয়ে আলোচনার দাবি রাখে। বৈয়াসিক *মহাভারতের* উদ্যোগপর্বের ১১৬তম অধ্যায়ে দিবোদাসের কথার উল্লেখ রয়েছে।

বৌদ্ধগ্রন্থে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এনার রাজত্বকাল সম্পর্কে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। মগধরাজগণের পতনের পর এই স্থান গুপ্তরাজাদের অধীন হয়। এই রাজবংশে বালাদিত্যের পুত্র প্রকটাদিত্যের নাম পাওয়া যায়[৩৮]। সম্ভবতঃ ইনি খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকের কাশীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। পরবর্তীতে কাশী কনোজরাজের শাসনাধীন হয়। কলচুরি ও পালবংশীয়দের মিলিত আক্রমণে খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীতে কাশী কনোজদের হাত ছাড়া হয়। এসব বলবার কারণ হল, কাশী বিভিন্ন রাজশক্তির কাছে হস্তান্তরিত হতে হতে এক সময় অকবর বাদশাহের রাজত্বে মির্জা চীন কলিজ বারাণসীর ফৌজদার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময় বারাণসী আলাহাবাদ সুবার অধীন ছিল। অরঙ্গজেব এক সময় বারাণসীর নাম পরিবর্তন করে, এই স্থানের নাম রাখছিলেন 'মুহম্মদাবাদ'। পরবর্তীতে ইসলামীয় গ্রন্থে ও অযোধ্যার নবাবদের কাছে বারাণসী 'মুহম্মদাবাদ' নামেই প্রচলিত হয়েছিল।[৩৯]

বারাণসী নামটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। জৈন বিবিধতীর্থকল্প অনুযায়ী বারাণসী চারভাগে বিভক্ত। যথা- ১. দেব-বারাণসী (এই স্থানে বিশ্বনাথের মন্দির রয়েছে। যার মধ্যে ২৪জন জিনপট্টকে দেখা যায়), ২. রাজধানী-বারাণসী (এখানে যবনরা থাকত), ৩. মদন-বারাণসী, ৪. বিজয়-বারাণসী।[৪০] অন্যদিকে বারাণসী দুটি। একটি হল পূর্ব বারাণসী ও অন্যটি হল উত্তর বারাণসী। পূর্ব বারাণসী উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। উত্তর বারাণসী উত্তরাখণ্ডে। এই উত্তর বারাণসীতেও এক বিশ্বনাথ মন্দির রয়েছে। বলা হয়, তীর্থ যাত্রীরা চারধামের (গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ) যাত্রা শুরু করবার পূর্বে উত্তরকাশীর বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন

---

[৩৭] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৬৭

[৩৮] *তদেব.*, পৃ.৬৮

[৩৯] *তদেব.*, পৃ.৬৯

[৪০] B.C.Law, *Some Jaina Canonical Sūtras*, p. 111

করে তাদের যাত্রা আরম্ভ করেন। এই উত্তরকাশী বর্তমানে যেমন একটি ধার্মিক স্থান তেমনই প্রসিদ্ধ hill station.[৪১]

৪.১.৩. কাশী তীর্থের বিবরণ :

বারাণসী বা কাশী নগরী প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুদের অতিপবিত্র তীর্থ বলে সুপ্রসিদ্ধ। বৈয়াসিক-*মহাভারতের* উদ্যোগপর্বের ৮৪তম অধ্যায়ে তীর্থরূপে বারাণসী নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা আছে, বারাণসীতে গিয়ে বৃষভবাহন মহাদেবকে অর্চনা করলে ও কপিলাহ্রদে স্নান করলে রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ হয়ে থাকে। তারপরে অবিমুক্তক তীর্থে গমন করে দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ দূর হয় ও তথায় প্রাণত্যাগ করলে মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে। এই বিবরণ পাঠ করলে বোধ হয় যে বারাণসী ও অবিমুক্তক দুটি স্বতন্ত্র তীর্থ এবং উভয় তীর্থই পরস্পর নিকটবর্তী। *মৎস্য, শিব, গরুড়, কূর্ম ও লিঙ্গ* প্রভৃতি পুরাণ মতে কাশীর একটি পর্যায় হল অবিমুক্তক। কিন্তু *মহাভারতে* দুটিকে স্বতন্ত্র করবার কারণ হল, *কাশীখণ্ডে* বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর নামে দুটি স্বতন্ত্র শিবলিঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ যেখানে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত, সেই স্থান অবিমুক্তক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ অবিমুক্তক তীর্থ বারাণসীরই অন্তর্গত।

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড অনুযায়ী, বিষ্ণু এক সময় কাশীবাসীকে মোহিত করবার জন্য বৌদ্ধরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন[৪২] । এই বর্ণনাটি যে রূপকধর্মী বর্ণনা সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং এক সময় কাশীতে যে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অবমানিত হয়েছিল সেবিষয়ে অনুমান করা যায়। সম্ভবতঃ রিপুঞ্জয় দিবোদাস প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, কারণ কাশীখণ্ডে বলা রয়েছে অসুরগণ রাজা রিপুঞ্জয় দিবোদাসের স্তব করে বলেছিলেন যে, তার রাজ্যে দেবগণ থাকতে পারবে না। সুতরাং তারা নিজ নিজ বিভাবানুসারে তার সেবা করবেন।[৪৩] উক্ত শ্লোক থেকে

---

[৪১] web: gangotri Documentary DD National

[৪২] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৪, পৃ.৭৩

[৪৩] সংসেবিষ্যামহে রাজন্নসুরাস্ত্বাং স্ববৈভবৈঃ।

বযং যতস্ত্বদ্বিষয়ে সুরাবাসোঽপি দুর্লভঃ।। *কাশীখণ্ড, বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৪, পৃ.৭৩

অনুমান করা যায়, অসুর অর্থাৎ দেববিদ্বেষিগণেরা সর্বদাই রিপুঞ্জয়ের কাছে থাকতেন। দেবভক্ত ব্রাহ্মণাদিরা তার রাজ্যে খুব একটা বাস করতেন না। সম্ভবতঃ কাশীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরুত্থানের সময় কোনও বৌদ্ধ রাজাই রাজত্ব করেছিলেন। পরে সেই রাজা ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষিত হন। তার সময় থেকেই হয়তো পবিত্র বারাণাসীধামে পুনরায় দেবালয় ও দেবমূর্তি স্থাপিত হতে শুরু করেছিল। *বিষ্ণুপুরাণে* কাশীদহনের কথায় উল্লেখ রয়েছে যে, ভগবান বিষ্ণু এক সময় সুদর্শনচক্র দ্বারা বারাণসী দগ্ধ করেছিলেন।[৪৪]

বারাণসীতে এক সময় যে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, তার নিদর্শন বর্তমানেও মেলে। বারাণসীর পার্শ্ববর্তী সারনাথ বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র স্থান বলে প্রসিদ্ধ। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে চীনাপরিব্রাজক ফা-জিয়েন ও খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে জুয়াং-সান সারনাথে এসেছিলেন এবং তখনও এইস্থানে বহু বৌদ্ধকীর্তি ছিল।[৪৫] বারাণসীর উত্তরপশ্চিমে চার মাইল দূরে সারনাথ অবস্থিত। শিবের নামানুসারেই এই স্থানের নাম হয়েছে সারনাথ। কেন এই স্থানের নাম সারনাথ তা বলা মুসকিল। সম্ভবতঃ নাথ শব্দটি শিবের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং সারঙ্গ শব্দের অর্থ হরিণ। আবার শিব পশুপতি হিসেবে প্রসিদ্ধ। ফলে সারঙ্গনাথ শব্দটি থেকেই সারনাথ শব্দটি আসবার সম্ভবনা রয়েছে। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনা-পরিব্রাজক ফা-জিয়েন সারনাথ ও বারাণসীতে এসেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, কাশীনগরের প্রায় দুইক্রোশ দূরে মৃগদাব (বর্তমানে সারনাথ) অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই স্থানে প্রত্যেকবুদ্ধ বাস করবার জন্য এই স্থানের নাম ঋষিপত্তন। খ্রিস্টিয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনা-পরিব্রাজক জুয়াং-সান এসে যেসকল স্থান পরিক্রমণ করেছিলেন। তাঁর রচিত বারাণসী ও সারনাথের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম তখনও পর্যন্ত পাশাপাশি থেকে নিজেদের গৌরবরক্ষা করেছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ের পর থেকেই সারনাথের অবস্থার অবনতি শুরু হয়।

---

[৪৪] ততঃ কাশীবলং ভূরি প্রমথানাং তথা বলম্।

সমস্তশস্ত্রাস্ত্রযুতং চক্রস্যাভিমুখং যযৌ।।

শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষচতুরং দগ্ধ্বা তদ্বলমোজসা।

কৃত্যাগর্ভামশেষাং তাং দগ্ধ্বা বারাণসীং পুরীম্।। বিষ্ণুপু., ৫.৩৪. ৪০-৪১

[৪৫] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৭৩

পরবর্তীতে খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মনোযোগ সারনাথের ধ্বংসাবশেষের উপর পরেছিল।[৪৬] মুসলিমদের হাতে কাশী বিশ্বনাথমন্দিরের মতো সারনাথও সমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে এত স্থান থাকতে কাশীর নিকটবর্তী সারনাথকেই কেন বেছে নেওয়া হয় বৌদ্ধধর্মপ্রচারের জন্যে? বিষয়টি লক্ষণীয়। তাহলে কি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচারকে বাধা দেবার জন্যেই তার এই প্রচেষ্টা ছিল। কারণ ঐতিহাসিকদের মতে, পূর্বভারতের মগধের দিক থেকেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের প্রথম প্রবেশ ঘটে। এই দুটি ধর্ম এসেই প্রথম বৈদিকধারাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখিন করে।[৪৭] সেদিক থেকে দেখতে গেলে বৌদ্ধতীর্থ হিসেবে সারনাথকে মন্যতা প্রদান করবার অন্তরালে একধরণের ধর্মীয়-রাজনীতি কাজ করেছে।

৪.১.৪. নির্বাচিত সংস্কৃতপুরাণের আলোকে কাশীমাহাত্ম্য বর্ণন :

কাশীর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক আলোচনার পাশাপাশি কালের নিরিখে পুরাণগুলিতে আলোচিত বারাণসীমাহাত্ম্য বা কাশীমাহাত্ম্য বিষয়ক বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *কূর্মপুরাণে* পূর্বভাগে ত্রিংশ অধ্যায় থেকে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে বারাণসীমাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।[৪৮] এই পুরাণে বারাণসীমাহাত্ম্য প্রসঙ্গের প্রারম্ভে দেখা যায়, ঋষিগণ সুতের কাছে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দিব্য বারাণসী গমনের বর্ণনা জানতে চেয়েছেন।[৪৯] এরপরে বিশ্বনাথ মহাদেবের পূজার কথা এবং শ্রীদেবী ও ঈশ্বরের কথোপকথন দ্বারা অধ্যায়টি সুবিন্যস্ত।[৫০] ঈশ্বর মহাদেব বারাণসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বারাণসীকে গুহ্যতম ক্ষেত্র ও সকল প্রাণীর উদ্ধার পাবার স্থান বলে

---

[৪৬] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ২১, পৃ.৪৮১-৪৮৫

[৪৭] *Veda Parikrama Naba Paryay* by Samiran Chakrabarti 30. 06.15, Time: 9 am, 27.02.2023 (Youtube)

[৪৮] কূর্মপু., পৃ. ১৫৮-১৭৫

[৪৯] প্রাপ্য বারাণসীং দিব্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০.১

[৫০] কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০অধ্যায়

অভিহিত করেছেন।[৫১] বারাণসী সকল তীর্থের মধ্যে উত্তম, সকল স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞানস্বরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫২] বারাণসী শ্মশান বলে বিখ্যাত।[৫৩] সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বারাণসীতে কালবশে মৃত্যু ঘটলে কোনও পাতকই নরক গমন করে না, তারা প্রত্যেকে শিব পুরীতে স্থান লাভ করে।[৫৪] এই মতের সমর্থনে বলা হয়েছে, বারাণসীতে মৃত্যু হলে যেমন পরম মোক্ষ লাভ হয়, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, শ্রীশৈল, হিমালয়, কেদার, ভদ্রকর্ণ, গয়া, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, রুদ্রকোটি, নর্মদা, হাটকেশ্বর, শালগ্রাম, কুব্জাম, আনুত্তম কোকামূখ, প্রভাস, বিজয়েশান, গোকর্ণ, শঙ্কুকর্ণ এই সকল ত্রিভুবন বিখ্যাত পুণ্যস্থানেও সেরূপ মুক্তি লাভ হয় না।[৫৫] এই অধ্যায়ে মৃত্যুর পর মোক্ষের ধারণাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে দৃঢ় করবার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। লক্ষণীয় বিষয় বারাণসী ব্যতীত যে সমস্ত স্থানের কথা

---

[৫১] পরং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং মম বারাণসী পুরী।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং সিংসারার্ণবতারিণী।। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০.২২

[৫২] উত্তমং সর্ব্বতীর্থানাং স্থানানামূত্তমঞ্চ যত্।

জ্ঞানানামুত্তমং জ্ঞানমবিমুক্তং পরং মম।। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০.২৪

[৫৩] শ্মশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০.২৭

[৫৪] চন্দ্রার্দ্ধমৌলযস্ত্র্যক্ষা মহাবৃষভবাহনাঃ।

শিব মম পুরে দেবি জাযন্তে তত্র মানবাঃ।। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০.৩২

[৫৫] প্রয়াগং নৈমিষং পুণ্যং শ্রীশৈলো'থ হিমালয়ঃ।

কেদারং ভদ্রকর্ণং গয়া পুষ্করমেব চ।।

কুরুক্ষেত্রং রুদ্রকোটির্নর্ম্মদা হাটকেশ্বরম্।

শালগ্রানঞ্চ কুব্জাম্রং কোকামুখমনুত্তমম্।।

প্রভাসং বিজযেশানং গোকর্ণং শঙ্কুকর্ণকম্।

এতানি পূণ্যস্থানানি ত্রৈলোক্য বিশ্রুতানি চ।

ন যাস্যন্তি পরং মোক্ষং বারাণস্যাং যথা মৃতাঃ।। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০.৪৬-৪৯

উল্লেখ করা হয়েছে সেই সকল স্থানে কমবেশি শবদাহ কার্য হয়ে থাকে। কিন্তু বারাণসীকে এত গুরুত্ব দেবার অন্তরালে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান। সেই কালের গুরুত্বপূর্ণ জনপদগুলির অন্যতম কাশী। শবদাহ যে নিছক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নয়, তা উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট। কারণ বহু মানুষের জীবিকা নির্বাহের স্থান ছিল এই বারাণসী। বর্তমানেও গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকাঘাট তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কেবল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নয়, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সাথে জড়িত পুরোহিত সমাজ, হরিজন সমাজ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমাজ। এ অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে যে, বারাণসীতে দান, জপ, হোম, যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান, অধ্যয়ন, জ্ঞান ও অন্যান্য কাজ অক্ষয় প্রাপ্তি লাভ করে।[৫৬] বরণা ও অসি এই দুই নদীর মধ্যে অবস্থিত বারাণসীতে অবিমুক্তক নামক তত্ত্ব নিয়ত অবস্থানের কথা বলা রয়েছে।[৫৭] যে তত্ত্ব সকল মুক্তির উপায়।

কূর্মপুরাণের একত্রিংশ অধ্যায়ে কিছু গুহ্যলিঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যথা- কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ, মধ্যমেশ্বর উত্তর লিঙ্গ, বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ, ওঙ্কার লিঙ্গ, কপদ্দীশ্বর উত্তম লিঙ্গ এগুলি বারাণসীর মধ্যে গুহ্যলিঙ্গ।[৫৮] উল্লেখযোগ্য এখানে গুহ্যলিঙ্গের তালিকায় যে ওঙ্কারলিঙ্গের কথা বলা হয়েছে সেটি নর্মদানদী তীরস্থ ওঙ্কার জ্যোতির্লিঙ্গ থেকে পৃথক্। গজাকৃতি দৈত্যকে শূল দ্বারা আহত করে, তার চর্ম্যকে নিজবস্ত্র হিসেবে ধারণ করায় তিনি কৃত্তিবাসেশ্বর নামে খ্যাত।[৫৯] দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে কপদ্দীশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে এক ভীষণ শার্দ্দুল ও এক মৃগীর কথা বর্ণিত

---

[৫৬] দত্তং জপ্তং হুতঞ্চেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যত্।
ধ্যানমধ্যযনং জ্ঞানং সর্ব্বং তত্রাক্ষযং ভবেত্।। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০.২৯

[৫৭] বরণাযাস্তথা চাস্যা মধ্যে বারাণসী পুরী।

তত্রৈব সংস্থিতং তত্ত্বং নিত্যমেবাবিমুক্তকম্।। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০.৬৩

[৫৮] কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং মধ্যমেশ্বরমুত্তমম্।

বিশ্বেশ্বরং তথোঙ্কারং কপদ্দীশ্বরমুত্তমম্।। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩১.১২

[৫৯] হত্বা গজাকৃতিং দৈত্যং শূল্লেনাবজ্ঞযা হরঃ।

বাসস্তস্যাকারোত্ কৃত্তিং কৃত্তিবাসেশ্বরস্ততঃ।। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩১.১৮

আছে। এই গল্পে মৃগী কপর্দ্দীশ্বরের সামনে শার্দুল কর্তৃক নিহত হয় ও মুক্তি লাভ করে।[৬০] এরপরে যেখানে এক পিশাচের গল্পে জানা যায়- পিশাচ নিজমুখে স্বীকার করে, সে পূর্বজন্মে ধনধান্যযুক্ত ও পুত্র-পৌত্রাদি-সমন্বিত এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে সর্বদা কুটুম্ববর্গের ভরণপোষণে সমুৎসুক থাকত। কিন্তু সে কখন দেবতা, ধেনু ও অতিথির পূজা করে নি, কখনও সামান্য বা অধিক পূণ্যকার্যও করেনি। একদা সে বারাণসীতে বৃষভবাহন বিশ্বেশ্বরকে দেখে তাঁকে স্পর্শ করে নমস্কার করে। এই ঘটনার বহুদিন পরে সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। কিন্তু সে মুক্তি না পেয়ে, পৈশাচ যোনি প্রাপ্ত হয়ে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে কষ্টে রয়েছে। এমতাবস্থায় শঙ্কুকর্ণ মুনি পিশাচকে মুক্তির পথ সম্বন্ধে অবগত করেন। তিনি পিশাচকে বিশ্বেশ্বর শিবের দর্শন ও স্পর্শের কথা জানান এবং পিশাচ সমাহিতচিত্তে কুণ্ডে স্নান করলে সেই কুৎসিত যোনি থেকে মুক্তি লাভ ঘটে। ফলে সেই কুণ্ডের নাম হয় পিশাচমোচন কুণ্ড।[৬১] এই গল্পটি থেকে উপলব্ধি হয়, তৎকালীন সমাজের চিত্র। স্মৃতিতে বলা হয়, ব্রাহ্মণের কর্তব্য হল অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন, দান-প্রতিগ্রহ। কিন্তু এই গল্পে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মে সে কখনই তার কর্তব্য পালন করে নি এবং তারজন্য জীবনদশায় তার কোনও অসুবিধেও হয় নি। তার অসুবিধে হল মৃত্যুর পর মুক্তির সময়। এই গল্পটি থেকে এই কথাটি সুস্পষ্ট যে তৎকালীন সমাজে এই ধরণের শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী ব্রাহ্মণেরও অস্তিত্ব ছিল, সে বিষয়ে অনুমান করা যায় এবং শাস্ত্রবিরোধী পথে চলবার পরেও তার জীবন নির্বাহে কোনও সমস্যা হয় নি। সমস্যা এসে হাজির হয় তার মৃত্যুর পরে পিশাচ যোনিতে জন্মের পর। সুতরাং সামাজিক ও পরলৌকিক সমস্যা সমাধানের পথও কোথাও গিয়ে মিলিত হয় তীর্থস্থানে। এটি তীর্থমাহাত্ম্য প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কূর্মপুরাণের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ মাহাত্ম্যের কথা বলা আছে। এই মাহাত্ম্যের ফলপ্রাপ্তি অংশে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি মন্দাকিনীতে স্নান করে উত্তম মধ্যমেশ্বরের পূজা করেন তিনি ধন্য। এখানে স্নান, দান, তপস্যা, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদানাদির মধ্যে কোনও একটির অনুষ্ঠান করলে, সেই ব্যক্তির সপ্তমকূল পবিত্রতা লাভ করে। সূর্য রাহুগ্রস্ত হলে সন্নিহতীতে স্নান করলে

---

[৬০] কশ্চিদভ্যাগমত্ তুর্ণং শার্দ্দুলো ঘোররূপধ্বক।

মৃগীমেকাং ভক্ষয়িতুং কপর্দ্দীশ্বরসত্তমম্।। ... কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩২.৪-৯

[৬১] কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩২.১৬-৩৬

যে ফল লাভ হয়, এই স্থানে স্নান করলে তার দশগুণ ফল লাভ হয়ে থাকে।[৬২] এই বর্ণনাতে লক্ষণীয় বিষয় হল কূলের পবিত্রতা ও পূণ্যফললাভ, যা কোনোমতেই দর্শনযোগ্য নয়। স্নান, দান, তপস্যা ইত্যাদি কিছু বিশেষ কাজ ধর্মপ্রাণ মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে করে থাকেন। কিন্তু কোনও বিশেষ স্থানকে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে এই ধরণের বিবরণ দেওয়া সেই সময়ের খুব স্বাভাবিক ভঙ্গি। কেবল সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নয়, এর সাথে জড়িত অর্থনৈতিক দিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতি।

কূর্মপুরাণের পরবর্তী অধ্যায়ে তীর্থের একটি সুবৃহৎ তালিকা নির্দেশ করা হয়েছে এবং সেই সকল স্থানে বেদব্যাস, জৈমিনি প্রমুখ শিষ্যগণরা গিয়েছিলেন সে কথা বলা হয়েছে।[৬৩] পূর্বেই এই তীর্থের তালিকাটি পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষে পরম গতি লাভের কথা বলা হয়েছে। কখন এই পরম গতি লাভ হবে? সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি অবিমুক্তমাহাত্ম্য শ্রবণ করলে, স্বয়ং পাঠ করলে, শ্রাদ্ধকালে, দৈবকার্যে, রাত্রিকালে, দিনে, নদীতীরে বা দেবমন্দিরে বসে পাঠ করলে, পরম গতি প্রাপ্ত হয়।[৬৪] অর্থাৎ শ্রবণ ও পাঠের কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা সময় দেওয়া হয় নি, এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

মৎস্যপুরাণের ছয়টি অধ্যায়ে বারাণসীমাহাত্ম্যের কথা বলা রয়েছে (অশীত্যধিকশততম অধ্যায় – পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়)। ১৮০তম অধ্যায়ের পুষ্পিকা অংশে বারাণসীমাহাত্ম্য বলে পরিচ্ছেদের নাম দেওয়া হয়েছে।[65] পরে ১৮১তম-১৮৫তম অধ্যায়ের পুষ্পিকা অংশে

---

[৬২] ধন্যাস্তু খলু যে বিপ্রা মন্দাকিন্যাং কৃতোদকাঃ।

অর্চ্চযন্তি মহাদেবং মধ্যমেশ্বরমুত্তমম্।।

স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধং পিণ্ডনির্ব্বপণস্ত্বিহ। ...

উবাস সুচিরং কালং পূজযন্ বৈ মহেশ্বরম্।। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩৩. ২৯-৩২

[৬৩] কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩৪. ১-২০

[৬৪] মঃ পঠেদবিমুক্তস্য মাহাত্ম্যং শৃণুযাদথ।

শ্রাবযেদ্বা দ্বিজাঞ্ছান্তান্ স যাতি পরমাং গতিম্।। ... কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩৪. ৩৪-৩৬

[৬৫] ইতি শ্রীমাত্স্যে মহাপুরাণে বারাণসীমাহাত্ম্যে দণ্ডপাণিবরপ্রদানং নামাশীত্যধীকশততমো'ধ্যায়ঃ। মৎস্য., ১৮০তম অধ্যায়

অবিমুক্তকমাহাত্ম্য বলে পরিচ্ছেদের নাম দেওয়া হয়েছে।[৬৬] কেন এরূপ নামের ভিন্নতা করা হল, এর কারণ অজানা। একইভাবে বায়ুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, কূর্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে কাশীকে অবিমুক্তকক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৭] *মৎস্যপুরাণের* কাশীমাহাত্ম্যের প্রারম্ভিক প্রথম অধ্যায়ে হরিকেশ নামক এক মহাপ্রতাপী যক্ষের গল্প রয়েছে। তার পিতার নাম পূর্ণভদ্র। হরিকেশ ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ, ধার্মিক ও হরগতপ্রাণ ছিল। সে উপবেশনে, শয়নে, গমনে, দণ্ডায়মানে, অনুব্রজনে, পানে এমনকি ভোজনেও একমাত্র হরকেই অনুধ্যান করত। একদিন তার বাবা পূর্ণভদ্র তাকে ভৎর্সনা করে বলেন যক্ষবংশধরগণের কদাচ এরূপ ধর্ম নয়। যক্ষদের গুহ্যক ও ক্রূরচেতা হওয়া উচিত। সুতরাং সে যেন মনুষ্যভাব উপেক্ষা করে স্বধর্ম আচরণ করে। হরিকেশ পিতার কথা অমান্য করে গৃহ, স্বজন-পরিজন পরিত্যাগ করে বারাণসীধামে উপস্থিত হয়। তদনন্তর তপশ্চরণে সেই যক্ষ স্থাণুপ্রায়, নির্নিমেষ, শুষ্ককাষ্ঠ, উপলখণ্ডের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে। এভাবে দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হলে তার গাত্রে বল্মীকস্তূপ উদ্‌গত হয় এবং পিপীলিকা দংশনে ও তীক্ষ্ণসূচীমুখ বজ্রকীট তাকে বিদ্ধ করতে থাকে। ফলে তার দেহ হতে মাংস, রুধির ও ত্বক্ অপগত হয়। কিন্তু সে শঙ্করকে ভাবনা করে অস্থিমাত্রে অবশিষ্ট হল, পার্বতীর অনুরোধে শঙ্কর কর্তৃক ক্ষেত্রমাহাত্ম্যের বর্ণিত হয়েছে। ক্ষেত্রমাহাত্ম্য আলোচনার পরে পুনরায় যক্ষোপাখ্যানটি শুরু হয়। দেবী পার্বতীর দৃষ্টিপরে শ্বেতবর্ণ বিচর্ম স্নায়ুবিদ্ধ অস্থিপঞ্জরশালী যক্ষের ওপর। দেবী শঙ্করকে তিরস্কার করে যক্ষের এরূপ অবস্থার কথা বলে যক্ষের ক্লেশের কারণ জানতে চান। এরপরে হরিকেশ যক্ষকে ভগবান দিব্যদৃষ্টি দান ও আশীর্বাদ করেন যে, সে সর্বজনপূজিত গণাধ্যক্ষ ধনদ হবে, তার জরা-মরণ থাকবে না, সকলের অজেয় হবে, কোকদের অন্নদান করে ক্ষেত্রপাল হয়ে এখানে অবস্থান করবে।[৬৮] এই ভাবে আখ্যানটির সমাপ্তি ঘটে। লক্ষণীয় বিষয় হল ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠতা। কোনও ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ হয় তবে তার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এই অধ্যায়েই বারাণসীর অপর নাম অবিমুক্ত সেই কথা বলা রয়েছে। কেন এই স্থানের নাম অবিমুক্ত সেই

---

[৬৬] ইতি শ্রীমাত্স্যে মহাপুরাণে'বিমুক্তমাহাত্ম্যে একাশীত্যধিকশততমো'ধ্যায়ঃ। মৎস্য., ১৮১তম অধ্যায়

[৬৭] শৌনক দেবকল্প, 'পুরাণকথায় কাশী', *কাশীবৃত্তান্ত পুরাণকাল থেকে সমকাল*, পৃ. ১৩-২৬

[৬৮] মৎস্য., ১৮০, পৃ. ৬৬৩-৬৭২

কথাও বলা রয়েছে- ঈশ্বর কখন এই স্থান পরিত্যাগ করে নি বা কবেও না, সেইজন্য এর নাম অবিমুক্ত।[৬৯]

অবিমুক্ত প্রসঙ্গটি বলবার কারণ হল *মৎস্যপুরাণের* পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ের নাম অবিমুক্তমাহাত্ম্য (১৮১ – ১৮৫ অধ্যায়)। ১৮১তম অধ্যায়ে হরপার্বতীসংবাদে অবিমুক্তমাহাত্ম্য কথন, ১৮২তম অধ্যায়ে কার্তিকেয় কর্তৃক অবিমুক্তমাহাত্ম্য কথন, ১৮৩তম অধ্যায়ে অবিমুক্তক্ষেত্র বিষয়ক পার্বতীর প্রশ্ন ও তদনুসারে মহাদেবের তদুত্তর প্রদান, ১৮৪তম অধ্যায়ে অবিমুক্তক্ষেত্রে মরণদি ফল কীর্তন এবং ১৮৫তম অধ্যায়ে বারাণসীর প্রতি ব্যাসের শাপ প্রদানোদ্যোগ ও তৎক্রোধ শান্তি প্রভৃতি কথন। উক্ত অধ্যায়গুলিতে নানাভাবে অবিমুক্তমাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বিশেষ কিছু দিক উল্লেখযোগ্য। যথা- কোনও ব্রহ্মহত্যাকারী অবিমুক্তক্ষেত্রে গমন করলে তার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নিবৃত্ত হয়ে থাকে।[৭০] পাপী, শঠ, অধার্মিক মানব অবিমুক্ত গমনে সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়।[৭১] বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যাকারীর পাপ ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত কিন্তু অবিমুক্তক্ষেত্রে সেই পাপও ক্ষমাযোগ্য। ফলে সমাজের কোনও মানুষকেই ব্রাত্য করে রাখা যাবে না, সে পাপী, শঠ, অধার্মিক বা ব্রহ্মহত্যাকারীই হোকনা কেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে ধর্মীয় মোড়কে সব কিছুই মান্যতা পাচ্ছে কিন্তু ভালোমত দেখলে বোঝা যায় সামাজিক ঐক্যের কথা। পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। হয়তো কলুষতামুক্ত সমাজ গড়বার লক্ষ্যে শাস্ত্রকারদের এটি একটি অন্যতম পদক্ষেপ।

ধর্মাত্মা ব্যক্তি কাশীতে স্নান করলে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।[৭২] কোনও ব্যক্তি অবিমুক্ত ক্ষেত্রে দশ সৌবর্ণিক পুষ্প প্রদান করলে, তার অগ্নিহোত্রফল প্রাপ্ত হয়। ধূপ ও গন্ধ প্রদান

---

[৬৯] বিমুক্তং ন মযা যস্মান্মোক্ষ্যতে বা কদাচন।

মহত্ ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিদং স্মৃতম্।। মৎস্য., ১৮০.৫৪

[৭০] ব্রহ্মহা যো'ভিগচ্ছেত্ তু অবিমুক্তং কদাচন।

তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদ্ ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে।। মৎস্য., ১৮২.১৫

[৭১] যদি পাপো যদি শঠো যদি বা ধার্ম্মিকো নরঃ।

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো হ্যবিমুক্তং ব্রজেদ্ যদি।। মৎস্য., ১৮৩.১১

[৭২] দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।

করলে ভূমিদানতুল্য ফললাভ হয়। ক্ষেত্র মার্জন করলে পঞ্চশত অগ্নিহোত্রফল ও অনুলেপন করলে সহস্র অগ্নিহোত্র ফল লাভ করে। মালা দান করলে শত সহস্র ফল ও গীত-বাদ্য করলে অনন্ত ফল লাভ করে থাকে।[৭৩] ফললাভ বিষয়ে সবসময় অদৃষ্ট ফলের কথা বলা হচ্ছে। যা পুরোপুরি নির্ভর করছে স্নান ও দানের ওপর। একটি ধর্মীয় স্থান চলতে গেলে যে ধরনের উপকরণ ও উপাদান প্রয়োজন সেই দ্রব্যাদির যোগান কেবলমাত্র রাজকোষ থেকে করা অসম্ভব। ফলে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকেই যদি সেই দ্রব্যাদির যোগান কিছুটা হলেও হয়, তাতে অসুবিধে নেই। যদি কোনও ব্যক্তি সেই দ্রব্যাদির যোগানে অসমর্থ হয় তবে কায়িক শ্রমের দ্বারাও কিছুটা সুবিধা হয়ে থাকে। এই ধারণার কথা উপরি উক্ত শ্লোকগুলি থেকে স্পষ্ট।

শুধু অবিমুক্তক্ষেত্রে স্নান ও দান নয় এই স্থানে বাস করবারও কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে চারমাস বা একমাস বাস করবার কথাও বলা হয়েছে।[৭৪] যে বুধ ব্যক্তি শত বিঘ্ন সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে বাস করে, তিনি পরম স্থান প্রাপ্ত হন।[৭৫] এই ধরণের উক্তি অর্থনৈতিক দিকে ঈঙ্গিত বহন করে। নানা বর্ণ ও বিবর্ণ এমন কি চণ্ডালাদি জুগুপ্সিত জাতি, বহুপাতক, বহুদুষ্কার্যে পূর্ণদেহ হলেও তাদের পক্ষে এই ক্ষেত্র পরম ভেষজ।[৭৬] এই ধরণের উক্তি সর্ববর্ণ ও ধর্মের

তদবাপ্নোতি ধর্ম্মাত্মা তত্র স্নাত্বা বরাননে।। মৎস্য., ১৮৩.৭১

[৭৩] অগ্নিহোত্রফলং ধূপে গন্ধদানে তথা শৃণু।

ভূমিদানেন তত্ তুল্যং গন্ধদানফলং স্মৃতম্।।

সম্মার্জ্জনে পঞ্চশতং সহস্রমনুলেপনে।

মালযা শতসাহস্রমনন্তং গীতবাদ্যতঃ।। মৎস্য., ১৮৩.৭৮-৭৯

[৭৪] একত্র চতুরো মাসান্ মাসৌ বা নিবসেত্ পুনঃ।

অবিমুক্তে প্রবিষ্টানাং বিহারস্তু ন বিদ্যতে।। মৎস্য., ১৮৪.২২

[৭৫] স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি। মৎস্য., ১৮৪.৫৩

[৭৬] নানাবর্ণা বিবর্ণাশ্চ চণ্ডালা যে জুগুপ্সিতাঃ।

কিল্বিষৈঃ পুর্ণদেহাশ্চ প্রকৃষ্টৈঃ পাতকৈস্তথা।।

ভেষজং পরমং তেষামবিমুক্তং বিদুর্বুধাঃ।

সমন্বয়ের বার্তা বহন করে। যা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। কারা এই অবিমুক্তক্ষেত্রের সেবা করে না? সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে- যারা তমোগুণে আচ্ছন্ন মূঢ়লোক তারাই এই ক্ষেত্রের সেবা করে না।[৭৭] শুধু তাই নয় তারা বিষ্ঠা, মূত্র ও শুক্র মধ্যে পুনঃ পুনঃ বাস করে থাকে।[৭৮]

মৎস্যপুরাণের ১৮৫তম অধ্যায়ে ব্যাসদেবের একটি গল্প আছে। যেখানে ব্যাসদেব এক সময় বাস করেছিলেন। তিনি বহু ভ্রমণ করেও কোনও ভিক্ষা পান নি। তিনি ছয়মাস এই ক্ষেত্রে বাস করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণী, বিধবা, সংস্কৃতা বা অসংস্কৃতা নারী, বৃদ্ধা স্ত্রী কোনও ব্যক্তিই তাকে ভিক্ষা দান করে নি। কেন এরকম হল? এই জন্যে তিনি এই তীর্থের প্রতি শাপ দিতে উদ্যোত হন। এই কথা জানতে পেরে দেবী পার্বতী মানুষবেশে এসে তাকে ভিক্ষা দান করেন এবং মহাদেবের আদেশে সেই স্থান পরিত্যাগ করেন।[৭৯] যে নগরীতে এত সমৃদ্ধি, এত অনুকূল পরিবেশ সে নগরীতে এরকম ভিক্ষার অভাব দেখা দিল কেন সে বিষয়টি আশ্চর্যজনক। আরও বলা হয়েছে যদি কোনও ব্যক্তি অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করে, পুনরায় সেই স্থান হতে নিসৃত হয়, তাহলে জীবগণ তার উপহাস করে এবং তারা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিতে অত্যধিক অসক্ত তা বুঝতে হবে।[৮০] সব শেষে অবিমুক্তে পাঁচিটি শ্রেষ্ঠ তীর্থের কথা বলা হয়েছে- দশাশ্বমেধ, লোলার্ক, কেশব, বিন্দুমাধব ও মণিকর্ণিকা।[৮১] এই পাঁচটির মধ্যে দুটি হল বারাণসীর প্রসিদ্ধ ঘাট। বর্তমানে বারাণসীতে ৮৮টি ঘাট দেখতে পাওয়া যায়।

জাত্যন্তরসহস্রেষু হ্যবিমুক্তে ম্রিয়েত যঃ।। মৎস্য., ১৮৪.৫৬-৫৭

[৭৭] অবিমুক্তং ন সেবন্তে মূঢা যে তমসাবৃতাঃ।। মৎস্য., ১৮৪.২৮

[৭৮] বিণ্মূত্ররেতসাং মধ্যে তে বসন্তি পুনঃ পুনঃ। মৎস্য., ১৮৪.২৯

[৭৯] *মত্স্যপুরাণ,* ১৮৫.১৪-৪৪

[৮০] অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্তু যদি গচ্ছেত্ ততঃ পুনঃ।

তদা হসন্তি ভূতানি অন্যোন্যং করতাডনম্।

কামক্রোধেন লোভেন গ্রস্তা যে ভূবি মানবাঃ।

নিষ্ক্রমন্তে নরা দেবি দণ্ডনাযকমোহিতাঃ।। মৎস্য., ১৮৫.৬২-৬৩

[৮১] তীর্থানাং পঞ্চকং সারং বিশ্বেশানন্দকানেন।

লিঙ্গপুরাণে একটি অধ্যায়ে বারাণসীমাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হলেও[৮২], এই অধ্যায়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পাওয়া যায় না। *কূর্ম, মৎস্য* ও *লিঙ্গপুরাণে* বারাণসী-মাহাত্ম্য বিষয়ে বর্ণিত আলোচনা তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। ফলে কাশী বা বারাণসী প্রসঙ্গে পুরাণসাহিত্যে আলোচিত তীর্থমাহাত্ম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪.১.৫. বিশ্বেশ্বর মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান :

কাশীর ধর্মীয় প্রক্ষাপট আলোচনার মুখ্য উপাদানগুলির অন্যতম হল বিশ্বেশ্বর মন্দির। জ্যোতির্ময়ং লিঙ্গং জ্যোতির্লিঙ্গম্। ভারতীয় শৈবতীর্থগুলির অন্যতম হল বিশ্বেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। *শিবপুরাণে* বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের তালিকা দেওয়া হয়েছে। যথা- সৈরাষ্ট্রে সোমনাথ, দ্বারকায় নাগেশ, শীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল, সেতুবন্ধে রামেশ, নর্মদাতীরে (অমরেশ্বরে) ওঙ্কার, হিমালয়ে কেদার, শিবালয়ে ঘৃষ্ণেশ্বর, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, গোমতীতীরে ত্র্যম্বক ও বিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ।[৮৩] প্রতিটি ভারতবর্ষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শৈবতীর্থ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। চীনাপরিব্রাজক জুয়াং-সান ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ এসে বারাণসীতে শতহস্ত উচ্চ তাম্রনির্মিত বিশ্বেশ্বরশিবলিঙ্গ দর্শন করেছিলেন।[৮৪] বর্তমানে সেই শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় শিবলিঙ্গ দেখা যায় না। পরবর্তী কোনও প্রাচীন গ্রন্থেও এই লিঙ্গের কোনো উল্লেখ নেই। বোধ হয় শাহাবুদ্দীন ঘোরি যে সময় বারাণসী লুণ্ঠন করেন, সেই সময় পবিত্র তাম্রলিঙ্গটি বিধ্বস্ত হয়ে থাকবে। বর্তমানে যে শিব লিঙ্গটি আমরা দেখি, তা

দশাশ্বমেধং লোলার্কঃ কেশবো বিন্দুমাধবঃ।।

পঞ্চমী তু মহাশ্রেষ্ঠা প্রোচ্যতে মণিকর্ণিকা।

এভিস্তু তীর্থবর্য্যৈশ্চি বর্ণ্যতে হ্যবিমুক্তকম্।। মৎস্য., ১৮৫.৬৫-৬৬

[৮২] লিঙ্গপু., পূর্বভাগ, ৯২তম অধ্যায়

[৮৩] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৭

[৮৪] La Vie de Hiouen Thsang par Stanislas Julien, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৭৫

পরবর্তীকালে হিন্দুরাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।[৮৫] কাশী বিশ্বেশ্বর মন্দিরটিও নানা ইতিহাসের সাক্ষী। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা মানসিংহ প্রথম এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এরপর মুঘলদের সময় মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রাণি অহল্যাবাই হোলকার কর্তৃক বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত।[৮৬] এরূপ নানা চড়াই উৎরায়ের সাক্ষী বিশ্বেশ্বর মন্দিরটি।

বর্তমানে বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে যে অরঙ্গজিবের মস্‌জিদ্ দৃষ্ট হয়ে, বহুপূর্বে সেই স্থানে বিশ্বেশ্বরের সুবৃহৎ এক মন্দির ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিদ্বেষী অরঙ্গজিব সেই মন্দির নষ্ট করে মস্‌জিদ্ নির্মান করেছিলেন। বলা হয় পরবর্তীতে সেই মন্দিরই বর্তমানে মস্‌জিদ্‌রূপে পরিণত হয়েছে। মুসলিমরা তার সামান্যতম পরিবর্তন করেছেন। মস্‌জিদের পশ্চিমভাগে এখনও হিন্দুদেবগৃহের যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। লক্ষণীয় এই মস্‌জিদের নিম্নতলে বৌদ্ধগঠনের বিহারগৃহ দৃষ্ট হয়। অনুমান করা হয়, হিন্দুশক্তি প্রবল হলে বৌদ্ধকীর্তি বিলুপ্তির জন্যে প্রাচীন বিহারের উপরেই দেবালয় নির্মাণ করা হয়েছিল।[৮৭] আবার অনেকের মতে, অরঙ্গজিব-মসজিদের অনতিদূরে যে আদিবিশ্বেশ্বরের মন্দির রয়েছে, পূর্বে সেখানেই বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্বেশ্বরমন্দিরের পাশে মস্‌জিদ্ নির্মিত হওয়ায় হয়তো বিশ্বেশ্বরলিঙ্গটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

মন্দিরের অনতিদূরে 'জ্ঞানবাপী' নামে এক পবিত্র কূপ রয়েছে। *শিবপুরাণে* এই কূপ 'বাপীজল' নামে বর্ণিত।[৮৮] এই বাপী নিয়ে প্রবাদ রয়েছে যে, যখন কালাপাহাড় কাশীস্থিত দেবমন্দির সকল ধ্বংস করতে আসে, তখন বিশ্বেশ্বর এই জ্ঞানবাপীর মধ্যে লুকিয়েছিলেন। ফলে বর্তমানেও বহু

---

[৮৫] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৭৬

[৮৬] মুক্তিলাভের অবিমুক্তকক্ষেত্র, কৌশিক সরকার, *কাশীবৃত্তান্ত পুরাণকাল থেকে সমকাল,* পৃ. ৪০-৫১

[৮৭] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৭৬

[৮৮] অবিমুক্তেশ্বরং দেবং সংসারোদ্ভবমোচনম্।

বাপীজলন্তু যত্রস্থং দেবদেবস্য সন্নিধৌ।।

স্পর্শনাদ্দর্শনাত্ তস্য কৃতার্থা মানবা ভূবি।

দুর্লভন্তু কলৌ দিব্যৈস্তজ্জলং হ্যমৃতোপমম্।।

তারণং সর্ব্বজন্তনাং নানাপাপস্য নাশনম্। শিবপু., সনত্‌কুমারসংহিতা, ৪১.২৬-২৮, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৪, পৃ.৭৭

তীর্থযাত্রী এখানে পূজা করতে আসেন। কাশীতে প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির অন্যতম হল বিশ্বেশ্বরমন্দির সংলগ্ন দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির, দণ্ডপাণির মন্দির, রত্নেশ্বর মন্দির, নবগ্রহের মন্দির, বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি।

৪.১.৬. কাশী ও গঙ্গা নদী :

কোনও স্থানে সভ্যতার অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপাদান হল- কৃষি, পশুপালন ও বানিজ্য। এই ত্রিবিধ উপাদানের অনুকূল পরিবেশ গঙ্গা নদীর তীরবর্তী স্থানে বিদ্যমান। বর্তমানে গঙ্গা নদীকে ঘিরে অসংখ্য তীর্থস্থান দেখা যায়। কিন্তু এই স্থানগুলির প্রসিদ্ধির অন্তরালে রয়েছে বহুবিধ কারণ, যার অন্যতম কারণ স্বরূপ আর্থ-সামাজিক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণা অনুযায়ী, ভারতবর্ষে ৪৩% জনসংখ্যা গঙ্গা নদীর জলের উপর তাদের জীবন নির্বাহ করে থাকে এবং ৫৭% চাষবাস (agricultural land) গঙ্গানদীর উপরেই নির্ভরশীল।[৮৯] গঙ্গা নদীর অন্যতম তীর্থস্থানগুলি হল- গঙ্গোত্রী, হরিদ্বার, এলাহাবাদ (প্রয়াগ), বারাণসী ও গঙ্গাসাগর। তার মধ্যে প্রথম চারটি স্থান পর্যটনস্থান হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গঙ্গা জলের পবিত্রতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু কেন এই জল এত পবিত্র? সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে, গঙ্গা জলের ORP level negative (Oxidation-reduction Potential). ORP value বেশি বা কমের উপর ভিত্তি করে জলে অক্সিজেনের পরিমানের তারতম্য হয়ে থাকে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে সুবৃহৎ গঙ্গা নদীর জলে সর্বত্রই কি ORP level negative? উত্তর হল না। কেবলমাত্র গঙ্গোত্রী-গোমুখ অঞ্চলের জলে ORP level negative। এই জল অকাল বার্ধক্য রোধে সক্ষম। জলে কখন ORP level negative হয়? গবেষণা অনুযায়ী, বহুবছর ধরে নদীর প্রবাহ হলে এমন হয়ে থাকে।[৯০] বর্তমানে তীর্থযাত্রীরা সাধারণতঃ বাসে করে গঙ্গোত্রী যাত্রা (যা ১০৩০০ফিট উঁচুতে আবস্থিত) করে থাকেন এবং হিমশীতল জলে অবগাহন করেন। কিন্তু বহু সাধু এই স্থানে পায়ে হেঁটে আসেন এবং আরো ১৭ কি.মি. হেঁটে

[৮৯] web: gangotri Documentary DD National

[৯০] web: gangotri Documentary DD National

গোমুখের হিমগুহার কাছে যান। চিন্তার বিষয় হল, বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে প্রতিনিয়ত এই হিমপ্রবাহ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।[৯১]

গঙ্গোত্রী থেকে অনুমানিক ২২৫ কি.মি. নীচে হরিদ্বার। এখানে গঙ্গা কিছুটা সমভূমিতে বহমান হলেও নদীর বেগ অত্যন্ত তীব্র। এখানকার জমি উর্বর। তীর্থযাত্রীরা হরিদ্বারের গঙ্গায় শিশুদের মুণ্ডন করান ও সেই কেশগুচ্ছ গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে থাকেন। তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস মুণ্ডন করালে শিশুর পূর্বজন্মকৃত পাপ থেকে মুক্তি ঘটে। হরিদ্বারে ছোট ছোট পাত্রে গঙ্গাজল বিক্রি করা হয়, মানুষের বিশ্বাস দৈবীশক্তিবশতঃ এই জল প্রত্যহ স্নানের সময় কিছু ব্যবহার করলে রোগ ও পাপ থেকে মুক্তি ঘটে থাকে।[৯২] হরিদ্বার পরবর্তী গঙ্গার যে বিস্তৃতক্ষেত্র দেখা যায়, তা খুব সমৃদ্ধ ও ঘন বসতিপূর্ণ। এই অঞ্চলের একটি বড় শহর হল কানপুর, যা চর্মশিল্পের জন্য বিখ্যাত। সেখানকার একটি বড় সমস্যা হল ঘন জনবসতি ও দূষণ। স্বাস্থ্যবিভাগের পরিসংখ্যানুসারে দেখা গিয়েছে, কানপুরের মানুষেরা বেশীরভাগ কলেরা ও ডাইরিয়ার সমস্যায় ভোগেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সন্তান প্রজননের সমস্যাও দেখা যাচ্ছে। যার কারণানুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে গঙ্গার জল থেকেই এইধরণের সমস্যার সূত্রপাত। বিভিন্ন চর্মকারখানার নর্দমার জল গঙ্গার এসে প্রতিনিয়ত মিশছে। যা নদী ও সেখানকার সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।[৯৩]

ব্রাহ্মণ্য তীর্থস্থানের অন্যতম কেন্দ্র হল এলাহাবাদের প্রয়াগ। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও পৌরাণিক সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল হিসেবে ধরা হয়। এই স্থানের বিখ্যাত উৎসব হল কুম্ভমেলা, যা ৪৫দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন দেশের নানা প্রান্ত থেকে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম ঘটে। ফলে উৎসব চলাকালীন স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়াগ অঞ্চল ভীষণ দূষিত হয়ে যায়। জনশ্রুতি রয়েছে, দূষণের দিকে লক্ষ রেখে ২০০৭ সালে সাধুরা একবার প্রয়াগে

---

[৯১] *The Ganga: Life On The World's Most Polluted River | Rivers And Life*, Date: March 2023, Time: 9:00am.

[৯২] *The Ganga: Life On The World's Most Polluted River | Rivers And Life*, Date: March 2023, Time: 9:00am.

[৯৩] *The Ganga: Life On The World's Most Polluted River | Rivers And Life*, Date: March 2023, Time: 9:00am.

কুম্ভমেলা বয়কট করবার আর্জি জানিয়েছিলেন ও আত্মহত্যার হুমকিও দিয়েছিলেন।[৯৪] কিন্তু প্রয়াগ কী? কেন এই স্থানটি এত পবিত্র বলে ধরা হয়? এর উত্তর জানতে গেলে প্রথম জানা উচিত প্রয়াগ শব্দটির অর্থ হল দু'টি বা ততোধিক নদীর মিলন। অলকনন্দা নদীর গতিপথে পঞ্চপ্রয়াগের কথা জানা যায়। যথা- বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ ও দেবপ্রয়াগ।[৯৫] কিন্তু কূর্মপুরাণে চারটি অধ্যায় জুড়ে যে প্রয়াগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা হল বর্তমান উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদের কাছে অবস্থিত প্রয়াগরাজ। যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও অদৃশ্য সরস্বতী নদী মিলিত হয়েছে। প্রয়াগ নামটি কালের গতিতে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রয়াগ, ইলাহাবাদ, এলাহাবাদ, প্রয়াগরাজ এগুলি তার নামান্তর।[৯৬] প্রয়াগ শব্দটি শুনলে যে কথাটি মাথায় আসে তা হল, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমজাত তীর্থ। এই তীর্থের কথা প্রায় সকল পুরাণেই উল্লেখ রয়েছে। প্রয়াগকে সকল তীর্থের মধ্যে প্রধান বলা হয়েছে। এবিষয়ে প্রচলিত প্রবাদ হল, 'প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মরগে পাপী যথা তথা' অর্থাৎ পাপী সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান করে যদি প্রয়াগতীর্থে মস্তক মুণ্ডন করতে পারে, তাহলে তার আর পাপের ভীতি থাকে না।

কূর্মপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কাহিনীটি এরূপ- রাজা যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে একত্র হয়ে কৌরবদের বিনাশ সাধন করে শোকাকূল হয়েছিলেন। এইসময় তাঁর রাজ্যে মার্কণ্ডেয় মুনি এসে উপস্থিত হন। মুনির আগমনের খবর পেয়ে যুধিষ্ঠির মুনিকে সিংহাসনে বসিয়ে পাদপ্রক্ষালন ও অর্চনা করে সন্তুষ্ট করেন। মুনি যুধিষ্ঠিরের মনের কথা জেনে, তাঁরা শোক নিবারণের জন্যে প্রয়াগক্ষেত্রে গমনের উপদেশ দেন। মার্কণ্ডেয় মুনি বলেন, প্রয়াগ হল ত্রিজগতের মধ্যে প্রজাপতি ক্ষেত্র বলে প্রসিদ্ধ।[৯৭] প্রয়াগে স্নান করলে ফলস্বরূপ স্বর্গ গমন হয়ে থাকে ও এখানে প্রাণত্যাগ করলে জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে।[৯৮] প্রয়াগে পাঁচটি কুণ্ড আছে। মানুষের ধারণা এই কুণ্ডগুলিতে জাহ্নবী গঙ্গা

---

[৯৪] *The Ganga: Life On The World's Most Polluted River | Rivers And Life*, Date: March 2023, Time: 9:00am.

[৯৫] *Rag Rag Mein Ganga* | EP #11 Prayagraj

[৯৬] *Rag Rag Mein Ganga* | EP #11 Prayagraj

[৯৭] এতত্ প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।। কূর্মপু., ৩৫.২০

[৯৮] অত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তে'পুনর্ভবাঃ।। কূর্মপু., ৩৫.২০

অবস্থিত।[৯৯] কেন সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হিসেবে প্রয়াগের কথা বলা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- গঙ্গা নদী সর্বত্র সুলভা হলেও গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরে অতিশয় দুর্লভ।[১০০] অর্থাৎ কৃচ্ছসাধন করে যদি তীর্থযাত্রা করা হয় তবে তা অত্যন্ত পুণ্যের। এই প্রসঙ্গে যুগের প্রেক্ষিতে গঙ্গা নদী বিষয়ে একটি উক্তি ভীষণ প্রসিদ্ধ। বলা হয় সত্যযুগে নৈমিষারণ্য, ত্রেতাযুগে পুষ্করতীর্থ, দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্র ও কলিযুগে গঙ্গা হল সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ।[১০১] এইভাবে *কূর্মপুরাণের* চারটি অধ্যায় জুড়ে প্রয়াগ তথা গঙ্গা মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।[১০২] *মৎস্যপুরাণে* দশটি অধ্যায় জুড়ে প্রয়াগমাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে।[১০৩] এখানেও যুধিষ্ঠির ও মার্কণ্ডেয় সংবাদ দিয়ে প্রয়াগমাহাত্ম্য আরম্ভ হয়েছে। উল্লেখ্যবিষয় হল, প্রয়াগযাত্রা। প্রয়াগযাত্রা প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয়মুনি কর্তৃক দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের কথা বলেছেন। যানারোহণ ব্যতীত যাত্রার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বলীবর্দাদি পশুতে আরোহণ করে যাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১০৪] শুধু গঙ্গা নয় এখানে যমুনা নদীর মাহাত্ম্যের কথাও কীর্তিত হয়েছে।[১০৫] সূর্যতনয়া হিসেবে যমুনাকে কল্পনা করা হয়েছে।

---

[৯৯] পঞ্চ কুণ্ডানি রাজেন্দ্র যেষাং মধ্যে তু জাহ্নবী।। কূর্মপু., ৩৫.২৮

[১০০] সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।

গঙ্গাদ্বারে প্রযাগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।। কূর্মপু., ৩৬,৩২

[১০১] কৃতে তু নৈমিষং তীর্থং ত্রেতাযাং পুষ্করং বরম্।

দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গা বিশিষ্যতে।। কূর্মপু., ৩৬,৩৫

[১০২] কূর্মপু., ৩৫-৩৮ অধ্যায়

[১০৩] মৎস্য., ১০৩-১১২তম অধ্যায়

[১০৪] প্রযাগতীর্থযাত্রার্থী যঃ প্রযাতি নরঃ ক্বচিত্।

বলীবর্দ্দসমারূঢঃ শৃণূ তস্যাপি যত্ ফলম্।।

ঐশ্বর্য্য-লোভ-মোহদ্বা গচ্ছেদ্যানেন যো নরঃ।

নিষ্ফলং তস্য তত্ সর্ব্বং তস্মাদ্যানং বিবর্জ্জযেত্।। মৎস্য., ১০৬তম অধ্যায়, ৪-৭

[১০৫] তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।

সমাখ্যাতা হহাভাগা যমুনা তত্র নিমগ্না।। মৎস্য., ১০৮তম অধ্যায়, ২৩

ঋগ্বেদের যম-যমী সংবাদের যম-ভগিনী যমীর সঙ্গে পৌরাণিক যমুনা একাত্মীভূতা হয়েছেন। *ঋগ্বেদে* যমুনা নদীও গঙ্গা নদীর মতই অপ্রধান নদী ছিল। কিন্তু গঙ্গার মত পুরাণে যমুনাকে নিয়ে তেমন কোনও কাহিনী গড়ে ওঠে নি। কিন্তু ভারতীয়দের যে সাতটি পবিত্র নদী আছে তার মধ্যে যমুনা নদী অন্যতম। গঙ্গার মত যমুনারও মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু কোন সময়ে এই মূর্তির কল্পনা হয়েছে, তা বলা মুসকিল। যমুনার বাহন কচ্ছপ। বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের রূপান্তর যদি গঙ্গার বাহন মকর কল্পনা করা হয়, তবে বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম যমুনার বাহনত্বে পরিণত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। অবশ্য যমুনার জলে প্রচুর কচ্ছপের বাস থাকায় হয়তো যমুনার বাহন হিসেবে কচ্ছপকে কল্পনা করা হয়েছে।[১০৬] এরপর নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যুধিষ্ঠির-মার্কণ্ডেয় সংবাদ এগিয়েছে। মাহাত্ম্য বর্ণনার শেষপর্বে তীর্থের ফলপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। প্রচুর উপকরণসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ অনুষ্ঠান হল যজ্ঞ। দরিদ্র মানুষের কথা মনে করে পুরাণকারেরা সেই যজ্ঞের অদৃষ্টফলকে অনায়াসে জুড়ে দিচ্ছেন তীর্থের সাথে।[১০৭] যা তৎকালীন সমাজের সমস্ত জাতি-বর্ণ-ধর্মের সাম্যের বার্তার দ্যোতক। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই পুরাণ দুটিতে প্রয়াগমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে গঙ্গা ও যমুনা নদীর কথা বলা হলেও, সরস্বতী নদী প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ নেই। তাহলে কি গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিবেণীসঙ্গম পরবর্তী কালের কল্পনা?

এলাহাবাদ থেকে ১২৫ কি.মি. নীচে গঙ্গা নদী বারাণসীতে এসে পৌছায়। বারাণসীকে তেত্রিশকোটি দেবতার নিবাসস্থল হিসেবে কল্পনা করা হয়। গঙ্গার গতিপথে একমাত্র বারাণসীতে গঙ্গা উত্তরে প্রবাহিত। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস বারাণসীতে শেষকৃত্য করলে সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ জীবনের শেষদিন কাটাতে বারাণসী এসে থাকেন। বারাণসীতে কুশঘাস দিয়ে মুখাগ্নি করবার রীতি আছে। কিন্তু গর্ভবতী মহিলা ও

---

[১০৬] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, খণ্ড- ৩, পৃ.১২৪-১২৫

[১০৭] ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা দেবৈশ্চাপি যথাক্রমম্।

ন হি শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহীপতে।।

বহূপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ।।

তীর্থানুগমনং পুণ্যং যজ্ঞেভ্যো'পি বিশিষ্যতে।। মৎস্য., ১১২তম অধ্যায়, ১২-১৭

শিশুদের দাহ এখানে করবার রীতি না থাকায়, তাদের শব জলে ভাসানো হয়ে থাকে। ঘন জনবসতি হবার দরুন বারাণসীতে দূষণের পরিমাণও বেশি। গঙ্গার গতিময়তায় বারাণসী হল সবথেকে মূল্যবান অঞ্চল, কারণ এইস্থানে মানুষের জীবন ও মরণের আধ্যাত্মিকচক্র গঙ্গা নদীর সাথে যুক্ত।[১০৮] বারাণসীর গঙ্গা নদীর কথা মাথায় এলেই গঙ্গা ঘাটের কথাও মাথায় আসে। প্রতিটি ঘাটকে ঘিরে নানান কাহিনী, নানান ধর্মীয় আচার, সাধারণ মানুষের জীবিকা ও নানান দেবালয়। কিন্তু এই ঘাটের প্রয়োজনীয়তা কেন? কেন ঘাট এত গুরুত্বপূর্ণ? এর সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে, নদীর পবিত্রতা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে এটি প্রয়োজন।[১০৯] ঘাট না থাকলে নদীর দূষণের পরিমানও বৃদ্ধি পেত। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে নদী তীরে জনসমাগমও বৃদ্ধি পায়, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নদী দূষিত হবার প্রবণতাও বাড়ে। তাই ঘাটের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ নদীর স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা বজায় রাখা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, প্রাচীনকাল থেকে গঙ্গা নদীর মাহাত্ম্য উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান। গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে অগণিত মানুষের জীবনধারণ চলছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে কোনও নদীর তীরে গঙ্গার মত এত তীর্থের সমাবেশ লক্ষ করা যায় না। যেখানে গঙ্গানদী সাগরে এসে মিলিত হয়েছে সেই স্থানের নাম গঙ্গাসাগরসঙ্গম। প্রাচীনকাল থেকে এই সঙ্গম ভারতীয়দের পবিত্র তীর্থস্থান বলে প্রসিদ্ধ। তার প্রমাণ *মহাভারতের* (৩.৮৫) ও *হরিবংশের* (১৬৮তম অধ্যায়) মেলে।[১১০] কিন্তু প্রাচীনভারতে এই সাগরসঙ্গম কোথায় ছিল তা নিয়ে গবেষকদের কৌতূহলের সীমা নেই। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, একসময় সাগরের স্রোত রাজমহল পর্যন্ত প্রবাহিত হত। ফলে এখনকার প্রায় দেড়শত ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাসাগর ছিল। ভূতত্ত্বপণ্ডিতদের অনুমান সেসময় ২৪পরগণা, নদীয়া, বর্ধমান, যশোর প্রভৃতি জেলাগুলি নদী গর্ভে বিলীন ছিল।[১১১] বৈয়াসিক *মহাভারতের* তীর্থযাত্রা পর্বোধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, গঙ্গা ও কোশিনদীর সঙ্গমস্থল কৌশিকীতীর্থে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণ প্রসঙ্গেই

---

[১০৮] *The Ganga: Life On The World's Most Polluted River | Rivers And Life*, Date: March 2023, Time: 9:00am.

[১০৯] *Rag Rag Mein Ganga* | EP #03 | Rudraprayag, Date:February 2021, Time: 7:00am.

[১১০] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৫২

[১১১] তত্রৈব

পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গমের উল্লেখ রয়েছে।[১১২] কালিদাস প্রণীত *রঘুবংশে* রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় বলা রয়েছে, তৎকালে বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল এবং নদীর মধ্যে বড় বড় দ্বীপ ছিল।[১১৩] মনে করা হয়, সপ্তম শতাব্দীতে সুযান্-জাঙ্ কামরূপের প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণে সমতট নামক স্থানে এসেছিলেন এবং তাঁর বর্ণনানুসারে এই স্থানটি বর্তমান ঢাকা জেলার উত্তরাংশ বলেই মনে হয়। তাঁর বর্ণনায় সমতট সাগরতীরে অবস্থিত ছিল।[১১৪] *রাজতরঙ্গিনীর* পঞ্চম তরঙ্গে বলা রয়েছে ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আগমন করেন তখন গৌড়ের পরেই পূর্ব সমুদ্র প্রবাহিত ছিল।[১১৫]

গঙ্গার গতি পরিবর্তনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল, ২৪পরগণা জেলার কালীঘাটে অবস্থিত আদিগঙ্গা। বর্তমানে কালীঘাটে ক্ষুদ্রাকার আদিগঙ্গা প্রবাহিত। জনশ্রুতি রয়েছে একসময় এই জায়গায় প্রভূতসলিলা বিস্তীর্ণা ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। সাগরের সাথে এই গঙ্গার যোগও ছিল। বড় বড় নৌকা এই নদী পথে যাতায়াতও করত। কবি কৃষ্ণরামের *রায়মঙ্গলের* কবিতা পাঠে তা জানা যায় (*রায়মঙ্গল,* ৪৯)।[১১৬] বর্তমানে কালীঘাট মন্দিরের কাছে আদিগঙ্গা খালে পরিণত হলেও স্থানীয় বাসীন্দারা নিজেদের গঙ্গাতীরবাসী বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। আদিগঙ্গার এরকম পরিবর্তন দেখে বঙ্গের প্রসিদ্ধ স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর *প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে* বলেছেন, যেখানে গঙ্গার প্রবাহ নেই সেখানে গঙ্গা অন্তঃসলিলা এইরূপ স্বীকার করলে কোনো দোষ হয় না, না হলে বর্তমান সময়ে গঙ্গার সাগরগমন অসিদ্ধ হয়ে পড়ে।[১১৭]

---

[১১২] মহা., বনপর্ব, ১১৩ অধ্যায়, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৫২

[১১৩] বঙ্গানুত্খায তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।

নিচখান জয়স্তম্ভান্গঙ্গাস্রোতোন্তরেষু সঃ।। রঘু., ৪.৩৫-৩৬

[১১৪] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৫২

[১১৫] তত্রৈব

[১১৬] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৫৩

[১১৭] প্রবাহমধ্যে বিচ্ছেদেতু অন্তঃসলিলবাহিত্বান্ন দোষঃ। অন্যথা ইদানীং গঙ্গাযাং সাগরগামিত্বানুপপত্তেঃ। রঘুনন্দন, *প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব,* উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৫ পৃ. ১৫৩

৪.২. গয়া

৪.২.১. গয়ার ভৌগোলিক অবস্থান :

বর্তমানে গয়া জেলাটি বিহার রাজ্যের অন্তর্গত। গয়ার উত্তরসীমায় পাটনাজেলা, পূর্বে মুঙ্গের, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে লোহারডাগা ও হাজারিবাঘ, পশ্চিমে শোণনদী সাহাবাদ থেকে গয়া জেলাকে পৃথক করেছে। গয়া জেলার দক্ষিণাংশে যে গিরিমালা রয়েছে তা বিন্ধ্যগিরির অংশ বলেই অনেকের মত। এই জেলার নানা স্থানে ছোট ছোট পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে মাহের পাহাড় সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম, তা সমুদ্র থেকে প্রায় ১৬২০ ফিট্ উঁচু। এছাড়া বরাবর ও রাজগৃহ নামে বিখ্যাত পাহাড় রয়েছে। এই জেলাতে শোণ ও ফল্গুনদী প্রধান হলেও, এই অঞ্চলে আরও বেশ কিছু নদী হল- কুশী, দোঙ্গা ধারহার, তিলিয়া, শোব, ধনর্জি এবং শকরি নদী। শোণ নদী ও গঙ্গা সংলগ্ন খালের জলেই প্রধানতঃ এই অঞ্চলের কৃষিকার্য হয়। এই জেলার পূর্বাংশে অধিক চাষবাস হয়ে থাকে। অনুর্বরতার কারণে উত্তর ও পশ্চিমাংশে তেমন চাষবাস লক্ষ করা যায় না। এই অঞ্চলের পাহাড়ে ও জঙ্গলে গুটি, মৌচাক, নানাপ্রকার গঁদ প্রভৃতির আধিক্য লক্ষ করা যায়। গয়াজেলার প্রধান নগরটি ফল্গুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এইখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম পবিত্রস্থান গদাধরের পাদপদ্ম বিরাজিত। কিন্তু এককালে গয়া বৌদ্ধ তীর্থ বলে বিশেষ পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক কানিংহাম, বেগলার সাহেব ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সকলেই একথা স্বীকার করেছেন। পৌরাণিক যুগ থেকে গয়া ব্রাহ্মণ্যতীর্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১১৮]

প্রাচীন ভারতে গয়াজেলা মগধ রাজ্যের অধীন ছিল। নন্দলাল দে মহাশয়ের গ্রন্থে রামশিলা পর্বতের উত্তরে এবং ব্রহ্মযোনি পর্বতের দক্ষিণে গয়া অবস্থিত।[১১৯] বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়কালে এই স্থানে স্থিত বুদ্ধগয়া সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে

[১১৮] বলরাম মণ্ডল, *পৌরাণিক তীর্থ পরিক্রমা*, পৃ.৪১

[১১৯] Nando Lal Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*, p.64

পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজা ও পরবর্তীতে কনৌজের হিন্দুরাজগণের অধিকার ছিল। আরও পরবর্তীতে অঞ্চলটি মুসলমান অধিকার ভুক্ত হয়ে থাকে। দিল্লীর মোঘলবাদশাদের গৌরব অস্তমিত হতে শুরু করলে, তৎকালীন মহারাষ্ট্রের রাজশক্তি গয়া লুট করতে এসে, সময়ে সময়ে এই স্থান আক্রমণ করে থাকেন। কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারে নি।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হল্টর সাহেবের মতে, এই গয়াক্ষেত্র প্রথম অবস্থাতে ব্রাহ্মণ্যতীর্থ বলে গণ্য করা হত না। প্রথমে এটি প্রধান বৌদ্ধতীর্থ বলে প্রসিদ্ধ ছিল।[১২০] বৌদ্ধদিগের অধঃপতন হলে হিন্দুগণ বৌদ্ধকীর্তির উপরে নিজের বর্তমান গয়াধাম স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁদের উক্ত মতটি সমীচীন বলে মনে হয় না। কারণ বৌদ্ধপ্রাধান্যের এমনকি ভগবান বুদ্ধের জন্মের আগে থেকেই গয়া হিন্দুজাতির একটি প্রধান প্রাচীন তীর্থস্থান এবং পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদানের একমাত্র পুণ্যস্থান বলে প্রসিদ্ধ ছিল। বাল্মীকিকৃত *রামায়ণে* উল্লেখ রয়েছে, গয়াপ্রদেশে গয় নামে কোনো এক ধীমান্ ও যশস্বী যজমান পিতৃলোকের প্রতি উদ্দেশ্য করে এই শ্রুতি গান করেছিলেন, 'সন্তান পুৎ নামক নরক থেকে পিতাকে ত্রাণ করে ও সর্বতো ভাবে পিতাকে রক্ষা করে বলেই পুত্র নামে অভিহিত'। লোকে এইজন্যই নানাবিদ্যায় পারদর্শী গুণবান্ বহুপুত্র কামনা করে। কারণ একাধিক পুত্র থাকলে অন্ততঃ একজন পুত্র গয়ায় গমন করবে।[১২১] এরূপ বৈয়াসিক *মহাভারতের বনপর্বে* (৮৪তম, ৮৭তম, ৯৫তম অধ্যায়ে),

---

[১২০] Sir W.W. Hunter's Imperial Gazetteer of India, (2nd Ed.) vol. V. p.47; Sir Alex. Cunninggham's Archaeological Survey Reports, vol. I. III.; Raja R. Mitra's Buddha Gaya, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৫, পৃ.২৪৬

[১২১] শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।

গয়েন যজমানেন গয়েস্বেব পিতৃন্ প্রতি।।

পুন্নামো নরকাদ্ যস্মাত্ পিতরং ত্রাযতে সুতঃ।

তস্মাত্ পুত্র ইতি প্রোক্তং পিতৃন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ।।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।

তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিত্ গযাং ব্রজেত্।। রাম., অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭.১১-১৩, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৫, পৃ.২৪৬

অনুশাসনপর্বে (২৫তম অধ্যায়ে) গয়াতীর্থের উল্লেখ রয়েছে।[১২২] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকৃত *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে* গয়া বিষয়ে বলা রয়েছে, গয়াতে শ্রাদ্ধকাল যা প্রদত্ত হয়, তাই অনন্তফলজনক।[১২৩]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গয়া নানা রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে, সম্রাট অশোক একসময় চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হয়ে, গয়ার ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে একটি সুবৃহৎ স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। যে স্তুপকে দর্শনের জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে বহু জনসমাগম শুরু হয়। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে গয়াতে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কারণে বৌদ্ধপ্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।[১২৪] কিন্তু খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনাপরিব্রাজক ফা-সিযান্ গয়াতে এসে বৌদ্ধকীর্তির নিদর্শন হিসাবে মঠের ভগ্নদশা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসযোগ্য তিনটি বৌদ্ধ মঠ দেখেছিলেন।[১২৫] বৌদ্ধ ইতিহাসের প্রামাণিক গ্রন্থ *ললিতবিস্তরে* রাজা শাক্যসিংহ সংসারধর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনায় রাজগৃহ ত্যাগ করে গয়াধামের অন্তর্গত গয়শীর্ষ পর্বতে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উরুবিল্ব ও মহাবোধি মন্দিরের যে উল্লেখ রয়েছে, তা ফা-সিযান্-এর ভ্রমণবৃত্তান্তেও মেলে। যা বর্তমানে বুদ্ধ গয়াতে অবস্থিত। গয়া থেকে বুদ্ধগয়ার দূরত্ব ১২ কিলোমিটার। ফা-হিয়েন যখন গয়াতে এসেছিলেন তখন মহাবোধি মন্দিরটি জীর্ণ অবস্থায় ছিল। পরবর্তী সময়ে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মরাজ থদোমেঙ্গ মন্দিরটি সংস্কার সাধন করেছিলেন। যে বোধিবৃক্ষের মূলে ভগবান বুদ্ধ বোধি লাভ করেছিলেন, সেই বৃক্ষ বহুবার নানান শত্রুরাজার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। গৌড়রাজ শশাঙ্ক একসময় এই বৃক্ষটিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছিলেন, এরূপ ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি রয়েছে। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে সুযান্-জাঙ্ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে গয়াতে এসে বৌদ্ধ প্রাধান্য লক্ষ করেছিলেন।

---

[১২২] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৫, পৃ.২৪৬

[১২৩] যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে। যাজ্ঞ., ১.২৬১

[124] বলরাম মণ্ডল, *পূর্বোক্ত,* পৃ.৪১

[১২৫] "Where Buddha attained to Buddhaship, there are three monasteries, each with resident priests who receive offerings in abundance from the populace, without the least stint." *Travels of Fa-hien,* trans- by H.A. Giles, Routledge and Kegan Paul, Londan, 1923, উদ্ধৃত, তত্রৈব

খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দী থেকে গয়া হিন্দুতীর্থ হিসেবে অধিক পরিচিতি লাভ করে। মহাবোধি মন্দিরটি বহু অংশ বহুকাল বালীতে ঢাকা ছিল। বেগলার সাহেব ১৮৮০-১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটির সংস্কার সাধনে নিযুক্ত হন। গয়ার কাছেই ফল্গু নদী, যার প্রাচীন নাম নিরঞ্জন এবং উরুবিল্বের যে নাম পাওয়া যায়, তার বর্তমান নাম বোধগয়া। অর্থাৎ ইতিহাসের নিরিখে গয়া ও বোধগয়া স্থান দু'টির ক্রমবিকাশ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এবিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

৪.২.২. গয়া নামকরণ :

গয়ার পর্যায় হল পিতৃতীর্থ। এখানে এসে হিন্দুদের পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের বিধি রয়েছে। এই স্থানের পর্যায় হিসেবে *বায়ুপুরাণে* অন্তিম অধ্যায়ে গয়াগয়, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া ও গয়াসুর এই ষড়গয়া মুক্তিদায়িকা এরূপ উল্লেখ রয়েছে।[১২৬] এই ছয়টি নামের মধ্যে বর্তমানে গয়া শব্দটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কামদেশের রাজগুরু ভিক্ষু পণ্ডিত শ্রীধর্মরক্ষিত যখন গয়াতে আসেন, তখন বুদ্ধসেন পীঠী প্রদেশের অধিপতি ছিলেন।[১২৭] পীঠী প্রদেশ হল গয়া জেলার প্রাচীন নাম।

গয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। বৈয়াসিক *মহাভারতের* বনপর্বের ৯৫তম অধ্যায়ে গয়া সম্বন্ধে বলা আছে, অমুর্ত্তরয়ার পুত্র রাজর্ষি গয় এখানে প্রচুরান্ন ও ভুরিদক্ষিণা দিয়ে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন।[১২৮] সেই যজ্ঞে শত সহস্র অন্নাচল ও ঘৃতকুল্যা প্রস্তুত হয় এবং শত শত দধির নদী ও শত সহস্র উত্তমোত্তম ব্যঞ্জন-প্রবাহ প্রবাহিত হয়েছিল। রাজর্ষি গয় প্রতিদিন মহাসমারোহে অন্নদান করতেন। তাতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিও বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করতেন এবং দক্ষিণা প্রদান কালে গগনস্পর্শী বেদধ্বনি ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ কর্ণগোচর হত না, এরূপ উল্লেখ রয়েছে। এরূপ গয়রাজ প্রদত্ত হবি দ্বারা দেবগণ

---

[১২৬] গযাগযো গযাদিত্যা গাযত্রী চ গদাধরঃ।

গযা গযাসুরশ্চৈব ষড্গযা মুক্তিদাযিকাঃ।। বায়ুপু., ১১২,৬০

[১২৭] Epigraphia Indica, vol-IX, উদ্ধৃত, বলরাম মণ্ডল, *পূর্বোক্ত,* পৃ.৪৪

[১২৮] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৫, পৃ.২৪৬

এতখানিই পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, যে তাঁরা আর কারো দ্রব্যগ্রহণে ইচ্ছা করতেন না। রাজর্ষি গয় এরূপ যজ্ঞ করেছিলেন বলেই বোধ হয়, এই স্থানের নাম হয় গয়া।[১২৯] ফলে গয়া মহাপুণ্য স্থান হিসেবে পূর্বকালে বিখ্যাত হয়েছিল। পাণ্ডবেরাও এখানে তীর্থ করতে এসেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।[১৩০] *হরিবংশের* দশম অধ্যায়ে পাওয়া যায়, মনুর যজ্ঞে মিত্র ও বরুণের অংশে ইলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। পরবর্তীতে সেই কন্যাই পুরুষরূপে মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন। এই সুদ্যুম্নের তিনটি পুত্রের মধ্যে গয় নামে একটি পুত্র হয়। তিনি পরবর্তীকালে গয়াপুরীতে রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন।[১৩১]

গয়া নামকরণ বিষয়ক যে কাহিনীটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, তা *বায়ুপুরাণে* গয়ামাহাত্ম্যে উল্লিখিত রয়েছে। পূর্বকালে অসুরদের মধ্যে মহাবল-পরাক্রমশালী গয় নামে একজন বিষ্ণুভক্ত অসুর ছিলেন।[১৩২] তার দৈহিক গঠন ১২৫ যোজন উচ্চ ও ৬০ যোজন স্থূল ছিল।[১৩৩] দৈহিক আকৃতি ভয়ঙ্কর হলেও সেই অসুর ছিল সৎ চরিত্রের, অতিশয় ধার্মিক ও নম্রস্বভাব বিশিষ্ট। অহেতুক, কারোর কোনও অনিষ্ট করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। একসময় গয়াসুর গিরিবর কোলাহল নামক পর্বতে বহুসহস্র বৎসর নিঃশ্বাসরোধ করে কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করলে, তার

---

[১২৯] ততো মহীধরং জগ্মুর্ধর্ম্মজ্ঞেনাভিসংস্কৃতম্।

রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে।

নগো গযশিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী।। মহা., বনপর্ব, ৯৫/৯-১০

[১৩০] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৫, পৃ.২৪৬

[১৩১] প্রদ্যুম্নস্য তু দাযাদাস্ত্রযঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।

উৎকলশ্চ গযশ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত।।

দিক্‌পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গযাপুরী। হরি., ১০ম অধ্যায়

[১৩২] গযাসুরো'সুরাণাঞ্চ মহাবলপরাক্রমঃ। বায়ুপু., ১০৬.৪

[১৩৩] যোজনানাং সপাদঞ্চ শতং তন্মোচ্ছ্রযঃ স্মৃতঃ। বায়ুপু., ১০৬.৪

স্থূলঃ ষষ্টির্যোজনানাং শ্রেষ্ঠো'সৌ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ। বায়ুপু., ১০৬.৫

তপস্যা দেখে দেবতারা ভীত হয়েছিলেন।[১৩৪] দেবতারা সকলে মিলে পরামর্শ করে পিতামহের কাছে গিয়ে বলেন, গয় এভাবে তপস্যা করলে, সকল দেবতারা স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং পিতামহ যেন এই সমস্যার বিধান দেন। পিতামহের নির্দেশে দেবগণ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন। বিষ্ণুর সম্মুখে সভা করে স্থির হল, যত দ্রুত সম্ভব বর দিয়ে গয়কে তপস্যা থেকে বিরত করা হবে। এই পরামর্শ স্থির হবার পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই কোলাহল পর্বতে উপস্থিত হয়ে গয়াসুরকে বর প্রার্থনা করবার উপদেশ দেন।[১৩৫] পরোপকারী গয়াসুর রাজ্য, ঐশ্বর্যাদি প্রত্যাখ্যান করে বলে, আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হলে এই বিধান করুন যে, তার গাত্র যেন দেবতা, তীর্থশীলা, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, যোগী, জ্ঞাতি, কর্মী, ধর্মী প্রভৃতি সকল পদার্থের তুলনায় পবিত্রতম হয়ে ওঠে।[১৩৬] দেবগণ গয়াসুরের ধূর্ততা বুঝতে না পেরে, গয়াসুরের প্রার্থনা স্বীকার করে যথা স্থানে ফিরে যান। দেবগণের আশীর্বাদানুসারে গয়াসুরের শরীর পবিত্র হয়। গয়াসুর এরপর নগর ভ্রমণে বের হলে, তার পবিত্র শরীর দর্শন ও স্পর্শ মাত্রই সকল জীবজন্তু বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়। ধীরে ধীরে নগরও জনশূন্য হতে থাকে।[১৩৭] এরপর থেকে গয়াসুর যে গ্রাম বা নগরে যেত, সেখানকার প্রাণীগণ তাকে দর্শন মাত্রেই

---

[১৩৪] কোলাহলে গিরিবরে তপস্তেপে সুদারুণম্।। বায়ুপু., ১০৬.৫

বহুবর্ষসহস্রাণি নিরুচ্ছাসং স্থিরো'ভবত্। বায়ুপু., ১০৬.৬

[১৩৫] সন্তুষ্টাঃ স্বাগতাঃ সর্ব্বে রবত্ ব্রুহি গয়াসুর। বায়ুপু., ১০৬.১৫

[১৩৬] যদি তুষ্টাঃ স্থ মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুরহেশ্বরাঃ।

সর্ব্বদেবদ্বিজাতিভ্যো যজ্ঞ তীর্থশিলোচ্চযাত্।।

দেবেভ্যো'তিপবিত্রো'হমৃষিভ্যো'পি শিবাব্যযাত্।

মন্ত্রেভ্যো দেবদেবীভ্যো যোগিভ্যশ্চাপি সর্ব্বশঃ।।

ন্যসিভ্যশ্চাপি কর্ম্মিভ্যো ধর্ম্মিভ্যশ্চ তথা পুনঃ।

যতিভ্যো'তিপবিত্রেভ্যঃ পবিত্রঃ স্যাং সদা সুরাঃ।। বায়ুপু., ১০৬.১৬-১৮

[১৩৭] দৈত্যং দৃষ্ট্বা চ স্পৃষ্ট্বা চ সর্ব্বে হরিপুরং যযুঃ।। বায়ুপু., ১০৬.১৯

শূন্যং লোকত্রযং জাতং শূন্যা যমপুরী হ্যভূত্। বায়ুপু., ১০৬.২০

স্বর্গলোক প্রাপ্ত হতে থাকে। তখন দেবগণ অসুরের ধূর্ততা বুঝতে পারে। এমতাবস্থা দেখে যম ও দেবগণ পিতামহের কাছে উপস্থিত হয়ে পরিত্রাণের জন্য পথ নির্দেশের কথা জানতে চান।[১৩৮] একথা শোনা মাত্র ব্রহ্মা দেবগণকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হন এবং বিষ্ণুর পরামর্শে ব্রহ্মা গয়াসুরের শরীর যজ্ঞের জন্য চাইলেন।[১৩৯] সমস্ত দেবগণই সেই যজ্ঞে উপস্থিত হলেন এবং গয়াসুরের শরীরের উপরেই যজ্ঞ করা হল। ব্রহ্মার আদেশে যম ধর্মশিলা এনে গয়াসুরের উপরে স্থাপন করেন এবং গয়াসুরকে নিশ্চল করবার জন্য সকল দেবগণই গয়াসুরের উপরে উঠে দাঁড়ান।[১৪০] এসব করেও গয়াসুরকে নিশ্চল করা অসম্ভব হয়। পরে গদাধর বিষ্ণু এসে দাঁড়ালে গয়াসুর নিশ্চল হয়।[১৪১] গয়াসুর দেবতাদের উদ্দেশ্য বুঝে তাঁদের এরূপ ছলনার আশ্রয় নেবার কারণ জানতে চান। গয়াসুরের বিনয়বাক্য শুনে দেবগণ সন্তুষ্ট হয়ে গয়াসুরকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। গয়াসুর বলেন, যতকাল পর্যন্ত চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী থাকবে, তবৎকাল পর্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সমস্ত দেবগণ এই শিলায় অবস্থান করিবে এবং তার নামানুসারে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্ররূপে পরিচিত হবে।[১৪২] এই ক্ষেত্রের পাঁচক্রোশ গয়াক্ষেত্র ও একক্রোশ

---

[১৩৮] তদ্দর্শনাদ্ যযুঃ স্বর্গং শূন্যং লোকত্রযং হ্যভূত্। বায়ুপু., ১০৬.২৩

[১৩৯] পৃথিবীং যানি তীর্থানি দৃষ্টানি ভ্রমতা ময়া।

যজ্ঞার্থ ন তু তে তানি পবিত্রাণি শরীরতঃ।।

ত্বা দেহে পবিত্রত্বং প্রাপ্তং বিষ্ণুপ্রসাদতঃ।

অতঃ পবিত্রং দেহং ত্বং যজ্ঞার্থং দেহি মে'সুর।। বায়ুপু., ১০৬.২৮-২৯

[১৪০] দেবানূচে'থ রুদ্রাদীন্ শিলাযাং নিশ্চলাঃ কিলো।

তিষ্ঠন্তু দেবাঃ সকলাস্তথেত্যুক্ত্বা চ তে স্থিতাঃ।। বায়ুপু., ১০৬.৪৭

দেবাঃ পাদৈর্লক্ষযিত্বা তথাপি চলিতো'সুরঃ। বায়ুপু., ১০৬.৪৮

[১৪১] শিলাযাং নিশ্চলার্থং হি স্বযমাদিগদাধরঃ। বায়ুপু., ১০৬.৫৫

[১৪২] যাবত্ পৃথ্বী পর্ব্বতাশ্চ যাবচ্চন্দ্রর্কতারকাঃ।

তাবচ্ছিলাযাং তিষ্ঠন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।। বায়ুপু., ১০৬.৬৪

গয়াশিরঃ এবং এর মধ্যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান থেকে মানবগণের মঙ্গলবিধান করবে।[১৪৩] দেবগণ এরূপ বর প্রার্থনা স্বীকার করলেন এবং গয়াসুর সেখানে নিশ্চল হল। বর্তমানে এই উপাখ্যানটি বেশীরভাগ মানুষ জানেন এবং গয়ার পাণ্ডারা এই বিবরণটি গয়াতীর্থের উৎপত্তি হিসাবে কীর্তন করে থাকেন। শেষোক্ত গয়াসুরের উপাখ্যানটি অর্বাচীন বলে বোধ হয়। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে বৈয়াসিক *মহাভারতে* গয়াক্ষেত্রের মধ্যস্থ বহু তীর্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু গয়াসুরের মস্তকে বিষ্ণু সহ অন্যান্য দেবগণের পদস্থাপন বিষয়ে কোনো কথা বলা নেই। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বর্তমানের ন্যায় পুরাকালে বিষ্ণুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধি সেরূপ ছিল না। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনিতে বিষ্ণুপদের গুরুত্ব লক্ষণীয়। দশাবতার প্রসঙ্গে বিষ্ণুর বামনাবতারের কাহিনিটিতেও বিষ্ণুর ত্রিপাদের কথা সর্বজনবিদিত। লক্ষণীয় বিষয় হল, বর্তমান ভারতীয় সমাজে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কর্মারম্ভে বিষ্ণুপদের স্মরণ করা হয়ে থাকে।[১৪৪] মানবশরীরে মুখ্য অঙ্গ হল মুখমণ্ডল। কিন্তু কেন শরীরের অন্যান্য অঙ্গ থাকতে বিষ্ণুর পায়ের কথাই বলা হল? কারণ পদ শব্দটি সিদ্ধির সাথে সংযুক্ত।[১৪৫] বিষ্ণুর সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার ব্যাপ্তি। চরণ দ্বারা বিক্রমণ অর্থাৎ পাদবিহরণ যত অনায়াসে হয়ে থাকে, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ব্যবহারে সেরূপ ব্যাপ্তি অসম্ভব।[১৪৬] ফলে এই উপাখ্যানগুলিতে বারংবার বিষ্ণুপদের উল্লেখ দেখা যায়।

৪.২.৩. নির্বাচিত সংস্কৃত পুরাণের আলোকে গয়ামাহাত্ম্য বর্ণন :

প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম গয়ার পরিচিতি ঘটেছিল বৌদ্ধতীর্থ হিসেবে। প্রাচীন সংস্কৃতপুরাণগুলির অন্যতম *বায়ুপুরাণের* গয়ামাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধারাকে দ্যোতিত করে। *বায়ুপুরাণে* আটটি

---

[১৪৩] পঞ্চক্রোশং গযাক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গযাশিরঃ।

তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি প্রযচ্ছন্তু হিতং নৃণাম্।। বায়ুপু., ১০৬.৬৫

[১৪৪] তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরযঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ঋ., ১.২২.২০

[১৪৫] যথা- সম্পন্ন, সম্পাদন ইত্যাদি বাগ্‌ধারায় পদ্ ধাতুকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

[১৪৬] *Vamana Avatar* part-2 by Nrisingha PrasadBhaduri, date: 02.01.2023 youtube

অধ্যায়ে গয়ামাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে।[১৪৭] ১০৫তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথনে গয়া নামকরণ ও তার মাহাত্ম্যের কথা কীর্তন করা হয়েছে। গয়া নামকরণের কাহিনী বিষয়ে বলা হয়, এক সময় যজ্ঞের জন্য ব্রহ্মার আদেশে গয়াসুর এই স্থানে তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন গয়াসুরের মস্তকে শিলা স্থাপন করে সেই শিলার উপর যজ্ঞ করেছিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ শেষ করে ব্রাহ্মণাদিকে গৃহাদি প্রদান করেন।[১৪৮] শ্বেত বারাহ কল্পে গয়ও এই স্থানে একটি যজ্ঞ করেন। গয় নাম থেকেই এই ক্ষেত্রের নাম হয় গয়াক্ষেত্র।[১৪৯] এরপর গয়ায় বসবাসের কথা বলা হয়েছে। পক্ষত্রয়কাল, পঞ্চদশ দিন, সাত কিংবা তিন রাত্রি বাস করবার বিধি দেওয়া হয়েছে। তিনপক্ষ গয়া বাস করলে পুত্রের সপ্তকুল পূনাত্যা হয়ে থাকে, পঞ্চদশ, সাত বা তিন রাত্রি বাস করলে মহাকল্প কাল সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়।[১৫০] লক্ষণীয় বিষয় গয়াক্ষেত্রে বাসের ফল হল অদৃষ্টফল এবং অন্যান্য তীর্থের মত এই স্থানে স্থায়ী বসবাসের কথা বলা হচ্ছে না। কেবলমাত্র পিণ্ডদানাদিকার্য নির্বাহের কথা বলা হচ্ছে। সম্ভবতঃ জলের প্রতিকূলতার দিকে নজর রেখে এইরূপ বিধি করা হয়েছে। গয়াক্ষেত্রে পিত্রাদির সাথে নিজের পিণ্ডদানের বিধিও বলা হয়েছে।[১৫১] এই ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করলে মানুষের ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান,

---

[১৪৭] বায়ুপু., ১০৫-১১২ অধ্যায়

[১৪৮] গযাসুরস্তপস্তেপে ব্রহ্মণা ক্রতবেহর্থিতঃ।

প্রাপ্তস্য তস্য শিরসি শিলাং ধর্ম্মো হ্যধারযেত্।। বায়ুপু., ১০৫.৫

[১৪৯] শ্বেতকল্পে তু বারীহে গযো যাগমকারযত্।।

গযানাম্না গযা খ্যাত্যা ক্ষেত্রং ব্রহ্মাভিকাঙ্খিতম্। বায়ুপু., ১০৫.৭-৮

[১৫০] গযাং গত্বান্নদাতা যঃ পিতরস্তেন পুত্রিণঃ।

পক্ষত্রযনিবাসী চ পুনাত্যাসপ্তমং কূলম্।।

নো চেত্ পঞ্চদশাহং বা সপ্তরাত্রিং ত্রিরাত্রিকম্।

মহাকল্পকৃতং পাপং গযাং প্রাপ্য বিনশ্যতি।। বায়ুপু., ১০৫.১১-১২

[১৫১] মহাকল্পকৃতং পাপং গযাং প্রাপ্য বিনশ্যতি।

পিণ্ডং দদ্যাচ্চ পিত্রাদেরাত্মনো'পি তিলৈবিনা।। বায়ুপু., ১০৫.১২

চৌর্য ও গুরুস্ত্রীগমন এই ধরনের সঙ্গজনিত সকল পাপ বিনষ্ট হয়ে থাকে।[১৫২] এছাড়া পুত্র পৌত্রাদি কিংবা অন্য যে কেউ যখন তখন যার নামে পিণ্ডদান করে, সে অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করে থাকে, এরূপ বিধানও দেওয়া আছে।[১৫৩] এরকম নানা ধরনের অদৃষ্টফলের কথা বলে গয়াক্ষেত্রের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে। সেবিষয়ে পরে বিস্তারে আলোচনা করা হবে। মুণ্ডন ও উপবাস সকল তীর্থে বিহিত, কেবল কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরজা ও গয়াক্ষেত্রে মুণ্ডন ও উপবাস বিহিত নয়।[১৫৪] শাস্ত্রকারেদের এরূপ নির্দেশের কারণ উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ প্রিয়জনের বিয়োগে মানসিক শোকের কথা মাথায় রেখে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জলের প্রতিকূলতাও অন্যতম কারণ হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে মুণ্ডনাদি আচার গয়াতে পালিত হতে দেখা যায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, কোনও ভিক্ষু যদি গয়ায় গমন করেন, তবে তার পিণ্ডদান করা কর্তব্য নয়। সে কেবল বিষ্ণুপদে দণ্ড ন্যস্ত করলেই তার পিতৃগণ সহ তিনি মুক্তি লাভ করে থাকেন।[১৫৫] কারণ দণ্ডধারীর কোনরূপ পাপ বা পুণ্য নেই এবং সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে তাদের আর্থিকদিকও প্রায় ক্ষীণ। ফলে পিণ্ডদানাদি কার্য তাদের পক্ষে পালন করা মুশকিল। তাছাড়া ধর্মীয়দিকও রয়েছে। পিণ্ডদানের দ্রব্যাদি বিষয়ে নানা কথা বলা আছে। পায়স, চরু, সক্তু, পিষ্টক, তণ্ডুল, ফলমূলাদি, তিলকল্ক, সঘৃত গুড়খণ্ড অথবা কেবল দধি, উত্তম মধু ও ঘৃতখণ্ড সহ পিণ্যাক দ্বারা গয়ায় পিণ্ডদান করলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়। ঋতুৎপন্ন ভোজ্য বা মুনিগণনির্দিষ্ট হবিষ্যান্ন ভোজন করে গদাধর পাদপদ্ম ও ফল্গুতীর্থোদক

---

[১৫২] ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেযং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।

পাপং তত্সঙ্গজং সর্ব্বং গযাশ্রাদ্ধাদ্বিনশ্যাতি।। বায়ুপু., ১০৫.১৩

[১৫৩] আত্মজো'প্যন্যজো বাপিগযাভূমৌ যদা তদা।

যন্নাম্না পাতযেত্ পিণ্ডং তন্নযেদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্।। বায়ুপু., ১০৫.১৪

[১৫৪] মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বযং বিধি।

বর্জ্জযীত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরাজাং গয়াম্।। বায়ুপু., ১০৫.২৪

[১৫৫] দণ্ডং প্রদর্শযেদ্ভিক্ষুর্গযাং গত্বা ন পিণ্ডদঃ।

দণ্ডং ন্যস্য বিষ্ণুপদে পিতুভিঃ সহ মুচ্যতে।। বায়ুপু., ১০৫, ২৬

স্মরণপূর্বক রসযুক্ত ও সর্ববিধ মধুর বস্তু পিতৃগণের পূজায় নিয়োজিত করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৫৬] এর থেকে বোঝা যায় সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার কথা।

গয়া অঞ্চলের অর্থনীতির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে গবাদিপশু, তা সর্বজন বিদিত। ফলে পিণ্ডদানের যে প্রধান প্রধান দ্রব্যাদির উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল দুগ্ধজাতীয় দ্রব্য। যা সেই স্থানের অর্থনীতি বিকাশের অন্যতম উপাদান। ব্রহ্মচারী, একভোজী, ভূশায়ী, সত্যবাক্ শুচি ব্যক্তি তীর্থের ফল ভোগ করে থাকেন। তীর্থযাত্রীদের যথেচ্ছাচারী পাষণ্ড ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৫৭] কেন এরূপ নির্দেশ দেওয়া হল? তীর্থস্থানে তো সমস্ত ধরণের মানুষের অবাধ প্রবেশ। কিন্তু যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিদের সেই তীর্থক্ষেত্র থেকে দূরত্ব রাখবার কথা বলার কারণ হল, অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের যেন কোনও ধর্মীয় কার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হল ব্রাহ্মণদের তুষ্টি বিধান। বলা হচ্ছে ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য দ্বারা পূজা করে তাদের সন্তোষবিধান করতে হবে। সেই ব্রাহ্মণ তুষ্ট হলেই পিতৃগণ সহ দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।[১৫৮] এই উক্তির দ্বারা ব্রাহ্মণগণের ক্ষমতার কথা কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায়।

---

[১৫৬] পায়সেনাপি চরুণা সক্তুনা পিষ্টকেন বা।

তণ্ডুলৈঃ ফলমূলাদ্যৈগযাযাং পিণ্ডপাতনম্।।

তিলকল্কেন খণ্ডেন গুড়েন সঘৃতেন বা।

কেবলেনৈব দধ্না বা ঊর্জ্জেন মধুনাথ বা।।...

একতঃ সর্ব্ববস্তূনি রসবন্তি মধুনি হি।

স্মৃত্বা গদাধরাজ্ঘ্যব্জং ফল্গুতীর্থস্থ বিধিঃ।। বায়ুপু., ১০৫, ৩৩-৩৭

[১৫৭] তীর্থান্যনুসরন্ ধীরঃ পাষণ্ডং পূর্ব্বতস্ত্যজেত্।

পাষণ্ডঃ স চ বিজ্ঞেয়ো যো ভবেত্ কামকারকঃ।। বায়ুপু., ১০৫, ৪২

[১৫৮] ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদিনার্চ্চয়েত্।

তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ।। বায়ুপু., ১০৫, ৪৬

বায়ুপুরাণের পরবর্তী ১০৬তম অধ্যায়ে গয়াসুরের উপাখ্যানের কথা আগেই গয়া নামকরণের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরবর্তী ১০৭তম অধ্যায়ে নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সনৎকুমারর মুখে শিলার উৎপত্তির আখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে।[১৫৯] মহাতেজা ধর্ম নামক এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল বিশ্বরূপা। তাদের ধর্মব্রতা নামে এক কন্যা ছিল।[১৬০] বিবাহযোগ্যা ধর্মব্রতা পিতার আদেশে বরলাভার্থে বনে দুষ্কর তপশ্চরণ করেছিল। ব্রহ্মার মানসতনয় মরীচি পৃথিবী পর্যটন করে একসময় ধর্মব্রতার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। ধর্মব্রতার পিতার অনুমতিতে দুজনের বিবাহ সুসম্পন্ন হয় এবং ধর্মব্রতার গর্ভে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে।[১৬১] একদিন মরীচি ও তার স্ত্রীর একান্ত সময়ে ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলে ধর্মব্রতা স্বামী মারীচের সেবা ছেড়ে ব্রহ্মার সেবা করতে আরম্ভ করলেন। এমন অবস্থায় মরীচি নিজ শয্যা ত্যাগ করে পত্নীকে কর্তব্যে অবহেলা করতে দেখে, তাকে শাপ দিলেন। সেই শাপে ধর্মব্রতা দগ্ধ হয়ে শিলার আকৃতি ধারণ করলেন।[১৬২] এইভাবে শিলার উৎপত্তি হল। শিলা উৎপত্তির এই কাহিনী বলবার পেছনে নানান কারণ আছে। সেই কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল গয়াসুরের মস্তকে স্থাপিত শিলার উৎস। গয়াসুরের উপাখ্যানটি পরবর্তী *গরুড়পুরাণ* (৮২ অধ্যায়), *অগ্নিপুরাণেও* (১১৪ অধ্যায়) বর্ণিত হয়েছে। যেসকল পুরাণে গয়াসুরের কাহিনী পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে *বায়ুপুরাণের* কাহিনীটি প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়।[১৬৩]

গয়াসুরবৃত্তান্তটি বিষ্ণুর বামনাবতারের আদর্শে গড়ে উঠেছে। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর গ্রন্থে সূর্য-বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে আকাশ পরিক্রমণেই এই কাহিনীর বীজ নিহিত বলে মনে করেছেন।[১৬৪] *অগ্নিপুরাণেও* বিষ্ণুর এই উদয়াচল, অন্তরীক্ষ ও অস্তাচলে পদস্থাপনের উল্লেখ

---

[১৫৯] বায়ুপু., ১০৭, পৃ. ৭২৬-৭৩০

[১৬০] ধর্ম্মাত্ সমুত্পন্না কন্যা ধর্ম্মব্রতা সতী। বায়ুপু., ১০৬, ৩

[১৬১] জজ্ঞে পুত্রশতং তস্যাং মরীচেবিষ্ণুনাপমম্। বায়ুপু., ১০৬, ২০

[১৬২] গতান্যত্র ততঃ পাপচ্ছাপদগ্ধা শিলা ভব। বায়ুপু., ১০৬, ২৭

[১৬৩] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড-৩, পৃ.২৩৬

[১৬৪] তত্রৈব

রয়েছে।[১৬৫] বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুপদ সম্পর্কে যে দীর্ঘ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তার থেকে বিষ্ণুপেদের স্বরূপটি সুস্পষ্ট।[১৬৬] *নিরুক্তেও* বিষ্ণুর এই ত্রিধা পদন্যাসের উল্লেখ দেখা যায়।[১৬৭] অর্থাৎ গয়শির শব্দটি অস্তাচল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পুরাণসাহিত্যে এসে গয়শির গয়াসুরের মস্তকে পরিণত হয়েছে।[১৬৮] *গরুড়* ও *অগ্নিপুরাণ* মতে, দেবগণ গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ করে বিষ্ণুর সাথে গয়াসুরের মস্তকে অবস্থান করেছিলেন। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, পৃথিবী অগ্নিস্থান বা যজ্ঞস্থান। এই অগ্নিতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, কারণ যজ্ঞই বিষ্ণু। অতএব পৃথিবীতে যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর অবস্থান এবং অগ্নিতে নিশাভাগে সূর্যের তেজস্থাপন গয়াসুর উপাখ্যানের অন্যতম তাৎপর্য হতে পারে।[১৬৯]

বায়ুপুরাণের পরবর্তী ১০৮তম অধ্যায়ে শিলার মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। বিভিন্ন শিলায় পিণ্ডদানের কথা বলা আছে। গয়ায় শ্রাদ্ধ, জপ, হোম ও তপস্যা অক্ষয় হয়ে থাকে। বিশেষতঃ ভরতাশ্রমে প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি অনন্ত ফলপ্রদ বলে কথিত।[১৭০] এছাড়া এই অধ্যায়ে রুক্মিণীকুণ্ড, সরস্বতীকুণ্ড নামক কিছু কুণ্ডের কথা বলা হয়েছে।[১৭১] কুণ্ড শব্দটির একাধিক অর্থের মধ্যে অন্যতম হল দেবজলাশয় বিশেষ। প্রাথমিক অবস্থায় তীর্থের সাথে বিভিন্ন নদ-নদীর যোগের কথা জানা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে কুণ্ডকেও তীর্থের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যথা- উত্তরাখণ্ডের গৌরীকুণ্ড, বিহারে সীতাকুণ্ড ইত্যাদি। লক্ষণীয় বিষয় যে যে অঞ্চলে পবিত্রস্থান

---

[১৬৫] সমারোহণে, বিষ্ণুপদে গয়শিরসি, অগ্নিপু., ১১৪.৯, তত্রৈব

[১৬৬] এতত্ বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীযং ব্যোম্নি ভাস্বরম্। বিষ্ণুপু., ২.৮.৯৩-৯৮

[১৬৭] সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণনাভঃ। যাস্ক, নিরু. ১২.১৯.৩

[১৬৮] তত্রৈব

[১৬৯] তত্রৈব

[১৭০] গয়ায়াং চাক্ষয়ং শ্রাদ্ধং জপহোমতপাংসি চ।

সর্ব্বমানন্ত্যমাহুর্বৈ যদ্দত্তং ভরতাশ্রমে।। বায়ুপু., ১০৮,৩৫

[১৭১] তদগ্রে রুক্মিণীকূণ্ডং পশ্চিমে কপিলা নদী।

তত্র সারস্বতং কুণ্ডং সরস্বত্যা প্রকল্পিতম্। বায়ুপু., ১০৮,৫৭,৫৯

হিসেবে কুণ্ডের স্থাপন করা হয়েছে, সেই সেই স্থানগুলিতে হয় কাছাকাছি জলাশয় নেই বা স্থানটি এতই দুর্গম যে সেখানে জনসংযোগ বারাবার জন্যে হয়তো কুণ্ডের স্থাপন করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও কাছাকাছি নদ-নদী থাকলেও সেইস্থানে অত্যাধিক জনসমাগমের কারণে হয়তো অতিরিক্ত কুণ্ডের স্থাপন করা হয়েছে, যেমন- বারাণসীতে দুর্গাকুণ্ড। এছাড়া এই অধ্যায়ে গয়ায় কিছু স্থানের নাম করা হয়েছে, যেখানে শ্রাদ্ধাদি করলে পিতৃলোক ব্রহ্মপুরে গমন করে থাকে। সেই স্থানগুলির নাম বৈকুণ্ঠ, লোহদণ্ড, গৃধ্রকূট ও শোণক।[১৭২]

বায়ুপুরাণের পরবর্তী ১০৯তম অধ্যায়ে আদিগদাধর বিষ্ণুর ব্যক্তরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে আবার কি কারণে ব্যক্তাব্যক্তরূপে শিলায় অবস্থিত হলেন, বিষ্ণুর গদাই বা কিভাবে উৎপন্ন হল? সেই সব কথা আলোচনা করা রয়েছে। সেই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। বহুকালপূর্বে গদ নামক এক অসুর ছিল। তার অস্থি বজ্র থেকেও দৃঢ় ছিল। একদিন ব্রহ্মার প্রার্থনায় গদ তার শরীরাস্থি অর্পণ করে। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা সেই অস্থি থেকে এক অদ্ভুত গদা নির্মাণ করে স্বর্গে স্থাপন করে।[১৭৩] এর বহুদিন পরে হেতি নামক এক রাক্ষস দিব্যসহস্রবৎসর তপস্যা করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ দেন যে, সে দেব, নর, দৈত্য, অস্ত্র, শস্ত্র, কৃষ্ণ, ঈশান ও চক্রাদি অস্ত্রেরও অবধ্য ও মহাবলশালী হবে। এরপর দেবগণকে পরাভূত করে হেতি ইন্দ্রত্ব ভোগ করেন। দেবতারা ভীত হয়ে হরির শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু দেবতাদের বলেন, হেতি দেবাসুরের অবধ্য। তাই তাকে যেন দেবতারা কোনও মহাস্ত্র প্রদান করেন। তখন দেবতারা তাঁকে গদাসুরাস্থি নির্মিত গদা প্রদান করেন। বিষ্ণু সেই গদা দিয়ে হেতির নিধন করেন। এইজন্য তাঁর নাম আদিগদাধর।[১৭৪]

---

[১৭২] বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডশ্চ গৃধ্রকূটশ্চ শোণকঃ।

অত্র শ্রাদ্ধাদিনা সর্ব্বান্ পিতৃন্ ব্রহ্মপুরং নযেত্।। বায়ুপু., ১০৮,৭৪

[১৭৩] প্রার্থিতো ব্রহ্মণে প্রাদাত্ স্বশরীরাস্থি দুস্ত্যজম্।

ব্রহ্মোক্তো বিশ্বকর্ম্মাণি গদাং চক্রে'ড্ডুতাং তদা।। বায়ুপু., ১০৯,৩-৪

[১৭৪] গদামাদাববষ্টভ্য গযাসুরশিরঃশিলাম্।

নিশ্চলার্থং স্থিতো যস্মাত্তস্মাদাদিগদাধরঃ।। বায়ুপু., ১০৯,১৩

আদিগদাধরের ব্যক্তাব্যক্তরূপের বর্ণনা করবার পর, আদিগদাধরের মাহাত্ম্যের কথা যখন উল্লেখ করা হচ্ছে, তার মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হল- এক জায়গায় বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে আদিগদাধরকে নিরীক্ষণ করেন, তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হলেও রোগমুক্ত হয়ে বিষ্ণুমন্দির গমনে সমর্থ হন।[১৭৫] কুষ্ঠরোগ সেকালের মারণ রোগগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, তা সর্বজন বিদিত। কিন্তু কোনও স্থানের মাহাত্ম্যকীর্তনে সেই স্থানের মাহাত্ম্যকে জনসমক্ষে আনতে, সেই সময় এই মাহামারীরূপে খ্যাত ব্যাধিকেও কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই বিষয়টি লক্ষণীয়। এর দু'দিক হতে পারে। প্রথমতঃ, কুষ্ঠরোগীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রচেষ্টা। রোগকে ত্যাগ কর, রোগীকে নয়। দ্বিতীয়তঃ হরিভক্তির প্রসঙ্গ। যে বিশ্বাসের স্রোত বর্তমান সমাজেও বহমান। বেদ ও পুরাণ মতে সূর্য কুষ্ঠরোগের আরোগ্য বিধান করে থাকেন। বিষ্ণু হলেন সূর্যেরই একরূপ, ফলে সেই রোগ নিরাময়ের রাশও বিষ্ণুর হাতেই ন্যস্ত করেছেন পুরাণকারেরা।[১৭৬] এরপরে আসা যাক দান প্রসঙ্গে। আদিগদাধরের উদ্দেশ্যে গন্ধদানে গন্ধাঢ্য, পুষ্পদানে সৌভাগ্যশালী, ধূপদানে রাজ্যপ্রাপ্তি, দীপদানে প্রদীপ্ত, ধ্বজদানে নিষ্পাপ ও যাত্রায় ব্রহ্মলোকভোগী হয়ে থাকে।[১৭৭] অর্থাৎ, কোনও ধর্মীয়স্থানের বিকাশের উপকরণগুলির দানের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ধূপ, দীপ ইত্যাদির সঙ্গে ধ্বজদানের কথা বলা হয়েছে। এই ধ্বজ কিসের? সে প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু ধ্বজ এমন একটি উপকরণ যা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সীমানা বিস্তারের দ্যোতক। বর্তমানেও পূজা সামগ্রীর উপর নির্ভর করে বহু পরিবারের অন্নসংস্থান হয়ে থাকে। যেকোনো মঠ, মন্দির ইত্যাদি স্থানে এই ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবীকা লক্ষণীয়। এরপর আদিগদাধরের স্তব ও পূজার ফলের কথা বলা হয়েছে। ধর্মার্থী ধর্ম, অর্থকামী অর্থ, কামকামী কাম ও মোক্ষার্থী মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। বন্ধ্যা ব্যক্তি পুত্র ও শূদ্র

---

[১৭৫] যে দ্রক্ষ্যন্তি সদা ভক্ত্যা দেবমাদিগদাধরম্।

কুষ্ঠরোগাদিনির্ম্মক্তা যাস্যন্তি হরিমন্দিরম্।। বায়ুপু., ১০৯,৩৭

[১৭৬] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড-৩, পৃ.১১০-১১১

[১৭৭] গন্ধদানেন গন্ধাঢ্যঃ সৌভাগ্যং পুষ্পদানতঃ।

ধূপদানেন রাজ্যাপ্তিদীপাদ্দীপ্তির্ভাবষ্যতি।।

ধ্বজাদানাত্ পাপহানির্যাত্রাকৃদব্রহ্মলোকভাক্। বায়ুপু., ১০৯,৪০-৪১

সুখলাভ করে। এমনকি মন দিয়ে প্রার্থনা করলে ব্যক্তি নিজ অভীষ্ট প্রার্থিত বস্তুও লাভ হয়ে থাকে।[১৭৮] এইভাবে আদিগদাধরের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে সমগ্র অধ্যায় জুড়ে। মানুষের জীবনদর্শনের ব্যাখ্যার জন্যই চতুর্বর্গের বিভাগ করা হয়েছে। চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এর মধ্যে অর্থ ও কাম সর্বপ্রাণী সাধারণ। অর্থ মানে কেবল সম্পদ নয়, অর্থ মানে হল- any possession. সকল প্রাণীর কিছু ইচ্ছেও রয়েছে আবার প্রয়োজনও রয়েছে। যেমন- পিঁপড়ের মিষ্টির দানা সংগ্রহ করা তার এক প্রকার possession, এটা তার সহজাত প্রবৃত্তি। কাম মানে হল- any desire and fulfillment of desire. ফলে প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই কিছু না কিছু possession ও enjoyment-এর প্রবৃত্তি থাকে। না হতো উৎপাদন অসম্ভব। ধর্ম শব্দেরও নানা অর্থ রয়েছে, কিন্তু চতুর্বর্গ হিসেবে যে ধর্মের কথা বলা হয়, তার অর্থ হল- যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা ফললাভ। মানুষের কাছে এই অর্থ ও কাম পুরুষার্থ হিসেবে ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ তা ধর্মের অবিরোধী। অর্থাৎ অর্থ ও কাম যখন ধর্মের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তখন তা পুরুষার্থ হয়ে ওঠে। আর মোক্ষ হল মুক্তির পথ।[১৭৯] জীবনদর্শনের এই চারটি সোপানের দিকে লক্ষ্য করে ফলপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, যা তৎকালীন সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

বায়ুপুরাণের পরবর্তী ১১০তম অধ্যায়ে গয়াযাত্রার কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি গয়া যাবেন বলে মনস্থির করেছেন, তিনি বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধ, কৌপীনধারণ, গ্রামপ্রদক্ষিণ এবং শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করে গ্রামান্তরে গমন করবেন, এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে সেই ব্যক্তির বাস সেখানে তিনি যথাযোগ্য বিধি মেনে অন্যত্র স্থানান্তর করবেন। কারণ দানাদি যেসব কর্ম বিহিত রয়েছে তার ব্যত্যয়ে সেই স্থানের মানুষের জীবিকা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এরপরে

---

[১৭৮] ধর্ম্মার্থী প্রাপ্নুযাদ্ধর্ম্মমর্থার্থী চার্থমমাপ্নুযাত্।

কামানবাপ্নুযাত্ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুযাত্।।

বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বেদবেদাঙ্গপারগম্।

রাজা বিজযমাপ্নোতি শূদ্রশ্চ সুখমাপ্নুযাত্।।

পুত্রার্থী লভতে পুত্রানভ্যর্চ্চ্যাদিগদাধরম্। বায়ুপু., ১০৯,৫৩-৫৫

[১৭৯] Veda Parikrama Naba Prayay, Golpark RKM lectures, Samiran Chandra Chakrabarti, date: 30.06.15 and 28.07 2015.

স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কী ধরনের মানুষ তীর্থফললাভ করে থাকেন। প্রতিগ্রহ থেকে নিবৃত্ত ও সন্তুষ্ট ব্যক্তি, নিয়ত শুচি ও অহঙ্কারমুক্ত হয়ে ব্যক্তিকে তীর্থযাত্রা করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[১৮০] অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ও শারীরিক কোনো প্রকার মালিন্য যেন না থাকে। গয়া প্রবেশ পথের পূর্বে যে মহানদী থাকবে তাতে স্নান ও দেবাদির উদ্দেশ্যে তর্পণ করে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করবেন। এইভাবে ব্যক্তির কর্তব্যের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর তীর্থশ্রাদ্ধে বিধির কথা বলা হয়েছে। তীর্থশ্রাদ্ধে আবাহন বা দিগ্‌বন্ধন নেই, দৃষ্টিসম্ভুত কোনও দোষও গ্রাহ্য হয় না এবং কাতরতা সহকারে তীর্থশ্রাদ্ধ কর্তব্য নয়।[১৮১] অর্থাৎ তীর্থক্ষেত্রে বহুমানুষের সমাগম, ফলে অত্যাধিক নিয়মের বিস্তার অমূলক।

সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির মারা যাবার বহুদিন বাদে তীর্থশ্রাদ্ধের কথা মাথায় রেখে সাধারণ মানুষ পিণ্ডদান করতে আসেন। ফলে সেই পরিস্থিতিতে শোকের আবহ অনেকাংশে হ্রাস পায়, তাই স্বল্প নিয়মে তীর্থশ্রাদ্ধ পালনের বিধি দেওয়া হয়েছে। এরপর কাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা হবে সেই কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, জন্মের পূর্বে গর্ভেই যাদের মৃত্যু ঘটেছে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত, যে ব্যক্তির দাহ সৎকার হয় নি, বিদ্যুৎ বা চৌর কর্তৃক হত, দাবদাহে মৃত, সিংহ, ব্যাঘ্র অথবা কোনও দংষ্ট্রী বা শৃঙ্গী পশু দ্বারা নিহত, আত্মঘাতী ব্যক্তি, অপঘাতে মৃত, বিষ কিংবা শস্ত্র দ্বারা আহত হতে মৃত, অরণ্যে, পথে কিংবা রণে মৃত, ভূত, প্রেত কিংবা পিশাচাদি দ্বারা হত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের কথা বলা হয়েছে।[১৮২] এই ধরণের নানা কারণে মৃত্যুর কথা বর্তমানেও দেখা যায়। লক্ষণীয় বিষয় হল দাবদাহ, আত্মহত্যা, বিষক্রিয়া ইত্যাদি। বর্তমানে অত্যধিক দাবদাহে প্রতি বৎসর বহুমানুষ মারা যান। তৎকালীন সমাজেও এই সমস্যা ছিল, তার স্পষ্ট উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়।[১৮৩] সভ্যতার অগ্রগতি কখনও সবুজের ধ্বংস ছাড়া অসম্ভব,

---

[১৮০] প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো নিযতঃ শুচিঃ।

অহঙ্কারবিমুক্তো যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে।। বায়ুপু., ১১০,৪

[১৮১] নাবাহনং ন দিগ্‌বন্ধো ন দোষো দৃষ্টিসম্ভবঃ।

ন কারুণ্যেন কর্ত্তব্যং তীর্থশ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ।। বায়ুপু., ১১০,২৮

[১৮২] *বায়ুপুরাণ*, ১১০,৩৮-৪২ পৃ. ৭৪৪-৭৪৫

[১৮৩] দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহব্র্যাঘ্রহতশ্চ যে। বায়ুপু., ১১০,৩৯

ফলে দাবদাহ খুব স্বাভবিক ঘটনা। বর্তমান সমাজে আত্মহনন খুব বড় সমস্যা। সেই সমস্যার নানান দিক রয়েছে। তৎকালীন সমাজেও তার অন্যথা হয় নি।[১৮৪] বিষক্রিয়া যে কি ভয়াবহ হতে পারে, তার উদাহরণ কারোরই অজানা নয়। ভূত, প্রেত, পিশাচাদি দ্বারা মৃত্যু সমাজের সেই কুসংস্কারের দিককে তুলে ধরে যা বর্তমানে ভারতবর্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।[১৮৫] এই ধরণের নানান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে বহুমানুষ সঠিক চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হরান। তৎকালীন সমাজে এই ধরনের বিশ্বাসের দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে এই আলোচনায়। এরপর পিণ্ডদানের নানা বিধি ও নির্দেশ উল্লেখ করে এই অধ্যায়টি সমাপ্ত হয়েছে।

আলোচ্য অধ্যায়ে শ্রাদ্ধ বিষয়ক নানা আলোচনা করা হয়েছে। শ্রাদ্ধ কী? সে বিষয়ে জানা যায়- শ্রদ্ধা থেকে শ্রাদ্ধ শব্দের উৎপত্তি।[১৮৬] শ্রাদ্ধ শব্দটি যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত। যেমন- 'শ্রাদ্ধ করবে' এই উক্তিটির দ্বারা শ্রাদ্ধ নামক কর্মবিশেষকে বোঝানো হওয়ায় তা রূঢ়। অন্যদিকে শ্রদ্ধাসহকারে যে অন্নাদির দান করা, এর দ্বারা শ্রাদ্ধ শব্দটির যৌগিকত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে।[১৮৭] *ব্রহ্মপুরাণ* অনুসারে বলা হয়েছে, যা কিছু স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে, বিধি দ্বারা পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করে শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়, তাকে শ্রাদ্ধ বলা হয়।[১৮৮] আপস্তম্বের মতে, এই একধরণের সংজ্ঞা লক্ষ করা যায়। শূলপাণি নিজগ্রন্থ *শ্রাদ্ধবিবেক*-এ আপস্তম্বের মতকে উল্লেখ করে সেই সংজ্ঞার দোষ আলোচনা করেছেন এবং শেষে শ্রাদ্ধের লক্ষণ দিয়েছেন- "সম্বোধনপদোপনীতান্ পিত্রাদীন্ চতুর্থ্যন্তপদেনোদ্দিশ্য হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্" অর্থাৎ সম্বোধন পদের দ্বারা (আহূত হয়ে) উপস্থিত পিত্রাদির (আত্মাকে) চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের সাহায্যে উদ্দেশ্য করে হবিত্যাগের নাম শ্রাদ্ধ।[১৮৯] শূলপাণির মতে, শ্রাদ্ধ যাগস্বরূপ এবং দানস্বরূপ।[১৯০] অর্থাৎ শ্রাদ্ধ

---

[১৮৪] আত্মপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদামহ্যম্। বায়ুপু., ১১০,৪০

[১৮৫] ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যৈস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদামহ্যম্। বায়ুপু., ১১০,৪১

[১৮৬] চূডাদিভ্য উপসংখ্যানম্ (বার্ত্তিক), পাণিনি, অষ্টা., ৫.১.১১০

[১৮৭] বাণী চক্রবর্তী, *সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন*, পৃ. ১৮০

[১৮৮] দেশে কালে চ পাত্রে চ শ্রদ্ধযা বিধিনা চ যত্।

পিতৃনুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যো দত্তং শ্রাদ্ধমুদাহৃতম্।। ব্রহ্মপু., উদ্ধৃত, *ধর্মশাস্ত্র কা ইতিহাস*, অর্জুন চৌবে, পৃ. ১১৯৬

[১৮৯] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী*, পৃ. ৮৭

বলতে বোঝায় শ্রদ্ধা সহকারে অন্নপ্রভৃতির দান। উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কারের পূর্বেও শ্রদ্ধাঞ্জলি অবশ্য দেয়। শ্রাদ্ধের দ্বাদশভেদ, পঞ্চভেদ নানাধরণের প্রকারভেদ উল্লেখ রয়েছে। শ্রাদ্ধের জন্য আঠেরো প্রকার প্রশস্ত স্থানের কথাও বলা হয়েছে। যথা- পুষ্কর নামক স্থান, সকল তীর্থস্থান, বড় বড় নদীর তীর, নদীর সঙ্গমস্থল, নদীর উৎপত্তিস্থল, নদীতোয়োত্থিত দেশ অর্থাৎ দ্বীপ, নিকুঞ্জ, প্রস্রবন, উদ্যানবাটিকা, বন, গোময়োপলিপ্ত গৃহ, মনোজ্ঞ স্থান, গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর তীর, গয়া, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষ, পর্বত বা তন্নিকটবর্তী স্থান।[১৯১] এই প্রশস্ত স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম হল গয়া।

ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিবিযোগে এমনকী পালিত পশুপাখীর বিযোগেও শ্রাদ্ধ করা হয়ে থাকে। বর্তমানেও শ্রাদ্ধ প্রবল ভাবে সমাজে প্রচলিত। অনেক সময় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে পরিবারে শ্রাদ্ধ করা না হলেও, তীর্থশ্রাদ্ধ ভারতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এমন একটি দিককে তুলে ধরে, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র্যতার দাবি রাখে। কেবল ব্যক্তিবিযোগ হেতু শোকের আবহে পিতৃপুরুষের স্মরণ করা হয় তা নয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি এমন অনেক শ্রাদ্ধই রয়েছে যা কোনো শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা হিসেবে বর্তমানেও পালিত হয়ে থাকে। এমনকী মহালয়ার দিনটিও শ্রাদ্ধের দিন হিসেবে বিবেচিত। যেদিন তর্পণাদি দ্বারা পিতৃপুরুষের সাথে সাথে দেব, অসুর, গন্ধর্বকুলের উদ্দেশ্যে, এমনকী সমস্ত জীবকুল, প্রাণীকুল ও বৃক্ষকুলের উদ্দেশেও জলদান করা হয়ে থাকে। পুরো বিষয়টি কিছুটা অদ্ভুত শোনালেও, এই আচারের মধ্যে দিয়ে সমগ্র জগতের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের যে উষ্ণতা উদ্ভূত হয়, তা ভারতীয় সংস্কৃতিকে মহিমাণ্বিত করে তোলে।

বায়ুপুরাণের আলোচ্য এই অধ্যায়টিতে আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল তীর্থশ্রাদ্ধ। তীর্থে গমন করলে তীর্থশ্রাদ্ধ করতে হয়। তীর্থ গমনে মুণ্ডন ও উপবাস উভয়ই কর্তব্য। উপবাস মনে সংকল্প। যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে কৃচ্ছসাধন ও মানসিক প্রস্তুতি। অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে সংকল্পিত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যে মানসিক প্রস্তুতি তাই হল উপবাস। মুণ্ডন বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণ নানান নির্দেশ দিয়েছেন। যা মনে রাখা দরকার, গয়া, গঙ্গা, বিশালা ও

---

[১৯০] যাগদানরূপতা অস্য, *শ্রাদ্ধবিবেক*, উদ্ধৃত, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭

[১৯১] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯

বিরজা এই চারতীর্থ ভিন্ন সকল তীর্থে মুণ্ডন ও উপবাস কর্তব্য।[১৯২] এখানে উল্লেখযোগ্য গয়াতে মস্তক মুণ্ডন বর্জনীয়। এইরূপ নির্দেশ থাকলেও বর্তমানে বহু মানুষ গয়াতে গিয়ে মস্তকমুণ্ডন করে থাকেন। যারা এই মুণ্ডন করেন তারা শাস্ত্রীয়বিধি লঙ্ঘন করে থাকেন অথবা তত্তদ্‌দেশীয় আচার বশতই এরূপ আচরণ করে থাকেন।

বায়ুপুরাণের ১১১তম অধ্যায়ে ফল্গুতীর্থের কথা বলা হয়েছে।[১৯৩] ফুল্গুতীর্থের উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে, যজ্ঞে হত দক্ষিণাগ্নির রজ থেকে ফল্গুতীর্থের উৎপত্তি।[১৯৪] পরে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে যজ্ঞপতি স্বয়ং বিষ্ণু ঐ যজ্ঞে ফল্গুতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হন। এই অধ্যায়ে ফল্গুকে গঙ্গা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলে উল্লেখ করবার পিছনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে গঙ্গা বিষ্ণুর পাদ হতে উৎপন্ন, কিন্তু ফল্গু আদিগদাধরের শরীর হতে ক্ষরিত।[১৯৫] তীর্থের নদীগুলির মাহাত্ম্য কথনের বৈশিষ্ট্য হল, যখন যে নদীর কথা বলা হয় তখন সেই নদীকে অন্য নদীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়। যেমন এই অধ্যায়ে ফল্গুনদী প্রসঙ্গে গঙ্গার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলে ফল্গুকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই বক্তব্যকে সুদৃঢ় করবার জন্যে ফল্গুতীর্থের ফললাভ বিষয়ে শত সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফলের কথা বলা হয়েছে।[১৯৬] অর্থাৎ পুরাণকারগণ সবসময় এমন একটি অদৃষ্টফলের কথা বলেন, যাতে সাধারণ মানুষ ফললাভের জন্য সেই স্থানকে তীর্থ হিসেবে মান্যতা প্রদান করে। এটি হল পুরাণকারদের স্থান বর্ণনার স্বাভাবিক ভঙ্গি, যা বৈদিক সময় থেকেই চলে আসছে। বৈদিক সাহিত্যেও যখন যে দেবতার বর্ণনা হয়েছে, তখন সেই

---

[১৯২] মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।

বর্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা।। *প্রায়শ্চিত্তবিবেক,* উদ্ধৃত, বাণী চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত,* পৃ.১৯৭

[১৯৩] বায়ুপু., ১১১তম অধ্যায়

[১৯৪] দক্ষিণাগ্নৌ হুতং তত্র তদ্রজঃ ফল্গুতীর্থকম্। বায়ুপু., ১১১,১৪

[১৯৫] গঙ্গা পাদোদকং বিষ্ণোঃ ফল্গুর্হ্যাদিগদাধরঃ।

স্বযং হি দ্রবরূপেণ তস্মাদ্ গঙ্গাধিকং বিদুঃ।। বায়ুপু., ১১১,১৬

[১৯৬] অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেত্। বায়ুপু., ১১১,১৭

দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যাক্সমুলার বর্ণনার এই ভঙ্গিকে Henotheism[১৯৭] বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১৯৮] বিষয় বর্ণনার এই রীতি পুরাণসাহিত্যেও লক্ষ করা যায়।

বায়ুপুরাণের এই অধ্যায়েই পিণ্ডদান প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আখ্যানের কথা জানা যায়। ভারদ্বাজ মুনি একসময় পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দিব্য কশ্যপপদে শ্রাদ্ধ করে পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হলে, সেই কশ্যপপদ থেকে কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণের দুটি হাত নির্গত হয়। দুটি হাত দেখে সংশয়াপন্ন হয়ে মুনি ভারদ্বাজ তাঁর মা শান্তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই দুই হাতের মধ্যে কোনটি তার পিতার হাত? শান্তা উত্তর দেন, সে যেন কৃষ্ণহস্তে পিণ্ড দান করে। কৃষ্ণহস্তে পিণ্ডদান করতে উদ্যত হলে শ্বেতহস্ত অদৃশ্য হয়ে বলে ওঠে, সে তার ঔরস পুত্র। ফলে শ্বেতহস্তই পিণ্ড পাবার অধিকারী। কৃষ্ণহস্ত বলে, তুমি আমার ক্ষেত্রজ পুত্র, অতএব তুমি আমায় পিণ্ড প্রদান কর।[১৯৯] পরে মায়ের আদেশে ভারদ্বাজ ক্ষেত্রী ও বীজী দুই পিতাকেই পিণ্ডদান করেন।[২০০] স্মৃতিশাস্ত্রকারেদের মতে, দ্বাদশপুত্রের কথা জানা যায়।[২০১] যাদের অন্যতম হল ক্ষেত্রজ ও ঔরস পুত্র। যে তালিকাতে ঔরসপুত্রের স্থান প্রথমে ও ক্ষেত্রজপুত্রের স্থান তৃতীয়ে। সবথেকে আশ্চর্য বিষয় হল, মা প্রথমে ক্ষেত্রজ পিতাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সন্তানের পিতা কে তা শুধু মা বলতে পারেন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে মা তার সন্তানের কাছে তার আসল পিতৃ পরিচয় গোপন করেছিলেন, তা এই আখ্যান থেকে স্পষ্ট। ফলে আখ্যানটি তৎকালীন সমাজে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়। যেখানে সত্যের থেকে বড় হয়ে ওঠে সামাজিক স্বীকৃতি। বর্তমানেও ঔরসজাত পুত্র সর্বদা সমাজের কাছে ও পরিবারের কাছে কাঙ্ক্ষিত। বিবাহ নামক

---

[১৯৭] Henotheism means one particular god out of several. (Wiki)

[১৯৮] Veda Parikrama Naba Prayay, Golpark RKM lectures, Samiran Chandra Chakrabarti, date: 19.01.2016.

[১৯৯] শ্বেতো'দৃশ্যা'ব্রবীত্তত্র পুত্রস্ত্বং হি মমৌরসঃ।

কৃষ্ণো'ব্রবীন্মম ক্ষেত্রং ততো মে দেহি পিণ্ডকম্।। বায়ুপু., ১১১,৬১

[২০০] স্বৈরিণ্যথাব্রবীদ্দাতুং ক্ষেত্রিণে বীজিনে ততঃ। বায়ুপু., ১১১,৬৩

[২০১] ঔরসো ধর্মপত্নীজস্তত্সমঃ পুত্রিকাসুতঃ।

ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু সগোত্রেণেতরেণ বা।। যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞ., ২.১২৮-১৩২

সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত ঔরসপুত্র। তৎব্যতীত পুত্রের স্থান সমাজে হেয় বলে বিবেচিত। গয়ামাহাত্ম্যে পিণ্ডদানের অধিকারী ও প্রশস্তকাল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- নিজপুত্র অথবা অন্যের পুত্র যে কোনও সময়ে গয়ায় গিয়ে নামোল্লেখ করে পিণ্ডদান করতে পারে। যে ব্যক্তির নামে পিণ্ডদান করা হয়ে সে ব্যক্তি শাশ্বত ব্রহ্মধামে গমন করেন।[২০২] প্রশস্তকাল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- মলমাসে, জন্মদিনে, অকালে, সিংহস্থ বৃহস্পতিতে এবং সর্বকালেই বিচক্ষণব্যক্তিরা গয়াতে পিণ্ডদান করবেন।[২০৩] অর্থাৎ যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও কালে গয়ায় পিণ্ডদান করতে পারে। ভারতীয় ধর্মের এই বিকল্প বিধানের মধ্যদিয়ে যে উদারতা প্রকাশ পায়। সেই কারণেই হয়তো প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি ভারতীয় সনাতন ধর্মের ধারা বহমান, যা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের মধ্যে বিরল।

বায়ুপুরাণোক্ত গয়ামাহাত্ম্যের সর্বশেষ অধ্যায়ে গয়ার মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে সমগ্র অধ্যায় জুড়ে। লক্ষণীয় বিষয় এই অধ্যায়ে গয়ায় স্থিত নানান তীর্থের নামোল্লেখও করা হয়েছে। যথা- গায়ত্রীতীর্থ, সমুদিততীর্থ, সরস্বতীতীর্থ, লেলিহানতীর্থ, বৈতরণী, দশাশ্বমেধিক, হংসতীর্থ, অমরকণ্টক, কোটিতীর্থ, রুক্মাকুণ্ড, ঘৃতিকূল্যা, মধুকূল্যা, মখতীর্থ ও কর্দমালতীর্থ।[২০৪] তাছাড়া এই অধ্যায়ে বিশাল রাজার একটি আখ্যান রয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশাল নগরীতে বিশাল নামে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। তিনি একদা দ্বিজগণকে অপুত্রক হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে দ্বিজগণ উত্তরে বলেন, গয়ায় পিণ্ডদান করলে তার পুত্রাদি লাভ হবে এবং হলও তাই। পিণ্ডদানের সময় রাজা শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ পুরুষ আকাশে দেখতে পেলেন। রাজা তাদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্বেত পুরুষ উত্তরে বলেন, সে তার পিতা, রক্ত পুরুষ তার পিতামহ ও কৃষ্ণ পুরুষ তার প্রপিতামহ। রাজার পিতামহ ছিলেন ব্রহ্মঘাতী ও প্রপিতামহ বহু মুনিকে

---

[২০২] আত্মজশ্চান্যজো বাপি গযাশ্রাদ্ধে যদা তদা।

যন্নাম্না পাবযেত্ পিণ্ডং তন্নযেদ্ ব্রহ্মশাশ্বতম্।। *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৫, পৃ.২৫২

[২০৩] গযাযাং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।

অধিমাসে জন্মদিনে অস্তে চ গুরুশুক্রযোঃ।

ন ত্যক্তব্যং গযাশ্রাদ্ধং সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌ।। তত্রৈব

[২০৪] বায়ুপু., ১১২তম অধ্যায়

হত্যা করায় তাদের মুক্তি হয় নি। অনন্তর রাজার পিণ্ডদানে তাদের মুক্তি লাভ হল।[২০৫] এই আখ্যানটি কিছুটা অলৌকিক শোনালেও, ঘটনার বিন্যাস থেকে কিছু জিনিস লক্ষ করবার মত। তৎকালীন সমাজে ব্রহ্মঘাতী হওয়া ও মুনি হত্যা করা অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে এই ধরণের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য এবং মৃত্যুর পরও অপরাধীর মুক্তি ঘটে না এরূপ নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু গয়ায় পিণ্ডদান করা হলে সেই সকল গুরু অপরাধও মার্জনীয়। কোনও স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গেলে মানুষের কৃতকর্মের অশুভ ও নিন্দনীয় দিক্ গুলিকে কিছু নিয়ম ও বিধি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের মোড়কে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। যা সমাজের রূঢ় বাস্তবতার দিককে তুলে ধরে। আবার অন্যদিকে সমাজে সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ক্ষমতার অপব্যবহার চিরকালীন। সমাজের তথাকথিত ক্ষমতাবান মানুষের জীবনযাপনের ইঙ্গিত বহন করে আখ্যানটি।

আখ্যানটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল পিতৃ। *পিতৃ* শব্দের অর্থ হল পিতা। কিন্তু *পিতরঃ* শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১. কোনও ব্যক্তির আগের মৃত তিন পুরুষ, ২. মানবজাতির প্রাচীন পূর্বজ যে এক পৃথকলোকের অধিবাসীরূপে কল্পিত হয়েছে।[২০৬] আরেকটি শব্দ হল পিণ্ড। শ্রাদ্ধ কথাটির সাথে সর্বক্ষেত্রে জড়িয়ে রয়েছে পিণ্ডদানের প্রসঙ্গ। এই পিণ্ডদান শ্রাদ্ধে আবশ্যিক। কারণ মনে করা হয়, দশটি পিণ্ডের সমন্বয়ে মানব দেহের অবয়ব সম্পাদন করে সম্পূর্ণ প্রেতশরীর নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন- প্রথম পিণ্ডদ্বারা মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ড দ্বারা নেত্র, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এই দশটি পিণ্ডের অপর নাম পূরকপিণ্ড। এবিষয়ে *শুদ্ধিতত্ত্ব* গ্রন্থে বিস্তারে অলোচনা রয়েছে।[২০৭] এছাড়াও রঘুনন্দনকৃত *তীর্থযাত্রাতত্ত্ব* গ্রন্থে বারাণসী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাত্রার পূর্বে ও তীর্থস্থানে করণীয় অনুষ্ঠানের বিস্তর আলোচনা দৃষ্ট হয়। শূলপাণিকৃত *শ্রাদ্ধবিবেক* ও রঘুনন্দনকৃত *গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি* গ্রন্থে শ্রাদ্ধ সম্পর্কিত নানান আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত নিবন্ধ শ্রেণীর গ্রন্থগুলি পরবর্তী কালের।

---

[২০৫] বায়ুপু., ১১২.৭-১৩

[২০৬] ঋ., ১০.১৪.২; ১০.১৪.৭; ১০.১৫০২; ৯.৯৭.৩৯, উদ্ধৃত, ধর্মশাস্ত্র কা ইতিহাস, খণ্ড ৩, পৃ. ১২০৬.

[২০৭] বাণী চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮

সবশেষে গয়ামাহাত্ম্যের ফলপ্রাপ্তি অংশে কিছু বিশেষ দিক লক্ষণীয়। গয়ামাহাত্ম্য বর্ণনায় বারংবার গয়াযাত্রার কথা বলে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু ফলপ্রাপ্তি অংশে যাত্রা অপেক্ষা স্তব স্তুতির দিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। গয়াখ্যান পাঠ বা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণের কথা বলা হয়েছে।[২০৮] নয়টি ব্রাহ্মণ দ্বারা গয়াখ্যান পাঠ করালে গয়াশ্রাদ্ধেরই ফললাভ হয়ে থাকে। গয়ামাহাত্ম্য সমাহিতচিত্তে অভ্যাস করলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সবথেকে আশ্চর্য বিষয় হল গয়ামাহাত্ম্যের পুঁথি লেখবার ও পূজার কথা বলা হয়েছে।[২০৯] পুঁথি লেখার বিষয়ে জোর দেবার অন্যতম কারণ হল যতবেশি পুঁথি তৈরী হবে, ততবেশি সেই স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার পাবে। প্রাচীনকালে পুঁথি লেখা যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ বিষয় ছিল। ফলে উচ্চবৃত্ত মানুষের আর্থিক বলের ওপর নির্ভর করে স্থানমাহাত্ম্য প্রচারের উপায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাছাড়া ভারতীয় পুঁথির যে বিপুল সম্ভার, তার অন্তরালে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল ধর্মীয় দিক্। যা এই বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট। বৈয়াসিক *মহাভারতে* বিরাটপর্বের পুঁথির সংখ্যা অন্যান্য পর্বের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ শ্রাদ্ধবাসরে এই অংশটি পাঠ করা হয়। সুতরাং এই থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায়, ধর্মীয় উপাদানগুলি কিভাবে পুঁথির সংখ্যাকে প্রভাবিত করেছে।

৪.২.৪. বিষ্ণুপদ মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান :

গয়া বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে যে মন্দিরের কথা উল্লেখ না করলে গয়া বিষয়ক আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থাকে তা হল বিষ্ণুপদ মন্দির। বর্তমানে এই মন্দিরকে ঘিরে পিণ্ডদানাদি নানা কর্ম হয়ে থাকে। মন্দিরটি ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত। কোন দিন কোন তীর্থযাত্রা বিধেয়,

---

[২০৮] গযাখ্যানমিদং পূণ্যং যঃ পঠেত্ সততং নরঃ।

শৃণুযাচ্ছ্রদ্ধযা যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্।। বায়ুপু., ১১২.৬১

[২০৯] লিখেদ্বা লেখযেদ্বা'যি পূজযেদ্বাপি পুস্তকম্।

তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীঃ সুপ্রসন্না ভবিষ্যতি।। বায়ুপু., ১১২.৬৩

সেবিষয়ের সঙ্গে ফল্গুতীর্থের কথাও *গয়ামাহাত্ম্যে* উল্লিখিত হয়েছে। *অগ্নিপুরাণ* মতে, গয়াশিরই ফল্গুতীর্থ।[২১০] তীর্থযাত্রার চতুর্থ দিনে এই ফল্গুতীর্থে অবগাহন করে গয়াশীর্ষে বিষ্ণুপদে যাত্রার কথা বিহিত রয়েছে। ফল্গুতীর্থে ফল্গুনদী প্রবাহিত। ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা একথা সর্বজনবিদিত। অন্তঃসলিলত্বের সাদৃশ্য থাকায় বহু মানুষ ফল্গুনদীকে সরস্বতীনদী বলে অভিহিত করে থাকেন। এই বিষ্ণুপদ মন্দিরই গয়ার মধ্যে সর্বপ্রধান মন্দির বলে স্বীকৃত। গয়াগ্রামের মধ্যে এমন গঠনপ্রণালী ও কারুকার্য অন্য মন্দিরে দেখতে পাওয়া বিরল। নাটমন্দিরের কারুকার্য চিত্তাকর্ষক। কথিত আছে মহারাষ্ট্ররাজ্ঞী অহল্যাবাই এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।[২১১] মন্দিরের গর্ভগৃহে গদাধরের পাদপদ্ম রয়েছে। পাদপদ্মের চারদিক্ রৌপ্যমণ্ডিত। এই পাদপদ্মেই হিন্দুধর্মাবলম্বিগণ পিণ্ডদান করে থাকেন। মন্দিরপ্রাঙ্গনে পড়ে থাকা পিণ্ডাদির তিলতণ্ডুলাদি মন্দির প্রাঙ্গনে ঘুরে বেড়ান ছাগাদি পশু ভক্ষণ করে থাকে। *বায়ুপুরাণে* বর্ণিত গয়াসুরের আখ্যানানুসারে এই স্থানটিতে গয়াসুরের মস্তক বিন্যস্ত রয়েছে। কথিত রয়েছে গদাধর পিতৃগণের মুক্তি হেতু ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে বিষ্ণুপদরূপে বাস করেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, এখানে শ্রাদ্ধ করলে অক্ষয় পুণ্য লাভ এবং বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়ে থাকে। বিষ্ণুপদ ভিন্ন নানা নামাখ্যায়িত পদের উল্লেখও এই গয়াপ্রদেশে পাওয়া যায়, ফলে পাদচিহ্ন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে গয়া অতিপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্যতীর্থ বলে বিদিত হলেও, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে গয়ার যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্বয়ং শাক্যসিংহ সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করে গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত গয়াশীর্ষ পর্বত হয়ে নৈরঞ্জনা নদীতীরে উপস্থিত হয়েছিলেন।[২১২] এই স্থানের অদূরে বোধিতরুমূলে বুদ্ধপদ লাভ করেছিলেন। যেখানে তিনি যোগবলে সিদ্ধ হয়ে বোধিলাভ করেন, বর্তমানে সেই স্থান বোধগয়া বা বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের মূল চারটি পীঠস্থান- কপিলাবস্তু (বুদ্ধের জন্মস্থান), বোধগয়া (বুদ্ধের সাধনাশ্রম), বারাণসী (বৌদ্ধধর্মের প্রচারক্ষেত্র), কুশী (বুদ্ধের নির্বাণ স্থান)। কালের নিয়মে মানুষের মানসক্ষেত্রে কপিলাবস্তু ও

---

[২১০] অগ্নিপু., ১১৫.২৬

[২১১] *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ৫, পৃ.২৫১

[২১২] তত্রাদ্রাক্ষীনদীং নৈরঞ্জনাচ্ছোদকাং সুপতীর্থ্যাং গ্রাসাদিকৈশ্চক্রমণ্ড...রলঙ্কৃতাং সমন্ততশ্চগোচরগ্রামান্। ললিত., ১৩ অধ্যায়, উদ্ধৃত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ৫, পৃ.২৪৮

কুশীর মাহাত্ম্য লোপ পেলেও, বর্তমানে বুদ্ধগয়া ও বারাণসীর মাহাত্ম্য অমলীন রয়েছে।[২১৩] লক্ষণীয় বিষয় হল পবিত্র কাশীধামে একসাথে বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্র ও ভগবান বিশ্বেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। খ্রিস্টজন্মের বহুকাল আগের থেকেই এই স্থানের মাহাত্ম্য চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। সম্রাট অশোক নির্মিত স্তূপ ও মহাবোধি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তার প্রধান সাক্ষ্যরূপে চিহ্নিত। এই স্থানে জগতের অদ্বিতীয় পুরুষ শাক্যসিংহ বোধিদ্রুমমূলে সমাধিস্থ হয়ে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বর্তমানে সেই পিপ্পলবৃক্ষ বিদ্যমান। কিন্তু বলা হয়, বর্তমানে যে পিপ্পলবৃক্ষটি দেখতে পাওয়া যায়, তা হল প্রাচীন পিপ্পল বৃক্ষেরই চারা বলে বিদিত।[২১৪]

[২১৩] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ১৩, পৃ.১১৩

[২১৪] তত্রৈব

পঞ্চম অধ্যায়

পুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের বহুমুখী গুরুত্ব

কোনও স্থান বিকাশের অন্তরালে থাকে নানা ধরণের উপাদান। আর্থ-সামাজিক উপাদান তার মধ্যে অন্যতম। অর্থনৈতিক উপাদান বলতে সাধারণতঃ বোঝায় অর্থের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, যেমন- ব্যবসা, চাষবাস, গবাদি পশু প্রভৃতি। সামাজিক উপাদানের বিষয় বলতে বোঝায় ধর্ম-কর্ম, আচার-বিচার, সংস্কার তথা লোকযাত্রার বিবিধ দিক। সেই অর্থে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদানের বিষয়গুলিকে পৃথক্ করা মুসকিল। কারণ এই উপাদানদুটি একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাশী ও গয়ামাহাত্ম্য বিষয়ক আলোচনাতে বারংবার পাপক্ষালনের উদ্দেশ্যে দান, রাত্রিবাস, নৈবেদ্যাদি দ্রব্য সামগ্রী, পুথির প্রতিরূপ বানানো প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। যে কোনো স্থানের সমৃদ্ধির জন্য যেমন সামাজিক-রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই কোনও স্থানের বিকাশের অন্তরালে অর্থনৈতিক দিকটিও অস্বীকার করা যায় না।

কোনও স্থানের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হতে গেলে প্রাথমিক উপাদান হল পর্যাপ্ত জনবসতি। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষপ্রচার* নামক দ্বিতীয় অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে জনপদনিবেশ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। যা তীর্থস্থানের বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে জনপদনিবেশ শব্দটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। 'জন' বলতে বোঝায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মানুষকে এবং চতুরাশ্রমাবলম্বীদের। 'পদ' বলতে বোঝায় অবস্থান এবং 'নিবেশ' শব্দটির অর্থ স্থাপন। অর্থাৎ সমাজের চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমাবলম্বীদের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপন। কোনো স্থানে জনপদ আগে থেকে থাকতে পারে বা নতুন ভাবে জনপদ

স্থাপিত হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে জনবসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া ভিন্ন হবে।[১] জনপদের উন্নতির জন্য আকর, কর্মান্ত, দ্রব্যবন, হস্তিবন, ব্রজ, বণিক্‌পথ প্রচার, নৌচলাচলের উপযোগীনদী প্রভৃতি জলপথ, স্থলে যাতাযাতের উপযোগী পথ ও পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের উপযোগী বাজার প্রভৃতি নির্মাণ করবেন।[২] এই সমস্ত দিক বিচার করলে তীর্থস্থানের বিকাশের সঙ্গে জনপদনিবেশ বিষয়টি জড়িত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তীর্থক্ষেত্রে রাত্রিবাস খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। বর্তমানেও যে কোনো তীর্থস্থানে যেতে গেলে সাধারণ মানুষ রাত্রিবাসের কথা ভেবে থাকে। শাস্ত্রীয় বিধি মেনে রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত কতটা নেওয়া হয় সে বিষয়টি বলা মুসকিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে তীর্থক্ষেত্রে রাত্রিবাস পৌরাণিক ধর্মের নিয়মানুযায়ী উপদেশের মতই বিধান দেওয়া হয়েছে। *মৎস্যপুরাণে বারাণসীমাহাত্ম্য* প্রসঙ্গে চারমাস বা একমাস বাসের কথা বলা হয়েছে।[৩] প্রজ্ঞ ব্যক্তি বিঘ্ন সত্ত্বেও যদি কাশীক্ষেত্রে বাস করেন তবে সেই ব্যক্তির পরমস্থান প্রাপ্তি ঘটে থাকে। অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত, এই কথাটি তার ইঙ্গিত বহন করে। ঠিক একই ভাবে *বায়ুপুরাণের গয়ামাহাত্ম্যেও* পক্ষত্রয়কাল, পঞ্চদশ দিন, সাত কিংবা তিন রাত্রি বাস করবার বিধান দেওয়া হয়েছে। ফলপ্রাপ্তি হিসেবে বলা হয়েছে তিনপক্ষকাল গয়াক্ষেত্রে বাস করলে পুত্রের সপ্তকুল পূনাত্যা হয়, পঞ্চদশ, সাত বা তিন রাত্রি বাস করলে মহাকল্প কাল সঞ্চিত পাপ

---

[১] কৌটিল্য, *অর্থশাস্ত্র,* ২.১.১

[২] *তদেব,* ২.১.৪

[৩] একত্র চতুরো মাসান্ মাসৌ বা নিবসেত্ পুনঃ।

অবিমুক্তে প্রবিষ্টানাং বিহারস্তু ন বিদ্যতে।। মৎস্য., ১৮৪.২২

বিনষ্ট হয়।[৪] লক্ষণীয় বিষয় হল কাশী ও গয়াতে রাত্রিবাসের সময়সীমা। কাশীতে রাত্রিবাসের সময়সীমা গয়াক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি। এর পেছনে নানা যুক্তি থাকতে পারে। প্রথমতঃ কাশী বহুকাল আগে থেকেই মহাজনপদ হিসেবে পরিচিত। ফলে কাশীতে রাত্রিবাস করা সুবিধাজনক। বিশেষ করে নদীর তীরবর্তী স্থান হওয়ায় এই স্থানটিতে যোগাযোগ ও চাষবাসাদি নানা ধরণের সুবিধা ছিল। কিন্তু অন্যদিকে গয়াক্ষেত্রে জনবসতি কাশীর তুলনায় কম থাকায় সেখানে রাত্রিবাসের সুবিধাও কম। ফলে সেই কথা মাথায় রেখে সম্ভবতঃ রাত্রিবাসের সময়সীমার তারতম্য লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ মহাজনপদ হবার দরুণ প্রাচীন ভারতবর্ষে কাশীতে নানা সময়ে নানা শাসকের ক্ষমতা চলেছে, ফলে প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল কাশী। রাজশাসন থাকলে সেই স্থানে কর আদায়ের একটি প্রসঙ্গ থাকে। সেই দিক থেকে কাশী রাজকোষের আর্থিক ভাণ্ডারের একটি উৎস। অন্যদিকে তৎকালীন গয়াপ্রদেশে জনবসতি কম থাকায়, সেই অঞ্চলে কর আদায়ের পরিমানও ছিল অনেক কম। এরূপ নানাবিধ কারণে সম্ভবতঃ রাত্রিবাসের বিধানের তারতম্য লক্ষ করা যায়।

প্রাচীন ভারতে সাধারণতঃ যোগাযোগের মাধ্যম ছিল জলপথ বা স্থলপথ। স্থলপথের অধিকাংশই থাকত অরণ্যবেষ্টিত। ফলে কোনো তীর্থস্থানে পৌছতে ও থাকতে গেলে প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপদে থাকবার জায়গা। এই দুটি জিনিসই কোনো স্থানের অগ্রগতির

[৪] গযাং গত্বান্নদাতা যঃ পিতরন্তেন পুত্রিণঃ।

পক্ষত্রযনিবাসী চ পুনাত্যাসপ্তমং কূলম্।।

নো চেত্ পঞ্চদশাহং বা সপ্তরাত্রিং ত্রিরাত্রিকম্।

মহাকল্পকৃতং পাপং গযাং প্রাপ্য বিনশ্যতি।। বায়ুপু., ১০৫.১১-১২

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ফলে ধর্মীয় স্থানগুলি যেমন ধর্মের অগ্রগতির সহায়ক, তেমনই আর্থ-সামাজিক উন্নতিরও বার্তা বাহক।

বর্তমানে কাশী কেবল একটি নিছক পুণ্যক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত নয়। এখানে সবসময় নানাদেশীয় লোকের সমাগম হয়ে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে চিনি, নীল, মূর্তি ও শাড়ীর ব্যবসা প্রধান। বিশেষ করে বেনারসী শাড়ীর খ্যাতি জগৎ প্রসিদ্ধ। জৌনপুর বস্তি, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানের সকলপ্রকার উৎপন্ন পণ্যাদি এখানে আনীত ও বিক্রীত হয়ে থাকে। কাশীর রেসমীকাপড়, সাল, বারাণসীকাপড় ও বিভিন্ন প্রকারের জরি, হীরা, রত্ন প্রসিদ্ধ। কাশীতে নানা দূর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী দেখতে পাওয়া যায়। বর্তনামেও কাশী শাস্ত্রচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। তাছাড়া তীর্থস্থান হবার দরুণ কাশীতে পর্যটন শিল্পের যে বিকাশ লক্ষিত হয় তা সেই স্থানের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে যে দৃঢ়তা প্রদান করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গয়াতে মুণ্ডন ও উপবাস সকল তীর্থে বিহিত, কেবল কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরজা ও গয়াক্ষেত্রে মুণ্ডন ও উপবাস বিহিত নয়।[৫] এরূপ নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বিধান দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে দেখা যায় বিভিন্ন তীর্থস্থানে অগণিত মানুষ নিজেদের কোনো এক মনোবাঞ্ছা পূরণ হবার দরুণ নিজ কেশরাশি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন (যেমন- বৈদ্যনাথধাম, তিরুপতি ইত্যাদি)। প্রতিদিন যে কেশরাশি উৎসর্গ করা হয় সেই কেশরাশি সংগ্রহ করে নানা প্রসাধনসামগ্রী নির্মানে কাজে লাগানো হয়। এই কার্যে কিছু মানুষ নিযুক্ত রয়েছেন, যা সমাজে কিছু মানুষের অর্থ উপার্জনের সহায়ক।

---

[৫] মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বযং বিধি।

বর্জ্জযীত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরাজাং গয়াম্।। বায়ুপু., ১০৫.২৪

মুণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে আসে উপবাসের প্রসঙ্গ। উপবাস মানে হল ভোজনাভাব। সর্বভোগ বর্জিত হয়ে পাপ নিবৃত্তির জন্যে দয়া, ক্ষান্তি, ধৈর্যাদি নিয়মে অবস্থান করাকে উপবাস বলা যায়।[৬] উপবাস বৈধ ও অবৈধ ভেদে দ্বিবিধ। ব্রতাদির জন্যে বিধিপূর্বক যে উপবাস করা হয় তা বৈধ।[৭] উপবাস পূর্ণ ও আংশিক ভেদেও দ্বিবিধ হয়ে থাকে। নিরম্বু উপবাসকে পূর্ণ অনশন বলা যেতে পারে। সময় ও জাতিবিশেষে ভোজ্য দ্রব্যবিশেষের অনশনকে আংশিক উপবাস বলা যেতে পারে। সমাজে নানা কারণে উপবাস বা অনশন করতে দেখা যায়। যথা- শোকানুষ্ঠান, শুদ্ধিকরণ, উৎসব, দীক্ষা, যাদুবিদ্যা, প্রায়শ্চিত্ত, সন্ন্যাসজীবন ইত্যাদি। আলোচ্য বিষয়ে শোকানুষ্ঠান ও সমবেদনাসূচক অনশনের কথা বলা হয়েছে। এরূপ অনশন বা উপবাসের উৎপত্তিসংক্রান্ত বিষয়ে নানা কারণ উপস্থিত করা হয়। যেমন- মৃতিব্যক্তির প্রাতাত্মার সন্তোষবিধান, খাদ্যের সঙ্গে মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার প্রবেশ নিবারণ, মৃতের সংস্পর্শ হেতু খাদ্য দূষিত হবার ভয় প্রভৃতি। নানাবিধ কারণ থাকা সত্ত্বেও যে কারণটি যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করা যেতে পারে তা হল- শোক হেতু আহারে অনাসক্তি উপবাস বা অনশন প্রথার জন্যে দায়ী বলা যেতে পারে। উপবাস প্রথা বিষয়টি হয়তো আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যুক্ত সঙ্গত নয়। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওযায় বিষয়টি আলোচনা করা হল।[৮]

উপবাস ভঙ্গের কোনো বিধি পুরাণকারেরা উল্লেখ না করলেও, নৈবেদ্যাদি ভিন্ন কোনো ব্রত সমাপ্তি অসম্ভব। ফলে মুণ্ডন ও উপবাসাদির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পূজার নৈবেদ্যাদি। যার ক্রয়-

---

[৬] উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।

উপবাসঃ স বিজ্ঞেযঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ।। *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ২, পৃ. ৪২৬

[৭] *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ২, পৃ. ৪২৬

[৮] *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী,* অনশন, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২. পৃ. ৪৮০-৪৯৮

বিক্রয় সমাজের অর্থনৈতিক দিককে নির্দেশ করে। এছাড়া তীর্থশ্রাদ্ধের উপযুক্ত স্থান হিসেবে গয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। এখানে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দান অক্ষয় হয় বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। গয়াস্থানে পঞ্চতীর্থে[৯] শ্রাদ্ধ করা শাস্ত্রসিদ্ধ বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন পুরাণে শ্রাদ্ধে দেয় বস্তুর কথা উল্লেখ করা রয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণে* শ্রাদ্ধে দেয় বস্তুর যে তালিকা প্রদত্ত হয়েছে তা দেখলে অনুমান করা যায় যে শ্রাদ্ধ কতখানি ব্যয় বহুল হতে পারে। বলা হচ্ছে- হবিষ্য, মৎস্য, শশমাংস, পক্ষিমাংস, শূকরমাংস, ছাগমাংস, এণ(মৃগবিশেষ)মাংস, রুরুমৃগমাংস, গবয়মাংস, মেষমাংস, গোমাংস প্রদান করলে পিতৃগণ যথাক্রমে অধিক মাস পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হল।[১০] এছাড়া গণ্ডারের মাংস, কৃষ্ণ শাক ও মধু শ্রাদ্ধকর্মে প্রশস্ত হয়ে থাকে। এরূপ নানা দ্রব্যের তালিকার কথা বলা হয়েছে বিষ্ণুপুরাণে। এই তালিকা থেকে আন্দাজ করা যায় সাধারণ মানুষ নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী শ্রাদ্ধে দ্রব্যাদি দান করবেন। যা তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক দিককে নির্দেশ করে।

---

[৯] পঞ্চতীর্থ অর্থাৎ গয়া, ধর্মপৃষ্ঠ, ব্রহ্মার গৃহ, গয়াশীর্ষ ও অক্ষয়বট। বাণী চক্রবর্তী, *সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন*, পৃ. ১৯৬-২০০

[১০] হবিষ্য-মৎস্য-মাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ।

শৌকরচ্ছাগলৈরৈণৈরৌরবৈর্গবযেন চ।।

ঔরভ্রগব্যৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যা পিতামহাঃ।

প্রযান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বাধ্রীণসামিষৈঃ।।

খড়্গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু।

শস্তানি কর্ম্মণ্যত্যন্ত-তৃপ্তিদানি নরেশ্বরঃ।।

গযামুপেত্য যঃ শ্রাদ্ধং করোতি পৃথিবীপতে।

সফলং তস্য তজ্জন্ম জাযতে পিতৃতুষ্টিদম্।। বিষ্ণুপু., ১৩.১৬.১-৪

মৎস্যপুরাণে বারাণসীমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে নানা ধরণের দানের উল্লেখ রয়েছে। যথা- পুষ্প, ধূপ ও গন্ধাদি দ্রব্য, মাল্য দান করলে যথাক্রমে অগ্নিহোত্রফল, ভূমিদানতুল্য ফল ও শতসহস্র ফল লাভ হয়ে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হল প্রতিটি ফলই অদৃষ্ট সম্বন্ধি ফল। দেবমন্দির মার্জন করলে পঞ্চশত অগ্নিহোত্রফল ও অনুলেপনে সহস্র অগ্নিহোত্র ফল লাভ হয়ে থাকে। নৃত্য গীত বাদ্যাদিও তীর্থক্ষেত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[১১] দেবমন্দিরে দানাদি সামগ্রীর দিকে লক্ষ করলে আর্থ-সামাজিক দিকটি পরিষ্কার হয়। পুষ্প-মাল্যাদি যে দ্রব্যসামগ্রীর কথা বলা হয়েছে তা ব্যবসার দিককে নির্দেশ করে থাকে। যে স্থানে বহু জনসমাগম হয়ে থাকে সেখানে পুষ্প-মাল্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ের একটি পরিসর তৈরি হয়। বর্তনামেও দেবমন্দির সংলগ্ন বহু পরিবারের আয়ের উৎস মন্দির সংলগ্ন ছোট দোকান। কিছু পরিবারের বংশ পরম্পরাক্রমে পুষ্পাদি নানা পূজা সামগ্রী বিক্রয় তাদের জীবিকা। তীর্থক্ষেত্রের সাথে নিবিড় ভাবে জড়িত নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি। যা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বহু মানুষের উপার্জনের দিককেও নির্দেশ করে। বর্তমানেও ভক্তের কোনো ইচ্ছাপূরণ হলে নামকীর্তনাদি নানা ধরণের মানসিক করা হয়ে থাকে। যা এক শ্রেণীর মানুষদের উপার্জনের উৎস। এভাবে তীর্থস্থানগুলি নানা দিক থেকে বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের আধার সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গয়ামাহাত্ম্যে দান প্রসঙ্গে। আদিগদাধরের উদ্দেশ্যে গন্ধদানে গন্ধাঢ্য, পুষ্পদানে সৌভাগ্যশালী, ধূপদানে রাজ্যপ্রাপ্তি, দীপদানে প্রদীপ্ত, ধ্বজদানে নিষ্পাপ ও যাত্রায় ব্রহ্মলোকভোগী হয়ে

---

[১১] অগ্নিহোত্রফলং ধূপে গন্ধদানে তথা শৃণু।

ভূমিদানেন তত্ তুল্যং গন্ধদানফলং স্মৃতম্।।

সম্মার্জ্জনে পঞ্চশতং সহস্রমনুলেপনে।

মালযা শতসাহস্রমনন্তং গীতবাদ্যতঃ।। মৎস্য., ১৮৩.৭৮-৭৯

থাকে।[১২] অর্থাৎ, কোনও ধর্মীয়স্থানের বিকাশের উপকরণগুলির দানের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ধূপ, দীপ ইত্যাদির সঙ্গে ধ্বজদানের কথা বলা হয়েছে। এই ধ্বজ কিসের? সে প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু ধ্বজ এমন একটি উপকরণ যা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সীমানা বিস্তারের দ্যোতক। বর্তমানেও পূজা সামগ্রীর উপর নির্ভর করে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবারের অন্নসংস্থান হয়ে থাকে। আদিগদাধরের স্তব ও পূজার ফলের কথা প্রসঙ্গে ধর্মার্থীর ধর্ম, অর্থকামীর অর্থ, কামকামীর কাম ও মোক্ষার্থীর মোক্ষ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।[১৩] এইভাবে নানান ভঙ্গিতে আদিগদাধরের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। জীবনদর্শনের এই চারটি সোপানের দিকে লক্ষ্য রেখে যে ফলপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তা তৎকালীন সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। বর্তমানে সমাজেও সাধারণ মানুষ পূর্বসংস্কার বশতঃ চর্তুবর্গের দিকে অজ্ঞাতেই ধাবিত হয়ে থাকে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ ও ধর্মের মানুষের সমন্বয়ের বার্তা বহন করে চলেছে তীর্থক্ষেত্রগুলি।[১৪] সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে তীর্থক্ষেত্রে অবাধ জনসমাগমের এই দিকটি সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক দিককেও সুদৃঢ় করে।

---

[১২] গন্ধদানেন গন্ধাঢ্যঃ সৌভাগ্যং পুষ্পদানতঃ।

ধূপদানেন রাজ্যাপ্তিদীপাদ্দীপ্তির্ভাবষ্যতি।।

ধ্বজাদানাত্ পাপহানির্যাত্রাকৃদব্রহ্মলোকভাক্। বায়ুপু., ১০৯,৪০-৪১

[১৩] ধর্ম্মার্থী প্রাপ্নুযাদ্ধর্ম্মমর্থার্থী চার্থমমাপ্নুযাত্।

কামানবাপ্নুযাত্ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুযাত্।।

বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বেদবেদাঙ্গপারগম্।

রাজা বিজযমাপ্নোতি শূদ্রশ্চ সুখমাপ্নুযাত্।।

পুত্রার্থী লভতে পুত্রানভ্যর্চ্চ্যাদিগদাধরম্। বায়ুপু., ১০৯,৫৩-৫৫

[১৪] নানাবর্ণা বিবর্ণাশ্চ চণ্ডালা যে জুগুপ্সিতাঃ।

বর্তমানে গয়া জেলার পূর্বাংশে চাষবাস অধিক হয়ে থাকে। উত্তর ও পশ্চিমাংশে তেমন চাষবাস লক্ষ করা যায় না, কারণ অঞ্চলটি অনুর্বর। এই অঞ্চলের পাহাড়ে ও জঙ্গলে গুটি, মৌচাক, নানাপ্রকার গঁদ প্রভৃতির আধিক্য লক্ষণীয়। গয়া জেলা পূর্বকাল থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পুণ্যভূমি ও মুক্তিক্ষেত্র বলে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে মুরহরনদী তীরস্থ টিকারি নগরে টিকারিরাজের দুর্গ অবস্থিত। দাউদনগর ও জাহানাবাদে একসময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কাপড়ের কুঠী ছিল।[১৫]

বর্তমানে শোণনদীর তীরবর্তী অরবাল নামক স্থানে নীলের ব্যবসা হয়ে থাকে। কিন্তু এক সময় এই স্থানে প্রসিদ্ধি ছিল কাগজ ও চিনির ব্যবসার জন্যে।[১৬] দেও নামক একটি স্থানে এখানকার প্রাচীন রাজগণের রাজভবন রয়েছে। বর্তমানে হসূয়া, বেলা, বজীরগঞ্জ, নবাদা ও বারিসালীগঞ্জে নানাপ্রকার ব্যবসা হয়ে থাকে। এখানে ধান, গম, যব, পাঠ, তুলা, সর্ষপ, অহিফেন, ছোলা, কলাই, কোদো, মটর, খেসারি, শণ, নীল, ইক্ষু, পাণ, আলু প্রভৃতি নানান ধরণের শস্য যথেষ্ট পরিমানে উৎপন্ন হয়ে থাকে। শস্যের সমৃদ্ধি থেকে এই অঞ্চলের উর্বরতার আন্দাজ করা যায়। এই অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ কম থাকলেও মাঝে মাঝে অতিবৃষ্টিতে শস্যের ক্ষতি হয়ে থাকে। বহুকাল পূর্বে গয়াতে গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে জলাভাব গেলেও, বর্তমানে খালের সুবন্দোবস্ত হওয়ায় জলাভাবের সমস্যা অনেকাংশে কমেছে। জানা যায় ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে গয়াতে দুর্ভিক্ষের কারণে বহু মানুষের জীবনজীবিকা যেমন ব্যাহত হয়, তেমনই সেই বছর ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাবে

কিল্বিষৈঃ পুর্ণদেহাশ্চ প্রকৃষ্টৈঃ পাতকৈস্তথা।।

ভেষজং পরমং তেষামবিমুক্তং বিদুর্বুধাঃ।

জাত্যন্তরসহস্রেষু হ্যবিমুক্তে ম্রিযেত যঃ।। মৎস্য., ১৮৪.৫৬-৫৭

[১৫] *বাংলা বিশ্বকোষ.* খণ্ড ৫, পৃ.২৪৫

[১৬] তত্রৈব

বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।[১৭] এক সময় গয়াতে দেশীয় বস্ত্র ও কাগজের ব্যবসা প্রবল ছিল বলে জানা যায়।[১৮] কিন্তু বর্তমানে সেই ব্যবসা লুপ্ত প্রায়। বর্তমানে এখানকার প্রধান উল্লেখযোগ্য রপ্তানিজাত দ্রব্য হল নানান প্রকারের শস্য, নীল, আফিম, চিনি, কম্বল, পিত্তলের বাসন প্রভৃতি। আমদানীর মধ্যে রয়েছে লবণ, থানবস্ত্র, তুলা, তক্তা, লোহা, গরম মসলা, তামাক, লাক্ষা ও নানান ফল। এরূপ সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এই স্থানের সকল প্রকার রাজকীয় কাগজপত্র সিপাহীবিদ্রোহের সময় নষ্ট হয়ে যায়।[১৯] ফলে পূর্বের শাসন বিবরণ জানবার তেমন কোনও উপায় নেই। কিন্তু এটা শোনা যায় যে বিদ্রোহের সময় বহু অর্থ রাজস্ব হিসাবে এখান থেকে আদায় করা হয়েছিল। শোনা যায় এই অঞ্চলে বহুকাল পূর্বে প্রায়শই গয়াতীর্থযাত্রীরা পথে ঘাটে দস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হতেন। এই দস্যু দমন করবার উদ্দেশ্যে গ্রামের জমিদারেরা দিগ্‌বার নিযুক্ত করেছিলেন। এই দিগ্বারীপ্রথা হবার পর থেকে দস্যুদের অত্যাচার নিয়ন্ত্রিত হয়।

গয়া অঞ্চলের অর্থনীতির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে গবাদিপশু, তা সর্বজন বিদিত। ফলে পিণ্ডদানের যে প্রধান প্রধান দ্রব্যাদির উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল দুগ্ধজাতীয় দ্রব্য। যা সেই স্থানের অর্থনীতি বিকাশের অন্যতম উপাদান। ব্রহ্মচারী, একভোজী, ভূশায়ী, সত্যবাক্ শুচি ব্যক্তি তীর্থের ফল ভোগ করে থাকেন। তীর্থযাত্রীদের যথেচ্ছাচারী পাষণ্ড ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২০] কেন এরূপ নির্দেশ দেওয়া হল? তীর্থস্থানে তো সমস্ত ধরণের মানুষের অবাধ প্রবেশ। কিন্তু যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিদের সেই তীর্থক্ষেত্র থেকে দূরত্ব রাখবার কথা

---

[১৭] তত্রৈব

[১৮] তত্রৈব

[১৯] তত্রৈব

[২০] তীর্থান্যনুসরন্ ধীরঃ পাষণ্ডং পূর্ব্বতস্ত্যজেত্।

পাষণ্ডঃ স চ বিজ্ঞেযো যো ভবেত্ কামকারকঃ।। বায়ুপু., ১০৫, ৪২

বলার কারণ হল, অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের যেন কোনও ধর্মীয় কার্যে ব্যাঘাত না আসে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হল ব্রাহ্মণদের তুষ্টি বিধান। বলা হচ্ছে ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য দ্বারা পূজা করে তাদের সন্তোষবিধান করতে হবে। সেই ব্রাহ্মণ তুষ্ট হলেই পিতৃগণ সহ দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।[২১] এর থেকে ব্রাহ্মণগণের ক্ষমতার কথা আন্দাজ করা যায় সঙ্গে দ্রব্যাদি দানের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক দিককে নির্দেশ করা হয়েছে।

গয়ামাহাত্ম্যের পুঁথি লেখবার ও পূজার কথা বলা হয়েছে।[২২] পুঁথি লেখার বিষয়ে জোড় দেবার অন্যতম কারণ হল যতবেশি পুঁথি তৈরী হবে, ততবেশি সেই স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার পাবে। পুঁথি লেখা তখনকার দিনে যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ বিষয় ছিল। ফলে উচ্চবৃত্ত মানুষের আর্থিক বলের ওপর নির্ভর করে স্থানমাহাত্ম্য প্রচারের উপায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাছাড়া ভারতীয় পুঁথির যে বিপুল সম্ভার, তার অন্তরালে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল ধর্মীয় দিক্। পুঁথির প্রতিরূপ তৈরিতে কেবলমাত্র লেখক নয়, প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমানে পুঁথির পৃষ্ঠা ও কালি। যার জন্য যেখানে পুঁথি লেখা হবে, সেই এলাকায় পর্যাপ্ত কাঁচামালের জোগান থাকতে হবে। ফলে এটিও অর্থনৈতিক দিককে নির্দেশ করে।

পুরাণে স্থানমাহাত্ম্য বিষয়টিকে দেখলে বোঝা যায় যে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের অন্তরালে যে আর্থ-সামাজিক দিকটি রয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল উদারতা। উদারতা কথাটি উচ্চারিত হলে সহজাত ভাবে সেখানে অমান্যতার পরিসরও শুরু

---

[২১] ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদিনার্চ্চয়েত্।

তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ।। বায়ুপু., ১০৫, ৪৬

[২২] লিখেদ্বা লেখযেদ্বা'যি পূজযেদ্বাপি পুস্তকম্।

তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীঃ সুপ্রসন্না ভবিষ্যতি।। বায়ুপু., ১১২,৬৩

হয়। এসকল স্থানে কখনও কখনও ধর্মকেও অধর্মের মত লাগতে পারে। একথা ঠিক যে ধর্ম ও অধর্ম সমবয়সী। কারণ কোনো একটি কাজ কারোর কাছে যেমন ধর্ম, তেমনই তা অন্যের কাছে অধর্ম। এদিক থেকে পর্যালোচনা করতে গেলে ধর্ম ও অধর্ম, সুখ ও দুওখ, শান্তি ও অশান্ত, দিন ও রাত্রি এরা প্রত্যেকেই সহোদরপ্রতিম। ঠিক একই ভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় ধর্ম ও অর্থ একে অপরের পরিপূরক। অর্থ ভিন্ন কোনো কিছু ধর্মাচার করা অসম্ভব। বর্তমান পরিস্থিত দেখে কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায় যে ধর্ম ও অর্থ কীভাবে একে অন্যকে পূর্ণতা দান করে। কারণ ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলিতে পূজাদি কর্মের জন্যে যেসব উপকরণের কথা বলা হয়েছে, তা পুরোপুরি ভাবে অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সে উপকরণ হোক পুষ্প, মাল্য, ধ্বজা, নৈবেদ্য ইত্যাদি। সমস্ত কিছুর সাথে জড়িত অর্থ। যা কোনো স্থানের আর্থিক অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত।

সর্বোপরি বর্তমানে তীর্থস্থানগুলি অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। সুদূর হিমালয় হোক বা কন্যাকুমারী, সর্বত্র তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু। লক্ষণীয় বিষয় হল তীর্থস্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান। তীর্থস্থানগুলি হয় অত্যন্ত সুলভে যাতাযাত করার উপযোগী স্থান, না হয় কোনো দুর্গম স্থান। যেমন- কেদারনাথ, অমরনাথ ইত্যাদি। দুর্গম স্থানগুলিতে যোগাযোগ কষ্টের হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটনকারীদের মুগ্ধ করে। ধর্ম এমন একটি বিষয় যা মানুষকে একাধারে যেমন একত্রিত করে, তেমন সেই স্থানের আর্থিক বিকাশেরও সহায়ক। বছরের প্রায় প্রতিদিনই তীর্থস্থানে জনসমাগম হয়ে থাকে, যা সেই স্থানের অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে তরাণ্বিত করে। পাপ ও পুণ্য এমন একটি বিষয় যা মানুষের মধ্যে চিরকাল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি কিছুটা হলেও ভারতীয় সভ্যতা লালন করেছে তীর্থস্থানগুলির মাধ্যমে। বাস্তবে কতটা পাপ ও পুণ্য তা যাচাই করা মুসকিল হলেও, বহুমানুষের জীবন-জীবিকার উৎস তীর্থস্থানগুলি সেবিষেয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উপসংহার

তীর্থ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবগাহন করা। পুরাণসাহিত্যে তীর্থ শব্দটি বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। *ভাগবতপুরাণে* তীর্থ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শুভক্ষণ হিসাবে[১], শ্রীকৃষ্ণের নাম হিসাবে।[২] *স্কন্দপুরাণের* কাশীখণ্ডে ত্রিবিধ তীর্থের কথা বলা হয়েছে। যথা- জঙ্গম, মানস ও স্থাবর তীর্থ। ইহ জগতে ব্রাহ্মণগণের পবিত্র স্বভাবাদির জন্য তাকে জঙ্গমতীর্থ বলা হয়েছে।[৩] সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ঋজুতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিযবাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য ও তপস্যাদি প্রতিটি গুণকে মানসতীর্থ বলা হয়েছে। এগুলির মধ্যে মনের যে বিশুদ্ধতাকে সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়। যে ব্যক্তি লোভী, ক্রুর, দাম্ভিক বা বিষয়াসক্ত, সে শত শত তীর্থে স্নান করলেও পাপ থেকে মুক্ত হয় না। তীর্থ কেবলমাত্র শরীরের পবিত্রতাই নয়, মানসিক পবিত্রতা প্রকৃত নির্মলতা প্রদান করে। তীর্থগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ। যদি অন্তঃকরণের ভাব পবিত্র না হয়, তাহলে দান, যজ্ঞ, শৌচ, তীর্থসেবা, সৎকথা শ্রবণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের আয়োজন করে কোনো ফললাভ হয় না। মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে যেখানেই অবস্থান করে, সেই স্থানই তার কাছে কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদয় তীর্থস্নান স্বরূপ। রাগদ্বেষ প্রভৃতি নেতিবাচক আবেগকে দূরে সরিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ জলে অবগাহন করা তীর্থস্নানের পর্যায়ভুক্ত। স্থাবরতীর্থ হল গঙ্গাদি পুণ্যপ্রদেশ। তীর্থ যেমন শরীরের

---

[১] ভাগবতপু., ১।১২।১৪, দ্র. Pranati Ghosal, "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p.65

[২] 'তীর্থকোটি' ভাগবতপু., ৩।১।৪৫; 'তীর্থপাদ' ভাগবতপু., ১।৬।৩৪ দ্র. Pranati Ghosal, "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015. p.65

[৩] ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সর্ব্বকামিকম্।

যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনাঃ জনাঃ।। *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ৮, পৃ. ৪৫-৫২

অবয়ববিশেষ পবিত্র বলে গণ্য, সেরূপ তীর্থ পৃথিবীরও কতকগুলি পুণ্যতম প্রদেশ তীর্থ হিসেবে বিখ্যাত। এরূপ তীর্থের প্রকারভেদও শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে।[৪] সুতরাং পুরাণসাহিত্যে সাধারণত তীর্থ শব্দটি পবিত্রস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে কায়িক বিশুদ্ধতার সঙ্গে মানসিক ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতার কথাও বলা হয়েছে।

বেদাদি ও ধর্মশাস্ত্রে ত্রৈবর্ণিক মানুষের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) নানাবিধ আচার-আচরণ পালনের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সেগুলির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগত ব্যাপারসমূহ অত্যন্ত জটিল থেকে জটিলতর। সেখানে আপামর জনসাধারণের নানাবিধ পাপ ও পাপক্ষালনের কোনো বিহিত নির্দেশ সেভাবে পাওয়া যায় না। অতএব তীর্থসমূহে গমন বা শুধুমাত্র অবগাহনের মাধ্যমে শুধু ত্রৈবর্ণিক নয়, যে কোনো মানুষের পাপক্ষালনের কথা বলা হয়েছে। সেদিক থেকে আপামর জনসাধারণের অত্যন্ত সহজ-সরল উপায়ে পাপমুক্তির উপদেশ প্রদানের জন্য পুরাণে তীর্থমাহাত্ম্য ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

---

[৪] শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানষে।

যেষু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রযাতি পরমাং গতিম্।।

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিযনিগ্রহঃ।

সর্ব্বভূতদযাতীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ।।

দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।

ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিযবাদিরা।।

জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।

তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা।

এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণম্।। *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ৮, পৃ. ৪৫-৫২

পুরাণসাহিত্যে তীর্থ নিয়ে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয়, তীর্থে মানুষ মুখ্যত দুইটি কারণে আসে- কোনো বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রত উদ্‌যাপন বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এবং অন্যটি হল পাপক্ষালনের জন্য স্নানাদি কর্ম সম্পন্ন করতে। যেকোনো তীর্থ পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়ে থাকে। সেইসকল পরিবেশ ও পরিস্থিতির অন্যতম হল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। যা ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরে তীর্থস্থানগুলি পুণ্যার্জন ও স্নানাদি কর্মের ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হলেও, পরবর্তীকালে তীর্থস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থ-সামাজিক দিক। তীর্থে রাত্রিবাস, নানাবিধ উপচারাদির দ্বারা পূজার্চনা, বিবিধ ব্রত-উপবাসাদি কর্ম, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এরূপ নানা ধর্মীয় আচারাদি লক্ষ করা যায়। তীর্থের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক দিকও। পুরীধাম-স্থিত জগন্নাথ মন্দির, কাশী-স্থিত বিশ্বনাথ মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক ইতিহাস বহন করে। তীর্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস। যে বিশ্বাস মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দৃঢ় ভাবে মোকাবিলা করবার সাহস জোগায়। ফলে তীর্থক্ষেত্রগুলি জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে অনায়াসে সুসংগত বন্ধনের সৃষ্টি করে থাকে।

পুরাণে তীর্থমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বারংবার উপবাসের কথা বলা হয়েছে। *মৎস্যপুরাণে*[৫] প্রয়াগমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- প্রয়াগে অনশন করলে পদে পদে অশ্বমেধের ফললাভ হয় এবং

[৫] শৃণু রাজন্ প্রযাগে তু অনাশকফলং বিভো।

প্রাপ্নোতি পুরুষো ধীমান্ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিযঃ।।

অহীনাঙ্গো'প্যরোগশ্চ পঞ্চন্দ্রিযসমন্বিতঃ।

অশ্বমেধফলং তস্য গচ্ছতস্তু পদে পদে।।

কুলানি তারযাদ্রাজন্ দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্।

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো গচ্ছেত্তু পরমং পদম্।। মৎস্য., ১০৮, ৩-৫

অনশনকারী ব্যক্তি নীরোগ ও পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পন্ন হয়ে থাকে। বারাণসীমাহাত্ম্য, গয়ামাহাত্ম্য প্রসঙ্গেও উপবাসের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমাত্র উপবাস নয়, অনশনের মাধ্যমে তীর্থস্থানে কৃপামৃত্যুর কথাও বলা হয়েছে। পুণ্যার্জনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানা ধরণের সংস্কার। সংস্কার দ্বিবিধ- সুসংস্কার ও কুসংস্কার। এই দ্বিবিধ সংস্কারই স্থান ও ধর্মীয় বিশ্বাস ভেদে নানা ধরণের হয়ে থাকে, কিন্তু পুণ্যার্জনের সঙ্গে যে ধর্মের সংযোগ রয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আচারাদি নির্ভর। তীর্থস্থানে কিছু বিশেষ দ্রব্যাদি দানের কথা বলা রয়েছে, আবার কোথাও পিণ্ডাদি তর্পণের কথা উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও স্থান মার্জনাদির কথা, আবার কোথাও পুঁথির প্রতিলিপি তৈরীর কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি কাজই একধরণের উপযোগিতার কথা বলে।

তীর্থে পুণ্যফল হিসেবে অগ্নিহোত্রাদি নানাবিধ যাগের সঙ্গে পূর্বোক্ত কর্মগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কার্যেরই কিছু ভালো ও মন্দ দিক রয়েছে। যেমন- গয়ামাহাত্ম্য প্রসঙ্গে পুঁথির প্রতিলিপি তৈরীর কথা বলা হয়েছে, আপাত দৃষ্টিতে এই কাজটি খুব সাধারণ বলে মনে হলেও, এই ধরণের কর্ম প্রাচীন কৃষ্টির ধারা যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে প্রাপ্ত পুঁথির যে বিপুল সম্ভার, তার মূলে রয়েছে এই ধরণের অভ্যাস। অন্যদিকে এই ধর্মের দোহাই দিয়ে বহু মানুষ তাদের অভীষ্টার্থ পূর্ণ করে থাকে। যেমন- কৃপামৃত্যু। মুমূর্ষু ব্যক্তির চিকিৎসা না করিয়ে ধর্মের ও পূণ্যের দোহাই দিয়ে তাকে গঙ্গাতীরে রেখে আসা এক অমানবিক কাজের সামিল। একে কুসংস্কার ছাড়া আর কি নাম দেওয়া যায়? এরূপ নানা ধরণের আচার যেমন কখনও ধর্মস্থানকে কলুষিত করে, ঠিক তেমনিই বহু লোকাচার তীর্থগুলিকে সংস্কৃতিক পীঠস্থানে রূপান্তরিত করে।

মৎস্যপুরাণ ও *কূর্মপুরাণে* শ্মশানকে পবিত্রস্থান হিসেবে ধরা হয়েছে। মনুর মতে, নিষেক থেকে আরম্ভ করে শ্মশানকৃত্য পর্যন্ত সংস্কার সমস্তই মন্ত্র দ্বারা নির্বাহিত হয়ে থাকে।[৬] অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্র হিসাবে শ্মশানকে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ক্ষেত্র হল শ্মশান। সাধারণত শ্মশানক্ষেত্র সকলের কাছে অপাংক্তেয়ক্ষেত্র হলেও এর মত পবিত্রক্ষেত্র আর দুটি যে হয় না তা পুরাণ থেকে উপলব্ধি করা যায়। কারণ এই স্থানে সৃষ্টি ধ্বংসের সঙ্গে ও ধ্বংস সৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে। শ্মশানে উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু সময়ের জন্যে বৈরাগ্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। শ্মশানক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির তো মুক্তি হয় না, এমনকী যে ব্যক্তি দাহকার্য সম্পন্ন করছেন সেই ব্যক্তিরও মুক্তি নেই। তাই হয়তো কাশীর নামান্তর অবিমুক্তকক্ষেত্র।[৭] অবিমুক্ত শব্দটি থেকে বোঝা যায়- যেখানে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ আত্মা যে ভোগ শরীরের মধ্যে থাকে, সেই ভোগ ভাবনার থেকে আত্মার মুক্তি ঘটে। কিন্তু শরীর নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডাদি দানের মাধ্যমে সেই আত্মার প্রেতশরীর নিষ্পন্ন হবার প্রক্রিয়াও শুরু হয়। ভারতীয় ধর্ম চেতনায় এটি এক নতুন ভাবান্তর। প্রসঙ্গত, অবিমুক্তে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ তীর্থের কথা বলা হয়েছে- দশাশ্বমেধ, লোলার্ক, কেশব, বিন্দুমাধব ও মণিকর্ণিকা।[৮] এই পাঁচটির মধ্যে দুটি হল বারাণসীর প্রসিদ্ধ ঘাট।

---

[৬] নিষেকাদিঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।

তস্য শাস্ত্রে'ধিকারো'স্মিন্ জ্ঞেযো নান্যস্য কস্যচিত্।। মনু. ২.১৬

[৭] শ্মশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্। কূর্মপু., পূর্বভাগ, ৩০.২৭

[৮] তীর্থানাং পঞ্চকং সারং বিশ্বেশানন্দকানেন।

দশাশ্বমেধং লোলার্কঃ কেশবো বিন্দুমাধবঃ।।

পঞ্চমী তু মহাশ্রেষ্ঠা প্রোচ্যতে মণিকর্ণিকা।

এভিস্তু তীর্থবর্য্যৈশ্চি বর্ণ্যতে হ্যবিমুক্তকম্।। মৎস্য., ১৮৫.৬৫-৬৬

বর্তমানে বারাণসীতে ৮৮টি ঘাট দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি ঘাটের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে এবং নানা ধরণের কাহিনিও কিংবদন্তি হিসেবে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রয়েছে। বারাণসীর ঘাটের সিঁড়ি বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু এই ঘাটের আধিক্যের কারণ কী তা সঠিক ভাবে বলা মুসকিল। সম্ভবতঃ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধস্থান হবার দরুন অত্যধিক জনসমাগমের কারণে নদীর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবার জন্যই ঘাটের সংখ্যার বিস্তার লক্ষ করা যায়।

শ্মশান ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে নিবিড় যোগ রয়েছে। যেমন কাশী ও গয়ার মধ্যে। একটি হল শবদেহের চরম আশ্রয়, অপরটি হল পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্র। এই দু'টি স্থানই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে একে অপরের পরিপূরক বলা যেতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে কাশী ও গয়া ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে পৃথক্ জায়গায় অবস্থিত হলেও, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

পুরাণে বৈকল্পিক বিধানের উপবাস, পূজাসামগ্রী প্রদান, দান, রাত্রিবাস প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় ভারতীয় ধর্মের উদারতা। এত বিকল্প বিধানের কথা বারংবার বলা হয়েছে যা থেকে ভারতীয় ধর্মের ঔদার্য বিষয়ে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে আছে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। সকল শ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে এক নিয়ম মানা সম্ভব না বলেই কী এই বিকল্প বিধান ও বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের অবতারণা? ভারতীয় ধর্মে উদারতার আদর্শ স্থান যদি কিছু থেকে থাকে, তা তীর্থস্থানগুলির ধর্মভাবনা থেকে উপলব্ধি হয়। যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের অবাধ প্রবেশ। প্রাচীন ভারতবর্ষে শূদ্র ও নারীদের বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত, তা ধর্মশাস্ত্রে বারংবার বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পুরাণ প্রদর্শিত একমাত্র তীর্থক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের অবাধ যাতায়াত সেকথা বিভিন্ন পুরাণে

বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। এই অবাধ যাতায়াতের অন্তরালে পুরাণকারেদের কী উদ্দেশ্য ছিল তা সংক্ষেপে বলা অসম্ভব। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রগুলি যে প্রাচীন রাজরাজাদের আয়ের ও ব্রাহ্মণদের জীবিকার একটি উৎস ছিল সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

বৈদিক পরম্পরায় পিতা-মাতা-গুরুকে শ্রদ্ধার যে কথা বারংবার বলা হয়েছে, তাতেই হয়তো শ্রাদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। স্মার্ত পরম্পরায় ষোড়শ প্রকার শ্রাদ্ধের কথা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৯] মৃতব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় কেবলমাত্র শ্রাদ্ধ করা হয় তা নয়। বিভিন্ন মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের পূর্বেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করা হয়ে থাকে।[১০] ভারতীয় পরম্পরায় শ্রাদ্ধকে কেবলমাত্র পিণ্ডদানাদির দিক থেকে বিচার করলে, এই সংস্কারের গুরুত্বকে বহুলাংশে খর্ব করা হয়। শ্রাদ্ধ মৃতব্যক্তিকে অমরত্ব প্রদান করে থাকে। অমরত্ব মানে মৃত্যুর পর ব্যক্তির শরীর না থাকলেও তাঁর কাজ, তাঁর অস্তিত্বের স্মরণপূর্বক তাকে মনে করা। শ্রাদ্ধাদি সংস্কার পিতৃপুরুষকে অমরত্ব প্রদানের একটি প্রতীক স্বরূপ। যা প্রতিবৎসর, প্রতি শুভানুষ্ঠানের পূর্বে তর্পণাদির দ্বারা গৃহে বা কোনো তীর্থক্ষেত্রে বা জলাশয়ের তীরে সম্পন্ন করা হয়। ভারতীয় ধর্মের এই উদারভাব তাকে পৃথিবীর অন্যসকল ধর্ম থেকে পৃথক করেছে।

কমবেশি প্রায় প্রতিটি পুরাণেই শ্রাদ্ধবিষয়ক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান হিসেবে পুরাণসাহিত্যে তীর্থস্থানগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। যেখানে তর্পণ, পিণ্ডদানাদি কর্মের দ্বারা পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। শ্রাদ্ধকর্ম বিষয়টি যে সর্বদা শোকের পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয় তা নয়, বিবিধ শুভ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেও শ্রাদ্ধাদি কর্ম অনুষ্ঠেয়। যথা- বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি। ভারতীয় ধর্মীয় পরম্পরায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও শ্রদ্ধার সঙ্গে

---

[৯] বাণী চক্রবর্তী, *সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন*, পৃ. ১৮০

[১০] বাণী চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১-১৮২

সম্পর্কিত। যার বহিঃপ্রকাশ শ্রাদ্ধের সময় উচ্চারিত মন্ত্রে দেখা পাওয়া যায়, যেখানে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত তৃপ্তির কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয় এই সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পূর্বপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ। যা ভারতীর সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিক, যার স্মরণ করে মানুষ নিজের পিতৃপুরুষকে অমরত্ব প্রদান করে থাকেন। শ্রাদ্ধ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে সুখ লাভ করা।[১১] এই মুক্তি ও সুখলাভের স্থান হিসেবে পুরাণকারেরা বারংবার গয়াদি তীর্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

তীর্থস্থান কথাটির মধ্যে রয়েছে নানা ধর্মীয় ভাবনার অনুষঙ্গ। কাশী, গয়া প্রভৃতি পৌরাণিক তীর্থ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল পৌরাণিক তীর্থস্থানগুলির আসে পাশে শৈব, বৈষ্ণব ভিন্ন নানা ধর্মীয় মতাবলম্বিদের প্রতিষ্ঠানগুলি। যথা- সারনাথ, বোধগয়া প্রভৃতি। নদী পথে যোগাযোগের সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা অনুকূল পরিস্থিতি থাকায় সম্ভবতঃ একস্থানেই একাধিক ধর্মের বিকাশ পাশাপাশি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে কোন ধর্ম কোন স্থানে প্রথম নিজের মহিমা বিকশিত করেছিল তা বলা মুসকিল। কিন্তু সময়ের তারতম্যে বিভিন্ন শাসক যে শাসন করেছিল, তা সেই স্থানগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য থেকে পরিষ্কার।

ভারতীয় ধর্মীয় পরম্পরায় প্রতীক উপাসনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারতীয় ধর্ম ভাবনায় আশ্চর্য ভাবে ঈশ্বর সৃষ্ট সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবার দর্শন নিহিত রয়েছে। ফলে পৌরাণিক পরম্পরায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুও দেবত্ব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে। সে হতে পারে কোনো শিলাখণ্ড, গাছ, পর্বত, নদী, কাষ্ঠাদি। মূর্তি ভিন্ন উপাসনার এই ধারাকে প্রতীক উপাসনা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যা তীর্থের ক্ষেত্রে অত্যন্ত লক্ষণীয় একটি বিষয়। যা অদ্যাবধি ভারতীয় আচারে প্রবহমান। বর্তমানেও কোনো পূজায় দেবতা বিগ্রহের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও

[১১] মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধসংস্কার*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩, পৃ. ঘ, ঙ

শালগ্রাম শিলা পূজিত হয়ে থাকে। এমনকী বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানে শিলা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা প্রতীক উপাসনার একটি দিক।

তীর্থস্থানের ভৌগোলিক অবস্থানগুলির দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে তীর্থস্থানগুলি হয় এমন স্থানে অবস্থিত যেখান যাতাযাতের সুবিধা রয়েছে, আর না হয় এমন দুর্গম প্রদেশে তার অবস্থান যেখানে যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য। যেমন কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, অমরনাথ ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল দুর্গম প্রদেশে অবস্থানের কারণে সেই সমস্ত তীর্থে জনসমাগম কম হয় এমনটা নয়। কিন্তু কেন এরূপ জনসমাগম? তা যে শুধু ধর্মের টানে এমনটা নয়, সেই সমস্ত স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্বাদনের সুখ অনুভব করতেও মানুষ তীর্থে গমন করে।

পুরাণে তীর্থ প্রসঙ্গে মোক্ষের কথা বারংবার অবতারণা হয়ে থাকে। মোক্ষ শব্দটির শাস্ত্রভেদে নানা অর্থ হয়ে পারে। যেমন ন্যায় দর্শন অনুসারে ১৬টি পদার্থ। এই পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হলে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। আবার সাংখ্য মতে দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মুক্তি। এরূপ নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে মোক্ষের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধন পদ্ধতি অনুযায়ী মোক্ষ পাঁচ প্রকার। যথা- সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, একত্ব।[১২] সাধকেরা বা সাধু সন্তেরা এই পঞ্চবিধ মোক্ষের সাধনা করে থাকেন। তীর্থ প্রসঙ্গে যে মোক্ষের কথা বলা হয়েছে সেই মোক্ষ উপরোক্ত কোনো মোক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এই মুক্তি কিসের? সম্ভবতঃ মোক্ষ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ রেখে সাধারণ অর্থে মোক্ষের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ জীবাত্মার বন্ধন থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই বন্ধনের অর্থ হল সুখ-দুঃখ-ভোগ বা সংসার। তীর্থযাত্রীদের তীর্থভ্রমণে বা তীর্থে অবগাহনে কতখানি মুক্তি ঘটে তা তাঁদের বিশ্বাসের উপর

[১২] *বাংলা বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১৫, পৃ. ৪১৯-৪২৮

নির্ভরশীল। কিন্তু তীর্থস্থানের বহুমানুষের জীবন-জীবিকা তরাণ্বিত হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যে কোনো স্থানের সমৃদ্ধির অন্তরালে থাকে সেই স্থানের মানুষদের সংস্কৃতি, আর্থসামাজিকতা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। এই ত্রিবিধ উপাদানের সঠিক সমন্বয় ঘটলে সেই স্থানের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয়ে থাকে। তীর্থস্থান ও পর্যটনকেন্দ্র হল এমন একটি অঞ্চল, যা কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে খুব দ্রুত তরান্বিত করতে পারে। এমন বহুস্থান রয়েছে যা তীর্থস্থান হিসেবে জনপ্রিয় হবার সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও প্রসিদ্ধ। সেই তালিকার মধ্যে বহু বহু নাম থাকলেও, অন্যতম হল কাশী ও গয়া। কেবল ধর্মভীরু মানুষই নয়, এই স্থানে বহু পর্যটনকারী মানুষেরও আগমন হয়ে থাকে। অত্যধিক জনসমাগম হলে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে আনুসঙ্গিক নানা অত্যাবশ্যক দ্রব্যেরও চাহিদা তৈরি হয়। যা সেই অঞ্চলের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করে। কেবল সেই অঞ্চলই নয়, সঙ্গে সেই অঞ্চলের পাশ্ববর্তী এলাকারও সামগ্রিক উন্নতি লক্ষিত হয়।

তীর্থ শব্দটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত শুচিতা ও পবিত্রতা। জলসম্পদ তীর্থের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। নদীকেন্দ্রিক তীর্থগুলির সংখ্যা ভারতবর্ষে অগণিত। পবিত্র নদীগুলির অন্যতম হল সরস্বতী, গঙ্গা, নর্মদা, যমুনা, গোদাবরী নদী ইত্যাদি। প্রতিটি নদী নিজ নিজ মহীমায় উজ্জ্বল। এসকল নদীগুলিকে দৈবীরূপে কল্পনা ও স্তুতি করা হয়েছে বারংবার। বহুমানুষের জীবিকার মূল কেন্দ্র হল এসকল পবিত্র পুণ্যতোয়া নদীসমূহ। সেই জীবিকা আরও জোড়ালো ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যখন সেই নদীর গতিপথের সঙ্গে মিলন ঘটে জনপদের। শুধু তাই নয়, দুই বা ততোধিক নদীর সঙ্গমক্ষেত্রগুলিও ধীরে ধীরে নিজের আত্মপ্রকাশ করেছে

সভ্যতার মিলনক্ষেত্র হিসেবে। কেবল নদী নয়, সরোবর, পুষ্করিণী, কুণ্ড ইত্যাদি জলসম্পদের আধার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, পাশাপাশি তীর্থের নিরিখে এদের গুরুত্ব অপরিসীম।

শুধু নদী, অরণ্য ও পর্বত তীর্থের অনুকূল পটভূমি তৈরীর সহায়ক, তা নয়। প্রাথমিকভাবে এই তিন উপাদানের উপর ভিত্তি করে তীর্থস্থানগুলিকে ভাগ করা হলেও, জনপদ ভিন্ন তীর্থের কথা ভাবা অসম্ভব। কোনো বিষয় যখন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে, তখন তার সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ফলে তীর্থস্থানগুলিও ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করেছে। কোনো একটি স্থান ধর্মীয় দিক থেকে কতটা প্রসিদ্ধি লাভ করবে, তা প্রাথমিকভাবে সেই তীর্থের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সেই স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বহু দুর্গম তীর্থও বর্তমান। সেই সকল স্থানে যাতাযাতের প্রতিকূলতা থাকলেও, সেসকল স্থান তীর্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কেদারনাথ, অমরনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থানের কথা। আবার একথাও সত্যি যে কোনো দুর্গম স্থান সুগম হবার অন্তরালে নানাবিধ কারণসমূহের অন্যতম হল ব্যবসায়িক দিক। তাছাড়া দুর্গম প্রদেশে তীর্থযাত্রীদের যে শারীরিক কষ্টের মাধ্যমে পাপক্ষালনের ভাবনা দেখা যায়, তা ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। যার দ্বারা তীর্থযাত্রীদের মুক্তির পথ প্রসস্ত হয়ে থাকে।

তীর্থস্থানে নানা মানুষের জনসমাগম ঘটে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে তীর্থস্থানগুলিতে। যদিও বর্তমান নানা পরিস্থিতিতে এই প্রবেশাধিকারের ব্যত্যয় দেখা যায়, কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে তীর্থস্থানে অবাধ প্রবেশাধিকারের কথা জানা যায়। কোনো স্থানে বহু জনসমাগম হলে, কিছু সমস্যা স্বাভাবিক ভাবেই আসে। সেই সকল

সমস্যাগুলির অন্যতম হল, ধর্মীয় নানা কুসংস্কার ও ঠকবাজ মানুষ। যেখানে ধর্মের আড়ালে এমন বহু কাজ হয়ে থাকে, যার মধ্যে বহু অসদুদ্দেশ্য বর্তমান।

তীর্থস্থানে দানাদি কর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনহিতকর কাজ, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পুর্ণ্যার্জনাদি লাভের উদ্দেশ্যে কতটা এইসকল ধর্মীয় কাজগুলি করা হচ্ছে, তার সত্যতা বিচার করা অসম্ভব। তীর্থের ধর্মীয় ছত্রছায়া কিছু প্রবঞ্চক মানুষ অসৎ পথ অবলম্বন করে, তীর্থযাত্রীদের ক্ষতি সাধন করে থাকে।

তীর্থে দেবমন্দির থাকা খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। কিন্তু সেই মন্দিরের প্রাচীনতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা অর্থোপার্জন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার সমাজের অন্য একটি দিককে উন্মোচিত করে। তীর্থস্থানে মুণ্ডন, শ্রাদ্ধাদি কর্মের দিকটিও পৃথক্ ভাবে লক্ষণীয়। যেকোনো তীর্থস্থানে ধর্মীয় দিকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থনৈতিক দিকও। ধর্মীয় আচারে ব্যবহৃত সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় যেকোনো তীর্থস্থানের আর্থ-সামাজিক সেই দিককে নিয়ন্ত্রণ করে, যা সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের রুজিরুটির অন্যতম উৎস। পুষ্পমাল্য, ফলমূলাদি, ধূপ, ধ্বজা ইত্যাদির বিপণন সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দিককে নির্দেশ করে।

তীর্থস্থানগুলি কেবলমাত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেই সমৃদ্ধ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পর্যটনস্থলগুলিও। প্রায় প্রতিটি তীর্থস্থান পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। যা কেবলমাত্র ধর্মীয় নয় আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির দ্যোতক। প্রায় বেশিরভাগ তীর্থস্থানই পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পর্যটন যেকোনো স্থানকে অল্পসময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিকশিত করতে পারে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমানে ভারতবর্ষে যে শিল্প অতি দ্রুত হারে বিকাশ লাভ করছে, সেই শিল্পগুলির অন্যতম হল পর্যটন শিল্প।

তীর্থস্থানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজনৈতিক দিক। যার প্রমাণ স্বরূপ হল কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির ইত্যাদি। বলা হয় বর্তমানে কাশীতে যে বিশ্বনাথ মন্দির দেখেতে পাওয়া যায়, তা অহল্যা বাই-এর পৃষ্টপোষকতায় তৈরী। তার আগে বহুবার ব্রাহ্মণ্যবিরোধী শক্তির দ্বারা বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তীর্থস্থানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে থাকে রাজনৈতিক দিকও। বর্তমানেও অযোধ্যার রামমন্দির প্রতিষ্ঠা ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে জুড়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ফলে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি ধর্ম ও রাজনীতি যেভাবে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে চলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফলে ভারতীয় তীর্থস্থানগুলি হয়ে উঠেছে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানের মিলনক্ষেত্র। যেখানে সর্ব ধর্ম, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য তৈরির অন্তরালে রয়েছে তীর্থস্থানগুলি, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের চতুর্দিকে যে মঠগুলি[১৩] তৈরি করেছেন তা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবনার পরিপূরক। পুরাণসাহিত্যের প্রাচীনতম পুরাণ হিসেবে স্বীকৃত *বিষ্ণুপুরাণের* ঐক্য প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলা হয়েছে- "উত্তরং যত্ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।"[১৪] এই উক্তির মধ্যদিয়ে যে কথাটি উঠে আসে, তা হল সপ্তভরতগোষ্ঠীর সন্ততি। কোনো স্থান বা অঞ্চল ভেদে মানুষের মধ্যে কোনোরূপ বিভেদের কথা বলা হয় নি। তীর্থস্থানগুলি সেই বহুবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যের মেলবন্ধন সূচিত করে। পুরাণগুলিতে যে নদীভিত্তিক তীর্থের কথা বারংবার বলা হয়েছে, নদী হিসেবে

[১৩] কর্ণাটক, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট ও ওড়িশাতে আদিশঙ্করাচার্যের চারটি মঠ প্রতিষ্ঠিত।

[১৪] বিষ্ণুপু., ২.৩.১

গঙ্গার উপকূলবর্তী সংস্কৃতি সমগ্র ভারতকে সুদূর উত্তর থেকে পূর্বে একমিলনসূত্রে বেঁধেছে এবিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। শুধু গঙ্গা নয়, গঙ্গার মত অন্যান্য নদীগুলিকে তীর্থের সুদূরপ্রসারী প্রভাব মানব জীবনে কোনো ভাবে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে দেখা যায়, সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত পুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহ ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজী গ্রন্থাবলী :

Ali, S.M. *The Geography of the Puranas*. New Delhi: People's Publishing House, 1966.

Altekar, A. S. *Sources of Hindu Dharma*. Sholapur: Institute of Public Administration, 1952.

Amarasiṁha. *Nāmaliṅgānuśāsanam*. Ed. Gurunath Vidyānidhi. *Amarakoṣa vā Amarārtha candrikā*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1408 BY (1st ed. 1395 BY).

Ancient History of India, Manusmṛti Revisited, Charles J. Naegele, page. 41.

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, vol. 36, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1955.

Awasthi, A. B. L. *Purāṇa Index*. New Delhi: Navrang, 1992.

Bhardwaj, Surinder Mohan. *Hindu Places of Pilgrimage in India*, Delhi : Thomson Press (India) Limited, 1973 (1st ed.).

Bhaviṣyapurāṇa. Vol. I and II. Sriram Śarmā. Uttar Pradesh: Sanskriti Sanskriti, 1968 (1st ed.).

Carl Gustav Diehl, "Instrument and Purpose Studies on Rites and Rituals in South India", Lund: CWK Gleerup, 1956.

Chatterjee, Heramba. *Studies in the Purāṇas and the Smṛtis*. Calcutta Sanskrit College Research Series: No: CXXVI part I. Calcutta (Kolkata): Sanskrit College, 1986 (1st ed.).

Childers, Robert Caesar (comp.). *A Dictionary of the Pali Language*. New Delhi: Asian Educational Services. 1993 (Rpt.; 1st ed. 1875).

Dange, Sadashiv Ambadas. *Encyclopedia of Puranic Beliefs and Practices*. New Delhi: Navrang, 1986 (1st ed.).

Deva, Raja Radha Kanta. *Śabdakalpadruma*. Delhi: Nag Publishers, 1988 (Rpt.).

Dey, Nundo Lal. *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*. Delhi: Low Price Publications, 2005 (Rpt.; 1st ed. 1927).

Dikshitar, V. R. Ramachandra. *The Purāṇa Index*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1995.

Dubey, D.P. *Prayaga: The site of Kumbhamela*. New Delhi: Aryan Books, 2001.

Eliot, Charles. *Hindusm and Buddhism an Historical Sketch*. Vol. I, II and III. London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1962 (Rpt. of 1st ed. 1921).

Ganguly, Dilip Kumar. *History and Historians in Ancient India*. New Delhi: Abhinav Publications, 1984 (1st ed.).

Ghosal, Pranati. "Tīrtha". In: *Kalātattvakośa*. Vol. VII, 2015.

Gonda, Jan. *A History of Indian Literature*. Vol. II. Ludo Rocher. The Purāṇas. Wiesbaden: otto Harrassowitz, 1986.

Hastings, James (ed.). *Encyclopaedia of Religion and Ethics*. Vol.X. New York: Charles scribner's sons. 1974 (Rpt.; 1st ed. 1918).

Hazra, R. C. *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs*. Dacca: The University of Dacca, 1940.

_____. *Studies in the Upapurāṇas*. Calcutta (now Kolkata): Sanskrit College Research Series, 1958.

_____. "The Smṛti-chapters of the Purāṇas". In: *The Indian Historical Quarterly*, Ed. Narendra Nath Law, Vol. XI, 1935, pg. 108-130.

Indian Antiquary, vol. X. Delhi: Swati Publications, 1984.

Jibananda Vidyasagar (comp.). *Śabda-sāgara*. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series office. 2002 (Rpt.). (Chowkhamba Sanskrit Studies- CXVI).

Kane, Pandurang Vaman. *History of Dharmaśāstra*. (Vol.I, IV and V). Poona: BORI, 1953.

_____. *History of Dharmaśāstra*. Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute, 1968 (2nd ed.).

Kejariwal, O.P. *Benares Illustrated*. Delhi: Pilgrims Publishing, 2009.

Law, Bimala Churn. *Historical Geography of Ancient India*. (Second and Revised Edition). France: Societe Asiatique De Paris, 1967 (2nd and rev. ed.).

_____. *Mahavira: His Life and Teachings*. London: Luzac & Co., 1937.

_____. *Tribes in Ancient India*. Poona (now Pune), 1943 (1st ed.). (Bhandarkar Oriental Series No. 4).

Macdonell, A. A. and A. B. Keith. Vol.I and II. *Vedic Index of Names and Subjects*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1982 (Rpt.; 1st ed. 1912).

Mandal, Balaram. *Purāṇera Itivṛtta*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2007 (1st ed.).

Mani, Vettam. *Purāṇic Encyclopaedia*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1989.

Mārkaṇḍeyapurāṇa.. F. Eden Pargiter (translated). The Mārkaṇḍeya Purāṇa. Culcutta (now Kolkata): The Asiatic Society of Bengal, 1904.

_____. Mahesh Chandra Pal. Calcutta (now Kolkata), 1812 ŚY.

Mitra, Rajendralala. *Buddha Gaya*. Calcutta (now Kolkata): Printed at the Bengal Secretariat Press, 1878.

Monier-Williams, Monier (comp.). *A Sanskrit – English Dictionary*. New Delhi: Asian Educational Services, 2001.

Naegele, Charles J. *Ancient History of India, Manusmṛti Revisited*. New Delhi: D.K.Printworld (P) Ltd., 2011(Rev. ed.; 1st ed. 2009 in USA).

Pargiter, F. E. *Ancient Indian Historical Tradition*. London: Oxford University Press, 1922 (1st ed.).

_____. *The Purāṇa Text of the Dynesties of the Kali Age*. London, Bombay: Humphrey Milford Oxford University Press, 1913.

Pilgrimage in the Indian Tradition, In: *History of Religions*, vol.3, no.1 (Summer 1963), Pub. by The University of Chicago Press, pp. 135-167

Renou, Louis. *Religions of Ancient India*. London: The Athlone Press, 1953.

Royal Asiatic Society's Journal 1881, vol. XIII.

Sarkar, Debarchana. *Geography of Ancient India in Buddhist Literature*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2003.

Singh, M. R. *Geographical Date in the Early Puranas- A Critical Study*. Calcutta (now Kolkata): Punthi Pustak, 1972.

Sircar, D. C. "Kokāmukha Tirtha". In: *Indian Historical Quarterly*. Vol.XXI, 1945.

_____. "The Sakta Pithas". In: *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal*. Vol.XIV(L), 1948.

_____. *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*. Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd, 1960.

_____. *The Sakta Pithas*. Delhi: Motilal Banarasidass, 2004.

Swain, Brajakishore. "Tīrthāṭanam". In: *Anvīkṣā.* Vol. XXVI, 2005.

Swami Dayananda. *Purāṇatottwa.* Kolkata: Sastra Prakash Bibhag, 1326 BY.

Swami Parameshwaranand. *Encyclopedic Dictionary of Purāṇas*. New Delhi: Sarup and sons, 2001.

The Encyclopedia of Religion. Ed. Mircea Eliade. Vol.-XI and XII. New York: Macmillan Publishing Compani, 1987.

Vakankar, L.S. and C.N. Parchure. *Lupt Saraswati Nadi Shodh*. Nagpur: Bharatiy Itihas Sankalan Samiti, 1992.

Vālmīki. *Rāmāyaṇa*. Ed. D.R. Mandad. The Vālmīki-Rāmāyaṇa. Baroda: Oriental Institute, 1965.

Venkateswaran, C. S. "The Vedic Conception of "Tirtha"". In: *All-India Oriental Conference* (21st session, vol. II, part I), 1966.

Webster Comprehensive Dictionary. Vol. II. Chicago: J.G. Ferguson Publishing Company, 1974 (1st ed. 1958).

বাংলা গ্রন্থাবলী :

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *সরস্বতী.* কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮০.

_____. "অনশন". *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী.* প্রথম খণ্ড. কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২.

কুণ্ডু, শম্ভুনাথ. *বঙ্গীয় লেখমালায় পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনার ক্রমবিকাশ.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২১ (১ম সং.).

গোস্বামী, কুঞ্জগোবিন্দ. *প্রত্নতীর্থ পরিক্রমা.* কলিকাতা : শ্রীছায়া গোস্বামী, ১৯৮৪ (১ম সং.).

ঘোষাল, রাজা জয়নারায়ণ. *কাশীখণ্ড.* কলিকাতা : শ্রী নটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ.

ঘোষাল, শৈলেন্দ্রনারায়ণ. *তপোভূমি নর্মদা.* হাওড়া : শ্রী আনন্দ মোহন ঘোষাল, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ.

চক্রবর্তী, বাণী. *সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন.* কলিকাতা : কালীকুমার ব্যানার্জী লেন, ১৯৬৮ (১ম সং.).

চক্রবর্তী, মন্মথনাথ. *কাশীধাম.* (সম্পা.) সচ্চিদানন্দ সরস্বতী. কলকাতা : শিল্প ও সাহিত্য, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ).

চট্টোপাধায়, সঞ্জীব. "সাধুসঙ্গ নামে আছে তীর্থধাম". *দেশ.* ১৭ মার্চ ২০২৩.

চট্টোপাধ্যায়, অশোক. *পুরাণ পরিচয়.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭.

চৌধুরি, শ্যামলেন্দু (সম্পা.). *কাশীবৃত্তান্ত পুরাণকাল থেকে সমকাল.* কলকাতা : পঞ্চালিকা প্রকাশনী, ২০২৩ (১ম সং.).

ঠাকুর, অমরেশ্বর. (সম্পা.). *নিরুক্তম্.* কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রিত; ১ম সং. ১৯৫৫).

দত্ত, বরুণ. *নর্মদার তীরে তীরে.* কলকাতা : দীপঙ্কর সরকার, ২০০২.

দেবী, রাজলক্ষ্মী. *তীর্থচিত্র.* কলিকাতা : নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ.

ধর্মপাল, গৌরী. *বেদ-আবহমান.* বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫ (১ম প্রকাশ).

নাথ, শর্ব্বা ঘোষ. "ধর্মীয় ক্যাসিনো, মান্ধাতা ও বহমান এক আঁচল". *দেশ.* ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩.

পঞ্চানন তর্করত্ন. (সম্পা.) *কূর্মপুরাণ.* কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ).

_____. (সম্পা.) *বায়ুপুরাণ.* কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ).

_____. (সম্পা.) *বিষ্ণুপুরাণ.* কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.) *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ.* কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.) *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ.* কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ.

_____. (সম্পা.) *মৎস্যপুরাণ.* কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.) *মার্কণ্ডেয়পুরাণ.* কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.) *লিঙ্গপুরাণ.* কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.). *অগ্নিপুরাণ.* কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.). *দেবীভাগবত.* কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল কুমার. *পৌরাণিকা.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮ (১ম সং.).

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার. (সম্পা.). *তিথিতত্ত্বম্.* কোলকাতা : সদেশ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু. (সম্পা.). *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্.* কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১০ (৪র্থ সং.).

_____. (সম্পা.). *মনুসংহিতা.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৪১০ বঙ্গাব্দ).

_____. (সম্পা.). *হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধ-সংস্কার.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩ (১ম সং.).

_____. *হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধসংস্কার.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩ (১ম সং.).

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচেতা. "পৌরাণিক জনপদঃ ঠিকানার ঠিক-বেঠিক". *দেশ.* ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র. *স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী.* কলিকাতা : মুখার্জী অণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (সংকলনক). *বঙ্গীয় শব্দকোষ.* নিউ দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬ (৯ম সং.; ১ম সং. ১৩৪০-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ).

বসু, গিরীন্দ্রশেখর. *পুরাণপ্রবেশ.* কলকাতা : ২০০৭ (৩য় সং.; ১ম সং. ১৩৪১ বঙ্গাব্দ).

বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলক). *বাংলা বিশ্বকোষ (Encyclopeadia Indica).* দিল্লী : বি.আর. পাবলিসিং করপরেসন, ১৯৮৮ (পুনর্মুদ্রণ; ১ম সং. ১৮৮৬-১৯১১).

বসু, মনোমোহন. *হিন্দু-আচার-ব্যবহার.* কলিকাতা : বেঙ্গল্ পব্লিশিং কোম্পানি. ১৮৮৭.

বসু, সুমিতা. (সম্পা.). *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা.* কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

বাংলা বিশ্বকোষ. খণ্ড ২. বাংলাদেশ : মুক্তধারা, ১৯৭৫ (১ম সং.).

ভট্টাচার্য, গুরুনাথ বিদ্যানিধি. (সম্পা.). *অমরকোষ.* কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ.

ভট্টাচার্য, তপনশঙ্কর (সম্পা.). *অষ্টাধ্যায়ী.* কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২ (পুনর্মুদ্রণ; ১ম সং. ২০০৪).

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ. *হিন্দুদের দেবদেবী.* কলকাতা : ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫ (২য় সং.-এর পুনর্মুদ্রণ; ১ম সং. ১৯৭৭).

ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রমোহন. *দেবতা ও আরাধনা.* কলিকাতা : হরিদাস বসাক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩২.

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ. *পুরাণকোষ.* কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০১৭ (২য় সং.; ২০১৬ ১ম সং.).

ভারতকোষ. কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬৭.

মণ্ডল, বলরাম. *পুরাণের ইতিবৃত্ত.* কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৭ (১ম সং.).

_____. *পৌরাণিক তীর্থ পরিক্রমা.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : দে বুক স্টোর, ১৯৯৫ (১ম সং.).

_____. *পৌরাণিক তীর্থ পরিক্রমা.* কলিকাতা : দে বুক স্টোর, ১৯৯৫.

মিত্র, জয়া. "তীর্থপথে". *দেশ.* ১৭ মার্চ ২০২৩.

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ. *'ইতিহাস' একটি প্রাচীন ভারতীয় চেতনা.* কলিকাতা : পিলগ্রিম পাব্লিশার্স, ১৯৬৭ খ্রি. (১ম সং.).

_____. "ইতিহাস ও রাজনীতি". *ভারত ও ভারততত্ত্ব অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ*, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪ (১ম সং.).

_____. *গঙ্গা-বঙ্গ.* কলকাতা : গ্রন্থমিত্র, ২০০৪ (১ম সং.).

রায়, অদিতি. *আদি-মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিযোজনে পদ্ম পুরাণ.* কোলকাতা : ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮ (১ম সং.).

লোধ, চিত্রা. *নদ নদী.* কলিকাতা : ভবানী প্রসাদ রায়চৌধুরী, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ.

শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার (সংকলক). *জীবনী কোষ ভারতীয়-পৌরাণিক.* ১ম খণ্ড. কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : ২১০/৩/২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ.

শাস্ত্রী, সুলোচন. *ভারতীয় তীর্থ দর্শন.* প্রকাশক অজ্ঞাত, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ.

সরকার, দীনেশচন্দ্র. *সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ.* খণ্ড ১. কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ (২য় মুদ্রণ; ১ম মুদ্রণ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ).

_____. *সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ.* খণ্ড ২. কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ (প্রথম মুদ্রণ).

সরকার, সুধীরচন্দ্র (সংকলক). *পৌরাণিক অভিধান.* কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : এম.সি. সরকার এন্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড. ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ. (সম্পা.) *মহাভারত.* কলকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনি, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৩৪০ বঙ্গাব্দ).

হাবিব, ইফরান. *সরস্বতী নদী কল্পনায় ও বাস্তবে.* কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১.

Webliography

RRMG-II Ep. 01 | Joshimath - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=kwheQQwkIlM&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=17

RRMG-II Ep. 02 | Ukhimath - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=VWIcWZZd25Q&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=18

RRMG-II Ep. 03 | Devprayag - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=WUWW3UzcnTw&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=19

RRMG-II Ep. 04 | Rishikesh - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=SFLd68I3_WY&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=20

RRMG-II Ep. 05 | Haridwar - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=mFeUrt3jXPE&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=21

RRMG-II Ep. 06 | Haridwar | Roorkee - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=80Ha5PaFSDQ&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=22

RRMG-II Ep. 07 | Haidarpur | Bijnor - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=8X5xUPUPb_o&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=23

RRMG-II Ep. 08 | Meerut - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=UNuSJv6s514&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=24

RRMG-II Ep. 09 | Delhi - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=XYHHCmOUAk0&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=25

RRMG-II Ep. 10 | Mathura | Virandavan - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=HLV2AfHwQcM&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=26

RRMG-II Ep. 11 | Vrindavan | Agra - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=_l2HKTAzCAo&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=16

RRMG-II Ep. 12 | Kasganj | Badaun - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=3k13zXOvS2Q&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=15

RRMG-II Ep. 13 | Etawah - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=BqXOwA2smek&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=14

RRMG-II Ep. 14 | Kanpur | Unnao - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=ADlxvooOUnM&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=13

RRMG-II Ep. 15 | Ayodhya - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=iw8TV4gQOhc&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=12

RRMG-II Ep. 16 |Pryagraj - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=0NRU8qT1MYU&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=11

RRMG-II Ep. 17 | Mirzapur - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal

https://www.youtube.com/watch?v=bva7CYshQ_4&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=10

RRMG-II Ep. 18 | Banaras - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=MtNkoyGYjFg&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=9

RRMG-II Ep. 19 | Patna - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=OC2D1zq7_UQ&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=8

RRMG-II Ep 20 | Bodhgaya | Rajgir | Nalanda - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=siBnfUaj5Gs&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=7

RRMG-II Ep 21 | Bhagalpur - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=nRbj424chCE&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=6

RRMG-II Ep 22 | Sahibganj - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=M5lg3rkgpLY&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=5

RRMG-II Ep 23 | Kolkata - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=X5C67M7Avo4&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=4

RRMG-II Ep 24 | Kolkata & Barrackpore - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=rOKN9mY5F1g&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=3

RRMG-II Ep 25 | Shrirampur & Chandannagar - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=zeqGNekNsXM&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=2

RRMG-II Ep 26 | Murshidabad - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=xasHUAx_wVk&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=1

Nadiyaan Gati Hai - Ep # 01 - Narmada - Part #01
https://www.youtube.com/watch?v=PAJ5pW_BJWY&list=PLUiMfS6qzIMx8ckv5w2IJRlzvccRukQap&index=1

Nadiyaan Gati Hai - Ep # 02 - Narmada - Part #02
https://www.youtube.com/watch?v=q04b4OweOXk&list=PLUiMfS6qzIMx8ckv5w2IJRlzvccRukQap&index=2

Nadiyaan Gati Hai - Ep # 03 - Narmada - Part #03
https://www.youtube.com/watch?v=51e6bjJcMOU&list=PLUiMfS6qzIMx8ckv5w2IJRlzvccRukQap&index=3

Rag Rag Mein Ganga I EP #01 I Uttarkashi
https://www.youtube.com/watch?v=bKw3jonxhUM&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=1

Rag Rag Mein Ganga I EP #02 I Gangotri
https://www.youtube.com/watch?v=0fQRfXGT5_o&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=2

Rag Rag Mein Ganga I EP #03 I Rudraprayag
https://www.youtube.com/watch?v=3p9hBL4FC6M&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=3

Rag Rag Mein Ganga I EP #04 I Devprayag
https://www.youtube.com/watch?v=G9c3Q-yBXMU&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=4

Rag Rag Mein Ganga I EP #05 I Rishikesh
https://www.youtube.com/watch?v=W0547_YKoSc&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=5

Rag Rag Mein Ganga I EP #06 I Haridwar
https://www.youtube.com/watch?v=ebUxYZv-3Pk&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=6

Rag Rag Mein Ganga I EP #07 I Rajaji National Park
https://www.youtube.com/watch?v=r6xAQBl70IQ&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=7

Rag Rag Mein Ganga I EP #08 I Garhmukteshwar
https://www.youtube.com/watch?v=dMhldggzgac&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=8

Rag Rag Mein Ganga I EP #09 I Farrukhabad
https://www.youtube.com/watch?v=DCCZTfnaqbQ&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=9

Rag Rag Mein Ganga I EP #10 I Kanpur
https://www.youtube.com/watch?v=t5cNf5a5EZ0&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=10

Rag Rag Mein Ganga I EP #11 I Prayagraj
https://www.youtube.com/watch?v=RCNMCZ_tOIY&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=11

Rag Rag Mein Ganga I EP #12 I Prayagraj
https://www.youtube.com/watch?v=YY4V8S4Rkb8&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=12

Rag Rag Mein Ganga I EP #13 I Varanasi
https://www.youtube.com/watch?v=_RyoArLktkE&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=13

Rag Rag Mein Ganga I EP #14 I Varanasi
https://www.youtube.com/watch?v=29Z1_Qrgb3g&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=14

Rag Rag Mein Ganga I EP #15 I Patna
https://www.youtube.com/watch?v=U_aNZz32hX4&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=15

Rag Rag Mein Ganga I EP #16 I Patna
https://www.youtube.com/watch?v=ZwD_2e4hxDc&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=16

Rag Rag Mein Ganga I EP #17 I Munger
https://www.youtube.com/watch?v=A0C_SDOsCPU&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=17

Rag Rag Mein Ganga I EP #18 I Bhagalpur
https://www.youtube.com/watch?v=SkkJGkZF55s&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=18

Rag Rag Mein Ganga I EP #19 I Kolkata
https://www.youtube.com/watch?v=fBeM0kNMtTI&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=19

Rag Rag Mein Ganga I EP #20 I Sunderbans
https://www.youtube.com/watch?v=SDxgah1YJ2U&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=20

Rag Rag Mein Ganga I EP #21 I Concluding Episode
https://www.youtube.com/watch?v=aBXE0LoCthY&list=PLUiMfS6qzIMxZ5K19ylg5Lkc-L0QVoODG&index=21

Documentary on Ganga river

https://www.youtube.com/watch?v=aT696emh5Ks

Chasing Rivers, Part 2: The Ganges | Nat Geo Live

https://www.youtube.com/watch?v=mkPwEuflhKo

Yatra - Kashi Banaras

https://www.youtube.com/watch?v=X0ssEqO9pbU&list=PLcJBpuBas-A3e1SAw508j2GIENY3beOLw&index=2

Varanasi (Kashi) Documentary by DD National (5/8/2021, 10:18 am)

https://youtu.be/3q89Rj3tIpc

BANARAS: Older Than History (5/8/2021, 11:00 am)

https://youtu.be/cxBuiWE5OsI

Beyond documentary: Varanasi India (6/8/2021, 11:11 am)

https://youtu.be/b3DTwdGqnVI

BARANASI- The Documentary (6/8/2021, 12:05 pm)

https://youtu.be/sCcgvIzgQIk

Kashi Ke Wasi Documentary (9/8/21, 10:05 am)

https://youtu.be/KiLK6FOzxI4

Yatra- Kashi Banaras (9/8/2021, 11:00 am)

https://youtu.be/X0ssEqO9pbU

Gaya Teerth (9/8/2021, 1:05 pm)

https://youtu.be/camwwg1qXkc

Bihar Documentary HINDI (10/8/2021; 10:10 am)

https://youtu.be/Vn4Bl9BC6xA

Prayagraj (Allahabad) Documentary by DD National (10/8/2021; 11:05 am)

https://youtu.be/v4muImw2eEM

DevaPrayag Documentary by DD National (11/8/2021; 10:30 am)

https://youtu.be/6qZv3vYzXTg

Gangasagar Documentary by DD National (11/8/2021; 11:04 am)

https://youtu.be/6TpSdLvI7TE

Gangotri Documentary #subscribe (12/8/2021; 12:05 pm)

https://youtu.be/jV0p6AHaT_o